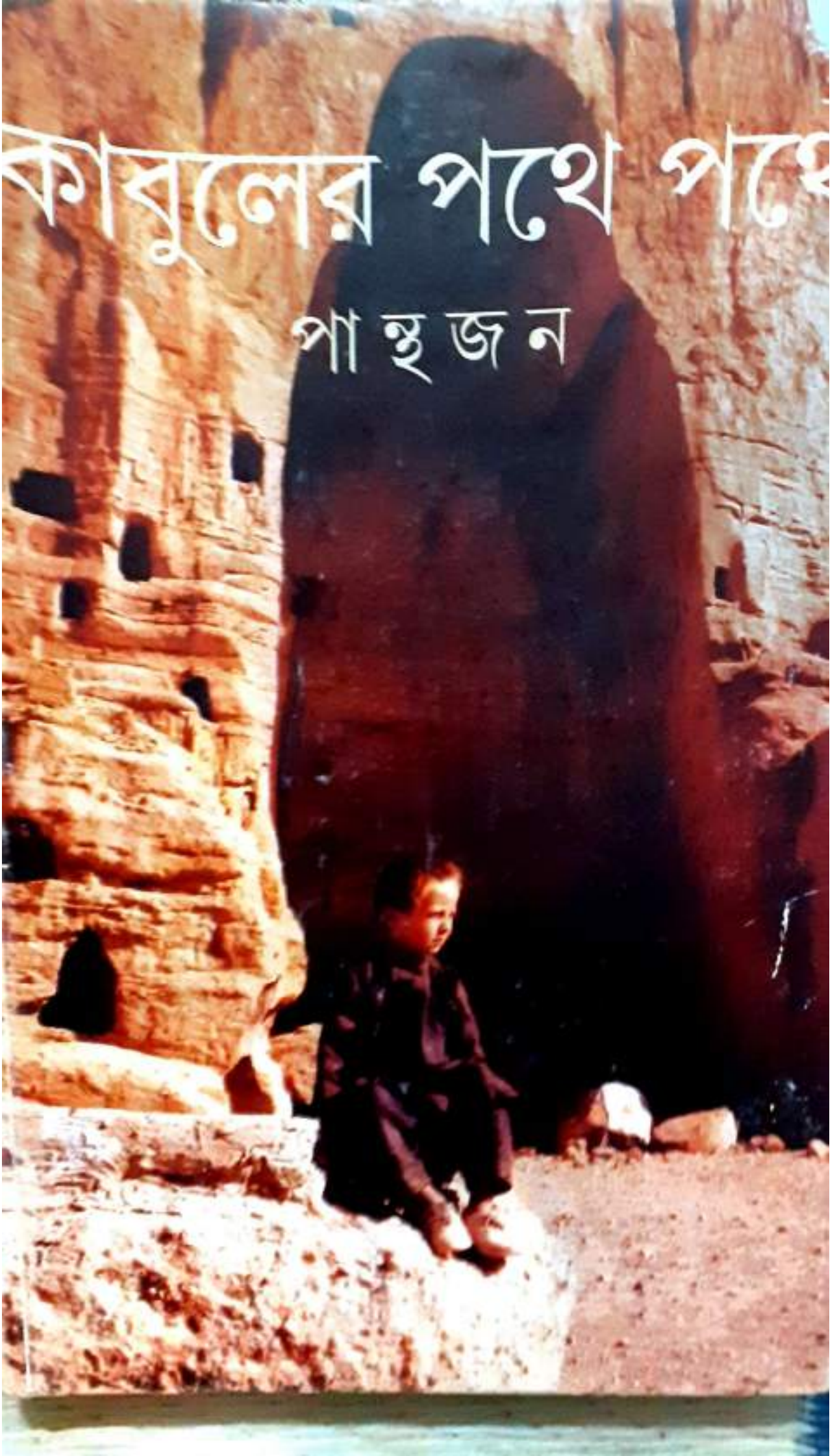
কাবুলের পথে পথে

পান্থজন



কাবুলের পথে পথে

পান্থজন

Sunil Bera
2017



আনন্দ

ভূমিকা

ভ্রমণবিলাসী বাঙালির কাছে আফগানিস্তানের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। পুরাতন ভারতবর্ষে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দেওয়ার কালে এটাই ছিল প্রথম গন্তব্যস্থল। সেই আফগানিস্তানে যাবার সুযোগ পেয়ে মনে প্রাণে বেশ উৎফুল্ল হয়েছিলাম।

ন' মাস আফগানিস্তানে থাকার পরে ওখানকার লোকেদের রীতি-রেওয়াজের এবং সাধারণ জীবনযাপনের যে ধারণা আমরা এখানে করে থাকি তা অনেকটা পালটে গেল। আফগানিস্তানে যে শুধু মিনির রহমত থাকে না সেটা বলাবাহুল্য। একটা দেশের মানুষ কীভাবে অচিন্তনীয় দুরবস্থা থেকে বারবার বেঁচে উঠে নতুন জীবনের আশা রাখতে পারে সেটা এখানে এসেই জানতে পেরেছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম অনেক ধরনের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে, বহু জায়গায়ও বেড়িয়েছিলাম আর সে সবের পরে মানুষের ওপর শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অবশ্য মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু যে মানুষ সেটা জানতেও আর বাকি থাকেনি।

এই বই আমার ন' মাসের আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি বিবরণ।

"এদেশে বসন্তের সঙ্গে আমাদের বর্ষার তুলনা হয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে ধরণী তপ্তশয়নে পিপাসার্তা হয়ে পড়ে থাকেন, আষাঢ়স্য যে কোনো দিবসেই হোক্ ইন্দ্রপুরীর নববর্ষণ বারতা পেয়ে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হন। এখানে শীতকালে ধরিত্রী প্রাণহীন স্পন্দন-বিহীন মহানিদ্রায় লুটিয়ে পড়েন, তার পর নববসন্তের প্রথম রৌদ্রে চোখ মেলে তাকান। সে তাকানো প্রথম ফুটে ওঠে গাছে গাছে।"

সৈয়দ মুজতবা আলী
দেশে বিদেশে

পূর্বভাষ

শীতকালের রবিবার। বেলা এগারোটা। হ্যামকে দুলতে দুলতে গরম কফিতে সবেমাত্র চুমুকটা দিয়েছি, এমন সময় হাসপাতাল থেকে ফোনটা এল। তাড়াতাড়ি ছুটলাম। হাসপাতালে খবর এসেছে আমাকে তিনদিন পরে দিল্লিতে একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে। তারপরে হয়তো আফগানিস্তান, কাবুল যেতে হতে পারে।

তালিবান সরকারের ওপর আমেরিকার বোমাবর্ষণের দরুন, আফগানিস্তানের সব ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে। সারা বিশ্ব আফগানিস্তানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে। ভারত সরকার কাবুলে কিছু ডাক্তার পাঠাতে চায়। দু'জন ইতিমধ্যেই কাবুল পৌঁছে গেছে। ওখানে এখন সার্জেন দরকার। সেইজন্যে আমার ডাক এসেছে।

প্রচণ্ড দৌড়ঝাঁপ আরম্ভ হল বাড়িতে। ওভারকোট থেকে ন্যাপথালিন বল বার করা হল। গরম জামা, দস্তানা, গরম মোজা, মাফলার আর গরম গেঞ্জি ট্রাঙ্কে ঢুকল। তোশক, বালিশ, স্লিপিং ব্যাগ ঢোকান হল বেডিং-এ। এছাড়া জামাকাপড়, কিছু বই, ক্যামেরা আর মাস চারেকের মতো তেল-সাবান-দাঁতমাজা-দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নেওয়া হল। এত জিনিস দেখে আমার স্ত্রী অবাক। বলতে লাগল, 'এত কিছু নিচ্ছ! থাকবে কোথায়?' বললাম, 'কিছুই জানি না। ভুলে যেও না আমি একটা ছত্রভঙ্গ দেশে যাচ্ছি।' সে আমার বাঁদর টুপিটাও সঙ্গে নিতে বলছিল। পাঠানদের দেশে টুপিটা মানাবে কিনা বুঝতে না পেরে আর ঝুঁকি নিইনি।

ইতিমধ্যে কালীমন্দিরে পুজো দেওয়া হয়েছে। বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নেওয়া হয়েছে। ছেলে দুটো কথা দিল ভব্যি হয়ে থাকবে। ছোটটা তিন বছরের। খুব ভরসা দিল। সব সমস্যা সে একাই সামলে নেবে। অবশেষে স্ত্রী আর দুই ছেলেকে রেখে দিল্লি রওনা দিলাম। সাত সমুদ্র নয়, তবে সপ্তসিন্ধু পার করে এগোলাম কাবুলিওয়ালার দেশের দিকে।

দিল্লিতে

সকাল দশটায় দিল্লি হেড অফিসে ইন্টারভিউ'এর জন্যে পৌঁছলাম। আলাপ হল ডা. বালার সঙ্গে— সে অ্যানাসথেটিস্ট। তা ছাড়া ডা. হরি, পেডিয়াট্রিসিয়ান; আর ডা. নাথ—ফিজিসিয়ান। এছাড়া দু'জন অপারেশন থিয়েটার বা ও.টি. অ্যাসিসট্যান্ট, আর তিনজন কম্পাউন্ডার।

ইন্টারভিউতে জানা গেল আমরা একদিন পর কাবুল যাব।

"সেখানে আপাতত দু'জন ডাক্তার আর তিনজন কম্পাউন্ডার চলে গেছে। ওদের সঙ্গে তোমাদের কাজ করতে হবে; হয়তো বা ওখানে আলাদা হাসপাতালও তৈরি করতে হতে পারে। তোমাদের সঙ্গে যাবে তিন টন ওষুধপত্র। এবার তাহলে তোমরা বিদেশ মন্ত্রালয়ে গিয়ে কাগজপত্র ও পাসপোর্টের ব্যবস্থা করো।" এই বলে আমাদের ইন্টারভিউ শেষ করা হল।

বেরিয়ে এসে আমরা বলাবলি করলাম— পরশু যাওয়া, আর এখনও পাসপোর্ট নেই!

বিদেশ মন্ত্রালয়ে দেখা হল ডেপুটি সেক্রেটারি বিনয় কোয়াত্রার সঙ্গে। একটা ছোট ঘরের মধ্যে একগাদা ফাইল, কাগজপত্র, পাসপোর্ট নিয়ে সে বসেছিল। বোঝাই গেল আফগানিস্তানে নতুন সরকারের উদ্বোধন হতে চলেছে, আর এদিকে কোয়াত্রার ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে পাসপোর্টের আবেদন করা হল।

"কাল দুপুরে এসে ভিসা আর পাসপোর্ট নিয়ে নিয়ো। পরশু একটা এয়ারফোর্সের প্লেন কাবুল যাবে। অবশ্য সেটা কোনদিক দিয়ে যাবে এখন জানা নেই। যদি পাকিস্তান অনুমতি দেয়, তাহলে তোমরা সোজা এখান থেকেই কাবুল যাবে। তবে যদি ওরা না দেয়, তাহলে তোমাদের আরবসাগর হয়ে যেতে হবে ইরান। সেখান থেকেই ফেরৎ আসতে হবে কাবুল। সেক্ষেত্রে তোমাদের কাল রাত দুটোয় এয়ারপোর্ট যেতে হবে। ইতিমধ্যে তোমরা

ওষুধপত্রের দিকটা দেখে নাও।" এই বলে কোয়াত্রা দুটো ফাইল বগলদাবা করে হন্‌হন্‌ করে তার অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন কাজের মধ্যে এই হল যে পাকিস্তান আমাদের সোজা রাস্তায় কাবুল যেতে অনুমতি দিল। আমরা ইতিমধ্যে তিনটন ওষুধ ট্রাকে বোঝাই করে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশ্য তাতে কোনও সার্জারির জিনিসপত্র দেখতে পাইনি। কী ব্যাপার ঠিক বোঝা গেল না। বিকেলে আমরা বাটিছাঁট চুল কাটলাম, কে জানে ওখানে নাপিতটাপিত আছে কি না। তালিবানদের সময়ে তো দাড়ি কামানো বারণ ছিল, নাপিতগুলো হয়তো পালিয়ে গেছে আফগানিস্তান ছেড়ে।

সেই দিন

আজ বারোই ডিসেম্বর। আমার বিয়ের তারিখ। এগারো বছর আগে এদিন ভোর পাঁচটায় পুকুরপাড়ের অভাবে বাথরুমের কলের জলেই আমাকে ঘিরে স্ত্রী-আচার পালিত হয়েছিল।

আজ পাঁচটায় আমি এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিয়েছি। এয়ারপোর্টে গাড়ির মেলা। বিনয় কোয়াত্রার সঙ্গে আরও বেশ ক'জন বুরোক্র্যাট। প্রচুর সাংবাদিক। তাঁদের হাতে ক্যামেরা ও বুম। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তিনি মি. রঞ্জিত কুমার। একটু বয়স্ক, মাঝারি হাইট আর চুপচাপ স্বভাব। তিনি আমাদের সঙ্গেই কাবুল যাচ্ছেন নতুন হাসপাতাল আর চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব নিয়ে।

সকাল ছ'টা অবধি আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার ছিল। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঘন কুয়াশা। বিশাল বড় রাশিয়ান জেট প্লেনটা চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আমরা হতাশ হয়ে বসে পড়লাম। আজ হয়তো যাওয়া নাও হতে পারে।

বসার জায়গায় বেশ ভিড়। কাছেই সাংবাদিকদের মাঝখানে শিবসদাগর হয়ে বসে আছেন আফগানিস্তানের মিনিস্টার অফ ইন্টিরিয়ার বা হোম মিনিস্টার— ইউনুস কানুনি। দূর থেকে দেখে মনে হল বেশ সাদাসিধে গোছের লোক।

একজনকে খুব চেনা-চেনা লাগছে। বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ চোখ, মুখে দাড়ি। লম্বা চওড়া। সব মিলিয়ে সুন্দর চেহারা। আলাপ হতে মনে হল এই ভদ্রলোক প্রবলপ্রতাপ সিং। 'আজতক'-এর সাংবাদিক। এ-ই প্রথম ভারতীয় সাংবাদিক, যে তোজিকিস্তান দিয়ে উত্তর আফগানিস্তানে ঢুকেছিল যখন আমেরিকা আফগানিস্তানের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করে। কয়েকজন আফগানি সৈনিকের সাহায্যে প্রবলপ্রতাপ তার ক্যামেরাম্যান রাজীব গুপ্তার সঙ্গে কাবুল অবধি

চলে আসে। সেখান থেকে কিছুদিনের জন্যে ভারতবর্ষে এসে আবার এখন কাবুলে ফিরে যাচ্ছে।

প্রবলপ্রতাপের অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম। কয়েক হাজার ডলার নিয়ে আফগানিস্তানে আসা, তারপরে সেই টাকা ফুরিয়ে যাওয়া, এর-তার কাছ থেকে টাকা ধার করা ও তারপর আবার তোজিকিস্তান ফিরে গিয়ে টাকা নিয়ে আসার গল্প। দিনের পর দিন এদিক-সেদিক মাঠে-পর্বতে থেকেছে, খেয়েছে, কখনও একটাই বালতিতে পাঁচ-ছয় জনকে খেতে হয়েছে। সেই বালতিতে মুখ ও অন্যান্য সব ধুতে হয়েছে। আকাশের তলায় কাঁপতে কাঁপতে স্লিপিং ব্যাগে শুতে হয়েছে।

এখন ওখানকার কী অবস্থা জিজ্ঞেস করতে বলল, "কাবুলের অবস্থা মোটামুটি— সন্ধের পরে মনে হয় কারফিউ লেগে গেছে। তবে কাবুলের বাইরে অবস্থা বেশ খারাপ। রাস্তায় রাস্তায় ডাকাত ঘোরাঘুরি করে। যাকে পায় তাকেই লুঠ-মার করে। এই তো সেদিন এক মেয়ে— ফ্রেঞ্চ সাংবাদিক— জালালাবাদ যাচ্ছিল। ডাকাতরা তার গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে পিটিয়ে সব টাকা ও ক্যামেরা লুঠ করে মেয়েটাকে মেরে তার মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে পালিয়ে গেছে।"

শুনে গা ছমছম করে উঠল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যিই হবে; সাংবাদিকের মুখের কথা!

আইনকানুন বলে কিছুই নেই ওখানে বোঝা যাচ্ছে। সেকথা বলতেই প্রবলপ্রতাপ বলল, "অনেকটা সেরকমই। শহরের বাইরে, এমনকী শহরেও, পঞ্চাশ ডলার দিলে একটা এ-কে ৪৭ বা এ-কে ৫৬ রাইফেল পাওয়া যায়। আমরা যখন এদিক-ওদিক যেতাম তখন একটা এ-কে ফর্টিসেভেনওয়ালা গার্ডকে নিয়ে যেতাম। অবশ্য সেও আমাদের লুঠ করতে পারত, তবে এখন অবধি করেনি।"

কথা শেষ করেই সে উদ্দাম হাসল। আমি একটু দমে গিয়ে বলি, "খরচাপাতি কীরকম, খাওয়াদাওয়া জুটবে তো?"

"তোমাদের তো ব্যবস্থা ভালই হওয়া উচিত, তোমরা তো বিদেশ মন্ত্রালয় থেকে যাচ্ছ। তবে হোটেলে সবকিছুরই আগুন দাম; যা চায় তাইই দিতে হয়। আমরা যখন কাবুল থেকে গাড়ি ভাড়া করে দু'শো কিলোমিটার দূরে তোরাবোরা গেছিলাম, তখন খরচ হয়েছিল চার হাজার ডলার— মানে প্রায় দু' লক্ষ টাকা।"

আমরা হাঁ করে প্রবলপ্রতাপের গল্পগুলো গিলতে লাগলাম। সে আর একটা কথাও বলল, "তোমরা যখন এদিক-ওদিক যাবে, তখন যদি কোনও কারণে শহরের বাইরে যাও তাহলে ভুলেও কখনও রাস্তা থেকে নেমো না। চারদিকে মাইন পাতা আছে— কে যে কখন কোনটা পেতেছে কেউ জানে না— যখন-তখন ফাটতে পারে; এমনকী প্লেন থেকে যখন নামবে তখন রানওয়ে থেকে নেমে এদিকসেদিক যেও না খবরদার।"

ন'টা বাজছে। প্লেন ওড়ার কোনও নাম নেই। আমরা সবাই জলখাবারের একটা করে ছোট প্যাকেট পেলাম। কাটলেটটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, কিছুতেই কাঁটাচামচ দিয়ে কাটা গেল না, হাতে ধরে কামড় দিতেই দাঁতগুলো কনকন করতে লাগল। আলুগুলো তুলে দেখি সেগুলো চক্‌চক্‌ করছে। বরফের একটা স্তর পড়ে আছে আলুতে। কামড়াতেই মুখ আর জিভ জ্বলে গেল। কোনওরকমে গরম কফির সঙ্গে ঠাণ্ডা-গরমের লুকোচুরির মধ্যে খাবারটাকে গিললাম। ভবিষ্যতে যে খাবারের দুর্ভোগ আছে সেটা ভেবে নিয়ে শক্ত করলাম মনটা।

এগারোটা নাগাদ কুয়াশা একটু কমল, আর আমরা এয়ারফোর্সের চারটে জেটওয়ালা রাশিয়ান প্লেন— আই এল ৭৬-এর দিকে এগোলাম। এটা প্রধানত মালবাহী প্লেন, তবে আজ তার মাঝখানে একটা বন্ধ কেবিনে কিছু চেয়ার পাতা আছে। ইউনুস কানুনি এবং কয়েকজন ব্যুরোক্র্যাট সেই কেবিনে বসলেন। আমরা বাকিরা প্লেনের দু'ধারে লাগানো বেঞ্চিতে বসলাম। আর প্লেনের মাঝখানে পড়ে রইল পর্বতের মতো উঁচু জিনিসপত্তর যাতে আছে ওষুধের বাক্স, দূতাবাসের জিনিস ও আমাদের লাগেজ।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ প্লেনটা উড়ল। ভারতবর্ষ ছেড়ে আমরা আস্তে আস্তে অন্য দেশের দিকে রওনা হলাম।

ইতিহাস

কোনও জায়গায় যাবার আগে তার সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া অবশ্যই দরকার। আমিও আফগানিস্তানকে জানার চেষ্টা করেছি কিছুটা।

একটা পুরনো মুজাহিদ উপকথা আছে— আল্লা যখন সারা পৃথিবী তৈরি করলেন, তখন দেখলেন একরাশ ভাঙা টুকরোটাকরা জঞ্জাল এদিকওদিক পড়ে আছে; সেগুলো কোথাও কোনও কাজে লাগছে না। তিনি সেসব তুলে ছুড়ে দিলেন পৃথিবীর ওপর। জন্ম নিল আফগানিস্তান।

রামায়ণে আফগানিস্তানের কোনও উল্লেখ নেই। তবে মহাভারতের গল্পে রানি গান্ধারী আর শকুনিমামা এসেছিলেন গান্ধার প্রদেশ থেকে। অনেকের ধারণা গান্ধার আর কান্দাহার একই জায়গা। দুটো নামে একটা ছন্দ আছে তাই জন্যে হয়তো। গান্ধারটা আসলে পেশাওয়ার উপত্যকা। 'গান্ধার স্কুল অফ আর্ট'-এর একটা গড় হচ্ছে তক্ষশিলা, পেশাওয়ারের কাছে। কান্দাহারে কোনওরকম আঁকাজোকার ছিঁটেফোটাও নেই। গজনি আর কান্দাহার অঞ্চল— এর নাম ছিল আরাকোসিয়া। কান্দাহার আর গান্ধার উপত্যকার মধ্যে পাঁচশো মাইলের তফাৎ।

পশ্চিমের আক্রমণকারী ও ব্যবসায়ীদের কাছে আফগানিস্তান ছিল ভারতবর্ষে ঢোকার দরজা। বাল্‌খ (ব্যাকট্রিয়া) অঞ্চলে জরথুস্ত্র প্রচার চালিয়েছিলেন। গ্রিস থেকে আলেকজান্ডার এসে পারস্যরাজা দারিয়াসকে হারিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন। হেরাত-এ তাঁর একটা বড় কেল্লা ছিল। মৌর্যরাজ অশোক আফগানিস্তান পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব ছড়িয়েছিলেন এবং তখন থেকে আফগানিস্তানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার। রাজা কনিষ্কের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার তুঙ্গে উঠেছিল। সম্ভবত বামিয়ানের গুহা এবং বুদ্ধমূর্তি ওই সময়েই তৈরি। সপ্তম শতাব্দী থেকে আরবদেশের সৈন্যরা দলে দলে আফগানিস্তান হয়ে ভারতবর্ষে ঢুকে গেল। শুরু হল ইসলামধর্মের প্রচার। বারোশো উনিশ

সালে মোঙ্গল রাজা চেঙ্গিস খান আফগানিস্তান তছনছ করে বামিয়ান ভাঙার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, মোঙ্গলদের প্রচুর বংশধর আজ আফগানিস্তানে বাস করে। এদের দেখতে চৈনিকদের মতো, সাধারণ আফগানিদের থেকে বেশ আলাদা। তারা সব হাজারে হাজারে এসেছিল চেঙ্গিস খানের সঙ্গে। তাই তাদের নাম 'হাজারা'। চেঙ্গিস খানের কিছু সময় পর সমরকন্দ থেকে তাইমুর লঙ আফগানিস্তান আক্রমণ করে। তাইমুর লঙ-এর বংশধর জাহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর পরপর তিনবার সমরকন্দ জয় করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কাবুলে তাঁর ঘাঁটি গড়ে ওঠে। তারপরে সেখান থেকে দিল্লি। এখানেই ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা। ঔরঙ্গজেবের সময়ে আফগানিস্তান আবার পারস্য দেশের অধীনে চলে যায়। সতেরোশো আটত্রিশ সালে নাদির শাহ কান্দাহার, কাবুল হয়ে ভারত আক্রমণ করে। নাদির শাহের হত্যার পরে তার দেহরক্ষী আহমেদ শাহ আবদালি নিজেকে বাদশাহ বা 'দুর্‌রি দৌরান' ঘোষিত করেন। আফগানিস্তানে শুরু হয় দুরানি সাম্রাজ্য। আহমেদ শাহ দুরানির (আবদালি) সাম্রাজ্য পার্সিয়ার মাশাদ থেকে ভারতবর্ষের দিল্লি আর উত্তরে আমুদরিয়া থেকে আরবসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। তাঁকেই আফগানিস্তানের পিতা বলে জানা যায়। পঞ্জাবের রঞ্জিত সিং আঠারোশো চৌত্রিশ সালে কাবুলকে তাঁর অধীনে নিয়ে আসেন।

এশিয়াতে তখন রুশদেশের রাজ্যসমৃদ্ধি হচ্ছে। তারা আফগানিস্তানের দোরগোড়া অবধি পৌঁছে গেল। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসক তাদের আটকাবার জন্যে আফগানিস্তানকে কবজা করবার চেষ্টা করে, পর পর তিনবার যুদ্ধ হয়। আবদুর রহমানের সময়ে ডুরান্ড লাইন আঁকা হয়, আফগানিস্তান আর তৎকালীন ভারতের সীমানা। তাঁরই নাতি আমানুল্লার সঙ্গে ব্রিটিশরা শেষবারের মতো যুদ্ধ করে এবং পরাজিত হয়। ব্রিটিশদের বড় বড় সেনাপতিরাও বলে গিয়েছিল— আফগানিদের কেনা যেতে পারে কিন্তু লড়ে জেতা যাবে না।

আমানুল্লা খান ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক মনস্ক। তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া তখনকার দিনে হাতকাটা পোশাক পরতেন, বোরখার তো বালাই নেই। আমানুল্লা খানের আধুনিকতার প্রচার বেশিদিন চলেনি কট্টর আফগানিদের ওপরে। তিনি পালিয়ে যাবার পরে, নাদির শাহ এবং তারপর তার ছেলে জাহির শাহ আফগানিস্তানের রাজা হন। উনিশশো তিয়াত্তর সালে জাহির শাহের

দূরসম্পর্কের ভাই দায়ুদ খান তাঁকে সরিয়ে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হলেন।

দায়ুদ খানের ভরসা ছিল কম্যুনিজম আর রুশ। মুসলমান কট্টরপন্থীদের সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়াতে তাঁকে হত্যা করা হয়; তারপরে রুশরা আফগানিস্তান আক্রমণ করে। বাবরাক্ কারমাল হলেন আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি। শুরু হল পরস্পর যুদ্ধ। আমেরিকার অস্ত্র-ব্যবসাদাররা মাঠে নামল— কোটি কোটি টাকার অস্ত্র পাচার হল আফগানিস্তানের ইসলামের ধার্মিক যোদ্ধাদের হাতে। এরা রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করল। এদেরই বলা হয় মুজাহিদ্দিন। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল আহমেদ শাহ মাসুদ, গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার, আবদুল রশিদ দোস্তম আর ওসামা বিন লাদেন। কারমালের পরে নাজিবুল্লা হলেন রাষ্ট্রপতি। উনিশশো উননব্বইতে যখন রুশরা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেল তখন প্রায় পনেরো লক্ষ লোক যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। আফগানিস্তানে তখন শুরু হল ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ। সব মুজাহিদ্দিনের কাছে বন্দুক আর সৈন্য ছিল, সবাই চাইছিল নিজস্ব রাজত্ব। নাজিবুল্লা তাদের সামলাতে না পেরে গদি ছেড়ে দিলেন আর বুরহানউদ্দিন রব্বানি হলেন রাষ্ট্রপতি। অবস্থা কিছু ভাল হল না— আফগানিস্তানে প্রচণ্ড অরাজকতা।

এর মধ্যে উনিশশো চুরানব্বই সালে মুল্লা উমর বলে এক মৌলবী কিছু ছাত্রদের নিয়ে কান্দাহার অঞ্চলে সেখানকার কিছু বদমাইশদের মেরেধরে পাট করলেন। কান্দাহার অঞ্চলে আস্তে আস্তে স্বাভাবিকতা ফিরে এল। এই ধর্মীয় ছাত্রদের নাম হল তালিব। এর সৈন্যর নাম হল তালিবান। এদের বক্তব্য ছিল ইসলামধর্মকে অমান্য করা হচ্ছে বলেই দেশের এই অবস্থা— নতুন করে গড়ে তুলতে হবে আফগানিস্তান। দীর্ঘদিনের যুদ্ধের দরুন ক্লান্ত আফগানিদের এ কথাটা মনে ধরল। তালিবানরা ঝপাঝপ ছোটখাট গৃহযুদ্ধকারীদের হারিয়ে পশ্চিমদিকে হেরাত আর উত্তরে কাবুলের দিকে রওনা হল। এদের সাহায্য করার জন্যে পাকিস্তান হাত বাড়াল। আমেরিকাও তাদের অস্ত্র যোগান দিল। আমেরিকার অবশ্য একটাই উদ্দেশ্য ছিল— তালিবান যদি স্থায়ী সরকার আনতে পারে আফগানিস্তানে, তাহলে পৃথিবী বিখ্যাত তুর্কমেনিস্তানের গ্যাস আনতে তারা আফগানিস্তান দিয়ে পাকিস্তান হয়ে পাইপ বসাতে পারবে।

তালিবানরা আস্তে আস্তে বেশির ভাগ আফগানিস্তান দখল করে নিল; শুধুমাত্র একজন মুজাহিদ্দিন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেলেন। ইনিই পাঞ্জশের উপত্যকার আহমেদ শাহ মাসুদ। তালিবানরা দিনে দিনে গদির স্বাদ পেয়ে কট্টর হয়ে উঠল। গাঁট বাঁধল সৌদি আরবের কোটিপতি ইঞ্জিনিয়ার ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে। তার দল আল-কায়দার ক্যাম্প খুলল আফগানিস্তানে। অবশেষে ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করল। প্রথমে তানজানিয়া, তারপর কিনিয়ার দুতাবাসে বোমা, শেষে এগারোই সেপ্টেম্বর দু'হাজার এক— নিউইয়র্কের ওপর হামলা। অক্টোবর থেকে আমেরিকার পালটা হামলা আফগানিস্তানে; আহমেদ শাহ মাসুদের সৈন্য এবং আবদুল দোস্তম-এর সাহায্যে।

এইসব হামলা-টামলার মধ্যে আমরা কয়েকজন মূর্তিমান কাবুলের দিকে এগিয়ে চলেছি।

উননব্বই থেকে দু'হাজার এক সাল অবধি, তেইশ বছরের যুদ্ধের পরে আফগানিস্তান পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দরিদ্র দেশ বলে পরিগণিত হল। আজ বাদে কাল যে কী হবে সেই নিয়ে কেউ চিন্তা করে না— আগে আজকের দিনটা তো বাঁচা যাক; কালের কথা কাল। এ ছাড়া ওখানে গত পাঁচ বছর ধরে খরা চলছে— বরফ পড়া কমে গেছে অনেক, অশিক্ষা, ধর্মীয় গোঁড়ামি আর তালিবানদের প্রভাব তো আছেই। বড় বড় দেশগুলো আফগানিস্তানকে তাদের যুদ্ধের খেলাঘর ঠাউরে একে অপরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করছে। ইউনাইটেড নেশনস-এর মতে, আফগানিস্তানে এত বেশি মাইন পাতা আছে যে, যদি এক টানা দশ বছরের যুদ্ধ বিরাম হয়ে মাইন তোলার কাজ একনাগাড়ে হয় তাহলেই সব মাইন তোলা যাবে।

স্বাস্থ্যের অবস্থা চরম ভাবে খারাপ। বাচ্চাদের মধ্যে শতকরা চল্লিশ জনের হয় মা নয় বাবা মারা গেছে। বেশির ভাগই যুদ্ধের দরুন মৃতদেহ দেখেছে এবং জেনে গেছে, ওরাও একদিন ওইভাবে মরে যাবে। পরিষ্কার বলে সে কথা। আড়াই কোটি আফগানির মধ্যে ষাট লক্ষের কোনও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই। পঁচিশ শতাংশ বাচ্চা পাঁচ বছর পেরোবার আগেই মারা যায়। মেয়েদের মধ্যে যুদ্ধের প্রভাব খুব বেশিভাবে পড়েছে। মোটামুটি তিন ভাগের একভাগ মেয়ের মানসিক উদ্বেগ এবং অসুখ আছে।

আফগানিস্তানের লোকেরা বিভিন্ন জাতের। আমরা অবশ্য তাদের

কাবুলিওয়ালা বা পাঠান বলেই ধরে নিই। আসলে কাবুলিওয়ালারা সেই অর্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাঠান হয় না। পাঠান বা পস্তুনরা হিন্দুকুশের দক্ষিণ দিকে থাকে, এরা আফগানিস্তানের চল্লিশ শতাংশ লোক। কাবুলে তাদের প্রভাব খুব বেশি নয়, তবে হয়তো এককালে ছিল, কারণ সেই থেকেই কাবুলের ভদ্রলোকের কথার দাম থাকত। এখানকার লোক যাকে বলে 'পাঠানকা জুবান'— ভদ্রলোকের এক কথা। এরা পস্তু ভাষা বলে, আর, এরা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর সংখ্যায় আছে। এইসব অঞ্চলগুলোকে একত্রিত করে এরা মাঝে পস্তুনিস্তান বলে এক নতুন দেশ করার হিড়িক তুলেছিল— পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে। উত্তর আফগানিস্তান আর কাবুল এলাকার লোকেরা অনেকেই তাজিক— এরা সব ইরান থেকে উদ্ভূত, হয়তো বা আর্যদের পরে পরে। এদের উচ্চতা পাঠানদের মতো অত বেশি নয় তবে চেহারা খুব সুন্দর। এদের ভাষা দরি— আফগানিস্তানের ফার্সি ভাষা। আহমেদ শাহ মাসুদ এদের মধ্যে একজন। মধ্য আফগানিস্তানে বাস করে হাজারা গোষ্ঠী— সেই যারা চেঙ্গিস খানের সঙ্গে এসেছিল, তাদের বংশধর। বামিয়ান অঞ্চলটাই এদের গড়। এরা বেশ গরিব, সেইজন্যেই বোধহয় অতিরিক্ত নিষ্ঠুর। এরা আফগানিস্তানে একটু কোণঠাসা। এক এদের চেহারার জন্যে, আর দুই, এরা সব শিয়া মুসলমান। তালিবানদের সঙ্গে এদের বনত না। এদের সাহায্যের জন্যে অবশ্য ইরান মাঝেমাঝে এগিয়ে আসত। মধ্য এশিয়ার কিছু লোক উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানে থাকে— মাজার-এ-শরিফ অঞ্চলে। এদের বলা হয় উজবেক। এরা হাজারাদের মতো বা তার থেকেও বেশি নিষ্ঠুর। 'উজবুক' কথাটা হয়তো এদের থেকেই এসেছে। এ ছাড়া আফগানিস্তানে থাকে নুরিস্তানি, তুর্কমেনি, কিরঘিজ, বালুচি আর কোচিরা। এরা সবাই মিলে আফগানি। কাজেই আফগানিস্তানের লোক মানেই যে পাঠান বা কাবুলিওয়ালা সেটা মোটেই ঠিক নয়।

সাধারণত আমেরিকা আর সাংবাদিকদের মাধ্যমে আমাদের বোঝানো হয় যে আফগানিস্তানে যত ভাঙচুর আর লোকসান সব তালিবানদের অত্যাচারে হয়েছে। আফগানিস্তানের আসল ক্ষতি হয়েছিল উনিশশো আশি থেকে উনিশশো পঁচানব্বই অবধি, যখন আমেরিকা প্লেন ভর্তি করে বন্দুক, গ্রেনেড, রকেট আর স্টিংগার মিসাইল সারা আফগানিস্তানে বিলি করেছিল। লক্ষ লক্ষ

লোক আমেরিকার এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় মারা গিয়েছিল আর তার দশগুণ আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। রুশরা আফগানিস্তান ছাড়ার পরে যখন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে অর্ধেক কাবুল ধ্বংস হয়েছিল। তালিবানরা আসার পরে এইসব খাওয়া-খাওয়ি মারামারি অনেকটা বন্ধ হয়েছিল।

এই তো হল আফগানিস্তানের অবস্থা। এবার দেখা যাক আমাদের কী অবস্থা হয় এখানে।

আগমনী

কাবুলের দিকে উড়ে যাচ্ছি। দূরে পর্বতশ্রেণী। মনে হল হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। অনেক নীচে একটা সবুজরঙের নদী দেখলাম। সেটা সিন্ধু হলেও হতে পারে। বিরাট বড় বরফে ঢাকা পাথুরে পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। দূর দূরান্ত অবধি জীবনের কোনও লক্ষণ নেই। হয়তো হিন্দুকুশ পাহাড় শুরু হয়ে গেছে। পাথর ও মাটি মেশানো পাহাড়— এগুলোর উচ্চতা একটু কম। দূরের পাহাড়গুলো এখন সমতলভূমির মতো লাগছে। সেখানেও কোনও সবুজ রঙের দেখা নেই। মনে হয় সেসব শুকনো মরুভূমির মতো জায়গা। ওপরে নীল আকাশে দেখা দিল একটা ছোট প্লেন। প্রবলপ্রতাপ সিং বলল, ওটা আমেরিকান বি-৫২ বম্বার। বম্বারটা একটা পাক ঘুরে আমাদের প্লেনের দিকে আসতে লাগল। সর্বনাশ! আশাকরি এরা আমাদের অজানা প্লেন ভেবে মিসাইল ছুড়ে দেবে না।

সেরকম অবশ্য কিছু হল না। খানিক পরে আমাদের প্লেনটা আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগল। তলায় দেখা দিল ছোটখাটো পাহাড় আর তার গায়ে খুচরো খুচরো মাটির বাড়ি। বাড়ির জটলার আশেপাশে শুকিয়ে যাওয়া ছোট ছোট ক্ষেত। একটি উপত্যকা— তার তলায় সমান দূরত্বে মাটিতে একরাশ ছোট ছোট ফুটো। এগুলো সম্ভবত আমেরিকার বম্বার প্লেনের বোমা ফেলার দরুন হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এটাই কাবুল?'

'এটা বাগরাম— কাবুল নয়। আমাদের এখানেই নামতে হবে কারণ আমেরিকানরা এই একটা এয়ারপোর্ট অক্ষত রেখেছে। এখান থেকে গাড়ি করে কাবুল যেতে হয়।' প্রবলপ্রতাপ বলল।

আমাদের প্লেনটা একটু দুমদাম লাফিয়ে অবশেষে বাগরাম এয়ারপোর্টে

থামল। প্লেনের পেছনের ডালাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল— ঠান্ডা হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে লাগল মুখে।

দূরে চারদিকে নানা উচ্চতার হিন্দুকুশ পাহাড়ের শ্রেণী। সেসব পাহাড়ে ছিটেফোঁটা ঘাস বা গাছও নেই। বাগরামে দুটো রানওয়ে— একটাতে ইউনাইটেড নেশনস্-এর প্লেন; অন্যটাতে আমরা। রানওয়ের চারদিকে ছোট ছোট ঝোপ, আর শুকনো ঘাস ও পাথর। একপাশে ভাঙা বাড়ি একটা, তাতে একটি বেঁকে যাওয়া টাওয়ার, যার থেকে দুটো ডান্ডা বেরিয়ে আছে— বোঝা যাচ্ছে এটাই এককালে এয়ার-ট্রাফিক কনট্রোল-এর টাওয়ার ছিল, আজ সেটা সম্পূর্ণ অচল। তার মানে আমরা বিনা রেডিয়ো সংকেতে বাগরামে উৎরে গেছি। এ যাত্রায় বাপ বাপ বলে বেঁচেছি। দূরে অনেকগুলো ভাঙা প্লেন, কিছু ছোট ছোট ফাইটার আর দুটো বড় প্লেন। মনে হয় সবই আমেরিকার বোমাতে নষ্ট হয়েছে।

পাঠানস্যুট পরা দাড়িওয়ালা এ-কে ৪৭ ধারী একজন লোক আমাদের পাসপোর্টগুলো নিয়ে গেল। রানওয়ের এককোনায় সে ও তার এক সঙ্গী মাটিতে থেবড়ে বসে তাতে ঝপাঝপ স্ট্যাম্প লাগাতে শুরু করল। এটাই হচ্ছে বাগরামের বিদেশি নাগরিকদের 'ইমিগ্রেশন কাউন্টার।'

রানওয়ের আরেক কোনায় এক পল্টন সৈনিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছ্যাবলামতো, নোংরা, বিশৃঙ্খল সৈনিকদের জটলাটা একটু নড়েচড়ে উঠল ইউনুস কানুনিকে দেখতে পেয়ে। তোজিকি ভাষায় বিকট জোরে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে কানুনিকে স্বাগত জানানো হল। কানুনি একটা ছোট প্রেস কনফারেন্স নিয়ে মার্সিডিজে চেপে কাবুলের দিকে রওনা হলেন। মুহূর্তের মধ্যে সব সাংবাদিক, ব্যুরোক্র্যাট ঝপাঝপ গাড়িতে উঠে গায়েব হয়ে গেল। আমরা ক'জন ডাক্তার, কম্পাউন্ডার ক্যাবলার মতো রানওয়েতে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবশেষে দুটো বিশাল রাশিয়ান লরি এসে দাঁড়াল। একটি একটি করে তিন টন ওষুধের প্যাকেট লরিতে তোলা হল। আমরা একটা মিনিবাসে চেপে সব জিনিস নিয়ে কাবুলের দিকে রওনা হলাম। মিনিবাসে আমরা সাতজন ভারতীয়— মি. রঞ্জিত কুমার, ডা. বালা, ডা. হরি, আমি, অপারেটিং অ্যাসিসট্যান্ট পিটার ও সুদীপ্ত, আর কম্পাউন্ডার শুকবীর। এই শুকবীর

মাসখানেক আগে দু'জন ডাক্তারের সঙ্গে কাবুল এসেছে; সে এখানকার পুরনো খেলোয়াড়, তাই আমাদের অভ্যর্থনা করে কাবুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ছাড়া সুদীপ্ত অন্যতম বাঙালি।

আমাদের মিনিবাস বাগরাম ছাড়ল। শহরের চারদিকে ভাঙা মাটির বাড়ি, কালো কালো জ্বলে যাওয়া গাড়ি আর ট্যাঙ্ক। রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড— "Mines on the side of this road. Do not step off the road." দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা ঘরবাড়ির ভিড়। আমাদের ড্রাইভার বোঝাল— ওটাতে তালিবানদের বাস ছিল, এখন সব ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে, সবাই পালিয়ে গেছে। রাস্তার দু'ধারে বোমা, রকেট ও বন্দুকের খালি কার্তুজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। খানিকটা পরে পরে একটা করে ছোটমতো মাটির ঘর, তাতে আফগানিস্তানের পতাকা উড়ছে, আর বাইরে একজন সৈনিক মেশিনগান নিয়ে বসে আছে। ঘরের দেওয়ালে আহমেদ শাহ মাসুদ-এর ছবি। এটাই এখানকার সেন্ট্রি পোস্ট। চারদিকের দৃশ্য বেশ ভয়াবহ। পেছন থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ও ঘড়ঘড়ে গলা পেলাম, "বাপরে কোথায় এলাম! একদম তিহার জেল।" বুঝলাম বাঙালির অবস্থা বেশ ঢিলে হয়ে পড়েছে।

আমেরিকান বোমা-খাওয়া একটা ভাঙা ব্রিজ এল। আমাদের মিনিবাস রাস্তা থেকে নেমে জলের ওপর দিয়ে পার হতে হেঁচকি তুলে থেমে গেল। ডা. বালা তখনই "যাই দেখি, মনে হয় ধাক্কা দিতে হবে" বলে প্রায় নেমে পড়ছিল। "বাইরে তো মাইন থাকতে পারে।" শুনেই সে 'ওরে ব্বাস' বলে একলাফে মিনিবাসের ভেতরে। রাস্তার দু'ধারে ভাঙা বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। একটু পর রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেল আর তাতে দেখা দিল হলদে রঙের টয়োটা করোলা ট্যাক্সি। ছেঁড়া জামাকাপড় পরা ছোট ছোট বাচ্চারা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। দূরে দেখলাম চারতলা ফ্ল্যাটের সারি, সব ফ্ল্যাটগুলো একরকম দেখতে, এক রং— যেন ছাঁচে গড়া। এগুলো সব রাশিয়ানদের তৈরি। বেশ একটা কম্যুনিজম্-এর ছাপ রয়েছে। শুকবীর একটা শুকনো নালামতো দেখিয়ে বলল, "এটা হচ্ছে কাবুল নদী।"

হলদে রঙের একটা বিরাট বড় দোতলা বাড়ি, তার একপাশটা ভগ্নস্তূপ। শুকবীর বলল, "ওপরের ঘরটায় তালিবানের কোন এক

হর্তাকর্তা ছিল। তাই নীচের ঘরটায় মাসুদের লোকেরা এসে বোমা লাগিয়ে গেছল।"

"তালিবান হর্তাকর্তারা ক'জন মরেছিল?"

"কেউ না। তারা তখন খেতে গিয়েছিল। আর এটাই হচ্ছে আমাদের কাবুল হোটেল।"

"এখানে কি এখনও তালিবানরা আছে? বোমাটোমা ফাটবে না তো?" শুকনো গলায় ডা. হরির প্রশ্ন।

"মনে হয় না।" শুকবীরের জবাব।

কাবুল হোটেল এককালে বেশ ভালই ছিল বোঝা যাচ্ছে। সামনে মস্ত বড় শুকিয়ে-যাওয়া বাগান, তাতে চারটে শুকনো গোলাপগাছ আর তিনটে ছেঁড়া রঙিন ছাতা। হোটেলের একপাশে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক— দা আফগানিস্তান ব্যাঙ্ক। অন্য পাশে আমির আবদুর রহমানের কবর। কবরের সামনের ফুটপাথে লাইন করে লোকেরা বসে বিশাল বিশাল রঙিন ইরানি ও আফগানি কার্পেট বিক্রি করছে। তার বেশির ভাগই অবশ্য কৃত্রিম; পারস্যদেশের গালচে নয়। ফুটপাথে লোকজনের আশেপাশে ছোট ছোট ছেলেরা আর হালকা নীলরঙের বোরখাপরা মেয়েরা ভিক্ষে চাইছে।

হোটেলের বাগানের পাশে চারপাঁচটা টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার গাড়ি আর তিনটে রুশি গাড়ি— তাতে নীল জ্যাকেট পরা রুশি পুলিশ বসে আছে। হোটেলে ঢুকেই একটা বিরাট লাউঞ্জ, তাতে পাঁচটা ময়লা সোফা ছাড়া কিছুই নেই। কাউন্টারে কোনও লোক নেই— একপাশে একটা পুরনো টেলিফোন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার পাশে এক দাড়িওয়ালা বুড়ো দারোয়ান ঝিমোতে ঝিমোতে রেডিয়ো শুনছে, হয়তো বা আফিমের নেশায় আছে। লাউঞ্জের এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের ঘরের দিকে। অন্যপাশে খাবার ঘরে যাবার রাস্তা। আমরা জিনিসপত্র নামিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ দুপুরের খাবার খেতে গেলাম।

খাবার ঘরটা বেশ বড়। মাঝখানে একটা চল্লিশ ফুট লম্বা টেবিল, তাতে ময়লা সাদা চাদর বিছানো রয়েছে, নুন মরিচ, ম্যাট বা ফুলদানির কোনও বালাই নেই।

খাবার এল— কাবুলি। এটা আফগানি পোলাও, তাতে কিসমিস,

গাজর, পেঁয়াজ ইত্যাদি দিয়ে সাধারণ পোলাওয়ের মতো করা। এরপরে এল কপির তরকারি, স্যালাড ও ডাল। ডালটা এখানে আগে রান্না হত না— ভারতীয় ডাক্তার এবং কম্পাউন্ডাররা মিলে বাবুর্চিকে শিখিয়ে শুরু করেছে। এরপর এল কাবাব। শুকনো মুরগির মাংস। খেতে খেতে দেখলাম পাঠানস্যুট পরা একটা লোক একটা কাঠের আলমারি খুলল। সেখান থেকে তিন ফুট লম্বা লম্বা কী সব একগাদা জিনিস বার করে তার লম্বা স্যুটের কোলে রাখবার চেষ্টা করল। বেশির ভাগই ধুপধাপ মাটিতে পড়ে গেল। লোকটা নির্বিকারচিত্তে সেগুলো তুলে ধপাস করে আমাদের টেবিলে রেখে গেল। এইগুলো হচ্ছে নান, বা আফগানি রুটি, তিন ফুট লম্বা, আট ইঞ্চি চওড়া আর আধ ইঞ্চি মোটা। প্রধানত আটা দিয়ে তৈরি। দিনসাতেক রেখে খাওয়া যেতে পারে। আমাদের গুলো কত পুরনো সেটা জানবার অবশ্য উপায় নেই।

আমরা সেই তিনফুটি নানগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তরকারি আর মাংসের সঙ্গে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। খাবার শেষে এল কলা ও তারপরে এল গেলাস ও কেটলি করে চা। খাবার পরে চা খাওয়াটাই এখানকার রেওয়াজ। আফগানিরা অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টায় পঁচিশবারও চা খেয়ে থাকে। বিনা দুধে, বিনা চিনির ফিকে চা পাতার হালকা খয়েরি রঙের চা খেতে মন্দ নয়। একজন বাটিভর্তি ক্যান্ডিও দিয়ে গেল।

শুকবীর বলল, " ওটার একটা মুখে ঢোকান, তারপর চা খান। তা হলে চাটা হালকা মিষ্টি লাগবে। এই চা বেশি খেলেও অম্বল হয় না। এককালে রাস্তার কোনায় কোনায় 'চা-খানা' খুব দেখা যেত। সেখানে আফগানিরা চা খেতে খেতে গল্প করত। অবশ্য সেসব এখন আর কিছুই নেই।"

আমাদের হোটেলের একটা ঘরে আমি, ডা. বালা এবং দূতাবাসের একজন লোক— অশোক খেরা— রইলাম। অশোক খেরার বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, ভাঙা দাঁতের মাঝখান দিয়ে বড্ড বেশি কথা বলে। জামাকাপড়ের বিশেষ শ্রী নেই। সোয়েটারের তলা দিয়ে শার্ট ও গেঞ্জি বেরিয়ে থাকে। খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি আর মাঝারি সাইজের একটা ভুঁড়ি। অশোক খেরা মাংস খায় না। শুধু স্যালাড, নান আর কপির তরকারি খায়, আর প্রায়শই রকমারি সুরের বায়ু নিঃসরণ করে। সে এখন শোবে আমার পাশের খাটটায়।

হোটেলের বাথরুমে গরমজলের কোনও বালাই নেই, আর সেন্ট্রাল হিটিংটা কাজ করে না। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আছে ছোট একটা রুম হিটার— উপরন্তু শুনতে পেলাম আমাদের ঘরের বাথরুমটা বাকি সব ডাক্তাররা ব্যবহার করবে কারণ তাদের ঘরে কোনও বাথরুম নেই। বাঃ! একেবারে চমৎকার! ভালই কাটল বিয়ের তারিখটা।

কাবুল

কাবুল হোটেলে মোটামুটি ভিড়। কিছু রুশি সৈনিক আছে, তবে বেশিটাই ভারতীয় দূতাবাসের লোক। ডাক্তার, কম্পাউন্ডার আর কিছু সাংবাদিক। দূতাবাসের একজন তো অশোক খেরা— যার কথা আগেই হয়েছে। মি. রঞ্জিত কুমারের ঘরের সাথী ডা. কুরেশি। ইনি এককালে ফার্সিতে পড়াশুনো করে বিদেশ মন্ত্রালয়ে দোভাষীর চাকরি নিয়ে ঢুকেছিলেন— দরি ভাষায় যাকে বলে 'তারজুমান'। গত ছাব্বিশ বছরে তিনি অনেকবার আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান আর উজবেকিস্তানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিদেশ মন্ত্রালয়ে পদোন্নতি হতে হতে তিনি এখন কাউন্সেলর হয়েছেন। ডা. কুরেশিকে কাবুলের বেশির ভাগ হর্তাকর্তারাই চেনেন। ডা. কুরেশিও নিজেকে রাজা জাহির শা-র ছেলে মনে করেন। ভাবটা যেন— আমিই সর্বঘটে কাঁঠালি কলা, তোমরা তো কাঁচকলা।

গৌতম মুখোপাধ্যায় এখানকার দূতাবাসের প্রধান অধিকারী। জয়েন্ট সেক্রেটারির পদে আই এফ এস থেকে অনেক দেশবিদেশ ঘুরেছে, ইংরেজির ওপর দারুণ দখল আর কথাবার্তায় বেশ চালাক চতুর। সারাদিন টাই-স্যুট আর কুলুর টুপি পরে মার্সিডিজ গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায়। এর প্রধান কাজ কাবুলে নতুন করে ভারতীয় দূতাবাস গড়ে তোলা। গৌতম মুখোপাধ্যায়কে সাহায্য করছে একজন ডাইরেক্টর, তার নাম আজাদ সিং তুর। এই লোকটিকে দার-এস্-সালাম থেকে আনা হয়েছে কাবুলে। বছর পাঁচেক আগে যখন তালিবানদের আক্রমণের দরুণ কাবুলের দূতাবাস বন্ধ হয়েছিল, তখন তুর সেখানে ছিল। রোজ নাকি তখন তিরিশ থেকে চল্লিশটা রকেটের হামলা হত কাবুলের ওপর। (এ গল্পটা অবশ্য তুর আমাদের গত একদিনে ছাপান্নবার শুনিয়েছে!) তুরের অবস্থা আপাতত একটু ঢিলে কারণ তার নাক থেকে অনর্গল জল পড়ছে। আর সে নাকি কাল সারারাত হেঁচেছে।

উপস্থিত সে ডা. হরির কাছে চিকিৎসা করাচ্ছে। গান বাজনার শখ আছে তার, তাই সে তানজানিয়া থেকে একটা ছোট্ট হারমোনিয়াম নিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝেই সে 'হ য ব র ল'-র ন্যাড়ার মতো 'গান গাইতে বোলো না' বলে এবং পর মুহূর্তেই খুব দরদ দিয়ে গান গাইবার চেষ্টা করে। আশেপাশের আফগানিরা নেহাতই বেশ জরাজীর্ণ— দীর্ঘদিনের যুদ্ধ ও অত্যাচারের ফলে— তাই তারা আর কিছু বলতে সাহস করে না। এ ছাড়া দূতাবাসের কিছু ভারতীয় দারোয়ানও এই হোটেলে উঠেছে।

আমাদের পাশের ঘরে উঠেছে 'আজ তক'-এর প্রবলপ্রতাপ সিং ও রাজীব গুপ্তা। আরেকটা ঘরে আছে ডা. হরি, ডা. নাথ, ডা. পুরী আর ডা. রাও। ডা. পুরী আর ডা. রাও, তিনজন কম্পাউন্ডার, শুকবীর, তিওয়ারি ও রামপ্রসাদকে নিয়ে মাসখানেক আগে কাবুলে এসেছিল। এরা আপাতত ভারতসরকারের তৈরি কাবুলের ইন্দিরা গাঁধী হাসপাতালে একটা ডিসপেনসারি খুলে ডাক্তারি করছে। আমরা এই হাসপাতালেই— ওখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে মিলে চিকিৎসায় সাহায্য করতে এসেছি।

কাবুল হোটেলের একপাশে আমির আবদুর রহমানের কবরের পাশ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কবরের বেড়ার ধারে সার দিয়ে কার্পেটওয়ালারা বসে আছে। কারুর কাছে রয়েছে উলের মাজার-এ-শরিফের কার্পেট, কেউ বিক্রি করছে ইরানের কৃত্রিম কার্পেট। বেশির ভাগই লালচে রঙের আর তাতে বেশ নিখুঁত কাজ। সব মিলিয়ে ভারী ঝলমলে রঙিন ব্যাপার। কৃত্রিম কার্পেটের দাম বলল, সত্তর ডলার। দু'মিটার বাই তিন মিটার অথবা ছ'বর্গমিটার কার্পেট সেটা। অবশ্য দরদাম করলে আরও কমে পাওয়া যাবে বলে মনে হল।

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি। আমরা এখন 'ফোরেনার'— আমাদের উপস্থিতিতে সবাইকার প্রচণ্ড কৌতূহল। সবাই কাজকর্ম থামিয়ে হাঁ করে আমাদের দিকে দেখছে। যাদের একটু বেশি সাহস তারা এগিয়ে এসে উর্দু ও ফার্সি মিলিয়ে জিজ্ঞেস করল কোথা থেকে আসছি আমরা। হিন্দুস্থান শুনে তারা ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে আশেপাশের লোকদের জড়ো করতে লাগল। হিন্দুস্থানিরা যে কত ভাল, আফগানিদের কতজন্মের বন্ধু— সেটা বোঝাবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা আমাদের ভীষণ ভালবাসে আর পাকিস্তানিদের খুব ঘেন্না করে। একজন লোক— "পাকিস্তান, ইয়া থুঃ"— বলে ফুটপাথে থুতু ফেলল।

তারপরেই তর্জনী দিয়ে গলার ওপর একটা অদৃশ্য ছুরি চালিয়ে দিল। বোঝা গেল ঘেন্নাটা খুব প্রবল!

এসে দাঁড়ালাম একটা বড় চৌরাস্তায়। একপাশে পনেরো তলা উঁচু অক্ষত বাড়ি; সেটা এখানকার টেলিফোন দপ্তর। চৌরাস্তার একপাশে প্লাজা হোটেল এবং তার উলটোদিকে বিরাট বাজার। এ জায়গাটায় বেজায় ভিড়। ঠেলাগাড়ি করে জুতো আর জামাকাপড় বিক্রি হচ্ছে। বেশির ভাগই বিদেশিদের 'এড'-এর জামাকাপড়। কিছু জামাকাপড়, ছেঁড়াখোঁড়াগুলো— হয়তো বা সেকেন্ডহ্যান্ড কিংবা তালিবানদের দেহ থেকে খুলে নেওয়া। এ সবের খদ্দের বেশির ভাগই হালকা নীলরঙের বোরখাপরা মহিলা। কিছু মহিলার সঙ্গে ছিল পুরুষমানুষও, তবে বেশির ভাগই বাচ্চা কোলে, বা একলা। এদের জরাজীর্ণ বোরখা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এরা সব ভিখিরি। অন্য পাশে বিভিন্ন মাপের ঠেলা গাড়িতে ফল, সিগারেট, তামাক, আখরোট, কিসমিস, পেস্তা, চিলগোজা বিক্রি হচ্ছে। একটা ঠেলায় দেখলাম লালরঙের ডিম। কোন পাখির বুঝলাম না। ঠেলাওয়ালা ভাঙা উর্দুতে বলল ওটা মুরগিরই ডিম, ঈদের জন্যে লাল রং করা হয়েছে।

ডা. বালা বলে উঠল, "সিগারেট খাওয়া যাবে? তালিবানরা গুলিটুলি ছুড়বে না তো?"

বলি, "ঠেলায় যখন খোলাখুলি বেচছে তখন খাওয়া যেতে পারে। ওই তো একজন খাচ্ছে দেখছি।"

ডা. বালা স্বস্তির সঙ্গে সিগারেট ধরাল।

প্লাজা হোটেলের সামনের বাজারটায় ঢুকলাম। এখানে রাশি রাশি ইলেকট্রনিক জিনিস ও ক্যামেরার দোকান। এগুলো অবশ্য মাস তিনেক আগে এ তল্লাটে পাওয়াই যেত না।

আমরা একটা ছোটখাটো দোকানে ঢুকলাম। দোকানটায় ঠাসা টিভি, ভিসিডি, ক্যামেরা, রেডিয়ো— জাপানি বা চিনে কোম্পানির তৈরি। মনে হয় কিছু কিছু জিনিস সেকেন্ড হ্যান্ড।

"আসসালাম ওয়ালেকুম। খৈরিয়াৎ অস্ত্?"

দোকানদারের প্রশ্নে আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর আবার— "ও দরি না ফামেদি? কোঈ বাত নহি, উর্দুমে বাত করো। কিধরসে আয়া?"

"হিন্দুস্থান।"

"বহুত্ খুব। হিন্দুস্থানি বহুত্ আচ্ছা লোগ। হমারা দোস্ত্ হ্যায়। চায়ে পিয়েগা?— বোলো, ক্যা খিদমত করেঁ?"

ডা. বালার ক্যামেরার ব্যাটারি কেনার ছিল। দোকানদার দু'রকম ব্যাটারি দেখিয়ে কম দামেরটা বলল— "ঈ খুব নি অস্ত্"। বেশি দামেরটা ধরিয়ে বলল, 'ঈ খুব অস্ত্।" ডা: বালা ভীষণ কায়দা মেরে বলল, "দেখছিস কীরকম আমায় বোকা বানিয়ে বেশিদামের জিনিসটা ধরাচ্ছে? কিন্তু আমি ওর চেয়ে ঢের বেশি চালাক," দুটো কমদামের ব্যাটারি ও কিনে ক্যামেরাতে ঢোকাল। ক্যামেরাটা চলল না। দোকানি তখন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি তো আগেই বলেছিলাম ওটা ভাল না। "ঈ পঠানকা জুবান হ্যায়।" এগুলো আমরা পাকিস্তানি ও তালিবানদের দিতাম। তাই তোমার জন্যে ভাল ব্যাটারিটা দিয়েছিলাম।

ডা. বালা তখন হাঁড়িমুখ করে অন্য আরও দুটো ব্যাটারি কিনে চারটের দাম দিল।

ফুটপাথটা যেখানে শেষ হল সেখানে একরাশ হলদে টয়োটা স্টেশনওয়াগন ট্যাক্সি— সবই দুবাই থেকে সেকেন্ডহ্যান্ড কেনা, এক আধটা রুশি লাডা ট্যাক্সিও দেখলাম। ট্যাক্সি থেকে ছোট ছোট ছেলেরা চিৎকার করছে— "কারতে পরবান, কারতে চার, মেকুরিয়ান, কারতে শে— " ইত্যাদি।

এগুলো সব কাবুলের এলাকার নাম, আর এইসব ট্যাক্সি শেয়ারে সেখানে যাচ্ছে। অবশ্য বেশি টাকা দিলে পুরো ট্যাক্সিও করা যেতে পারে। মহিলারাও যেতে পারে তবে যদি চারজন পুরুষ আর তিনজন মহিলা থাকে তা হলে মহিলারা বসবে পেছনে— স্টেপনির ওপরে এবং পুরুষরা বসবে সামনের দুটো সিটে। এটাই এখানকার রেওয়াজ।

আমরা একটা পাহাড়ের পাশে এসে পড়লাম। তার গায়ে খুপরির মতো একগাদা ছোট ছোট বাড়ি; মনে হচ্ছিল পায়রার বাক্স যেন। অনেকটা লাদাখের কোনও বৌদ্ধ মনাস্ট্রির মতো। মাটির দেওয়ালওলা দু-একটা ঘরে ওই ভাঙা ভাঙা বাড়ির বসতির মধ্যেই বাচ্চারা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে ফুটবল খেলছে বা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। একটা জায়গায় দেখলাম কয়েকটা ছেলে আখরোট নিয়ে মারবেল খেলছে। পাহাড়ের মাথায় কাবুলের টেলিভিশন টাওয়ার যেটা তালিবানরা ধ্বংস করে দিয়েছে। এই পাহাড়ের নাম—'কোহে আসামাঈ।'

হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি আমাদের পেছু পেছু পাঁচ-ছ'টা মেয়ে আসছে। তার মধ্যে চারটে নীল বোরখা পরা, আর দুটোর মাথা ও বুক ওড়না দিয়ে ঢাকা। শুধু চোখ, নাক আর কিছুটা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তারা অপরূপ সুন্দরী। ফর্সা গোলাপি রং, টিকোলো নাক আর টানা চোখ। তারা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের ধাওয়া করল আর আমরা সেটা দেখে ইচ্ছে করেই আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম; মেয়েগুলোও তাইই করল। হয়তো অন্যদের মতো তাদেরও আমাদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু আশেপাশে পুরুষমানুষ দেখে সাহস পাচ্ছিল না। শেষে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। মেয়েগুলো আর কোনও উপায় না দেখে আমাদের পেরিয়ে গেল আর যাবার সময় 'হিন্দুস্থানি ইন্ডিয়া আচ্ছা হ্যায়, হি হি' বলতে বলতে গেল।

ভাবতে আশ্চর্য লাগছিল যে তিনমাস আগেও এ ধরনের ঘটনা— ঘুড়ি ওড়ানো, খেলাধুলো করা— কাবুলে কারুর কল্পনারও বাইরে ছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তালিবানের শাসন এবার শেষ হয়েছে, এবং হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে যেন সবাই। বোরখাগুলো সরতে হয়তো সময় লাগবে। তবে ওগুলো সরাবার জন্যে এখানকার সব মেয়েরাই আগ্রহী।

তালিবান

প্রায় রোজই বিকেলে আমরা কাবুল হোটেল থেকে হাঁটতে বেরোই। সেরকম একদিন আমরা যখন 'কোহে আসামাই'-এর দিকে যাচ্ছি; তখন একজন অচেনা লোক আমাদের সামনে এসে বলল, "মাপ করবেন, আপনাদের কি কোনও দোভাষী দরকার?"

আমরা এদিক ওদিক চাওয়াচায়ি করে তাকে বোঝালাম যে আমাদের নিজেদেরই কোনও ঠিকঠাক ব্যবস্থা নেই; হলে পরে জানানো হবে। লোকটির নাম নাকিবুল্লা, আর সে, আমাদের ভারতীয় দেখে কিছু সাহায্যের আশায় এই প্রস্তাবটা রেখেছিল। এককালে কাবুল রেডিয়ো ও টিভিতে কাজ করত। কখনও খবর পড়ত, কখনও বা সাংবাদিকের কাজ। বছর পাঁচেক আগে যখন তালিবানরা কাবুল কব্জা করে তখন রেডিয়ো ও টিভি স্টেশন বন্ধ হয়ে যায়— তারপর থেকেই বেকার।

নাকিবুল্লার কাছে তালিবানদের সম্পর্কে জানতে চাইলাম। সে বলল, "তালিবানরা আফগানিস্তানটা বরবাদ করে দিয়েছে। সারা দুনিয়া যখন এগিয়ে যাচ্ছে তালিবানরা তখন আমাদের দেশটটাকে পাঁচশো বছর পেছনে নিয়ে গেছে। যাদের বড় ব্যবসা ছিল তারা সবাই হয় পাকিস্তান, নয় ইরান বা আমেরিকা চলে গেছে। ছোটখাটোদের মধ্যে যারা তালিবানদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকতে পেরেছে, থেকেছে— নয়তো মারা পড়েছে।"

"এদেশে তালিবান ঠিক কাদের বলা চলে?"

"ওরা যে কী তা ওরাই জানে। তবে ওরা যে পাকিস্তানের সাহায্য নিয়েছিল সেটা আমরা সবাই জানি। অনেকেই ছিল আফগানিস্তানের বেকার যুবক। যারা দাড়িটাড়ি বাড়িয়ে একটা স্রোতের মধ্যে ভেসে যাচ্ছিল। তবে আফগানিরা কেউই পাকিস্তানিদের দেখতে পারে না। ওরা আমাদের মুলুককে বরবাদ করে দিয়েছে।"

"শাসন খুব কড়া ছিল শুনেছি?"

"তালিবানদের কাছে বন্দুক ছিল; ওরা যা ইচ্ছে তাই করত। মেয়েরা বাড়ির কাজ করত, বাইরের কাজ করা বারণ ছিল। একলা রাস্তায় বেরোলেই মার খেত। হয় শৌহর নয়তো আব্বাজান বা ভাইয়ের সঙ্গেই বাইরে বেরোবার অনুমতি ছিল। তবে সেই সময়ও যদি বোরখার তলা দিয়ে হাই হিল জুতো বা নখে নেল পালিশ দেখা যেত তা হলে শৌহর বা আব্বার সামনেই সপাসপ চাবুক মারত তালিবানরা মেয়েটাকে। গানবাজনা বা বেশিরকমের হৈ-হল্লা পছন্দ ছিল না তালিবানদের। বিয়ে বাড়িতেও গানবাজনা হত না; বিয়ে হচ্ছে না মৃত্যুসভা বোঝার উপায় নেই। বরবউ চুপচাপ বিয়ে করে নিজের বাড়ি চলে যেত। কারুর পকেট থেকে যদি গানের ক্যাসেট বেরোত, তা হলে কুড়ি দিন জেল হত তার। তা ছাড়া সৈনিকদের মারধর ও অত্যাচার তো আছেই।"

"তোমার নিজের কোনওরকম গণ্ডগোল হয়নি?"

"হয়েছিল। একদিন আমায় কিছু তালিবান সৈনিক পাকড়ে ধরে বলেছিল— তোমার দাড়ি এত ছোট কেন? আমি বলেছিলাম— লম্বা দাড়ি আমার হয় না, কম চুল তাই পাতলা দাড়ি হয়। দ্যাখো আমার মাথার চুল দ্যাখো, তারা সেকথা শুনল না, আমায় জোর করে জেলে পুরে দিল। সেখানে মারধর করত; দাড়ি ছোট রাখার শাস্তিতে আমার পুরো দু'মাস জেল হয়েছিল।"

নাকিবুল্লা যাবার আগে চাকরির জন্যে আর একবার মিনতি করে গেল। আসামাঈ পাহাড়ের বস্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে গেল যে ওখানেই সে কোনওরকমে ঘরসংসার করছে।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম কোনও গানবাজনা নেই, বাচ্চাদের জন্যে খেলনা, বেলুন নেই, সিনেমা, টিভি, এমনকী ছবির দোকান পর্যন্ত নেই — এমন আফগানিস্তান। ভয়ঙ্কর লাগল। পুরোটা ভাবতেও পারলাম না।

তৈরালার কথা

আমাদের মিনিবাসের ড্রাইভারের নাম তৈরালা। রোগাপ্যাঁটকা চেহারা, মুখে ছোট ছোট খোঁচা দাড়ি, পাঠান স্যুটের ওপর কোট পরে। বিশেষ হিন্দি বা উর্দু জানে না, তবে কাজের কথা ইসারা-ইঙ্গিতে ফার্সিভাষায় বুঝিয়ে দেয়। বাঁ-হাতি মিনিবাসটা চালায় ভালই। ক্রমশ তার সঙ্গে আমাদের ভাব হল। সে একদিন বলল, "আমি ছিলাম রাষ্ট্রপতি নাজিবুল্লার সময়ে পুলিশের চাকরিতে। মাইনেপত্র ভালই ছিল। তারপরে যখন বুরহানউদ্দিন রব্বানির সরকার এল আর ছুটপুট গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল, তখনও আমি এদিক সেদিক দপ্তরে কাজ করতাম। অবশেষে যখন তালিবানরা এল, তখন আমি গ্রেপ্তার হলাম। কারণ আমি নাজিবের পুলিশে কাজ করতাম। ওরা আমাকে তেরো মাস জেলে বন্দি করে রেখেছিল। রোজ মারধর করত। খেতে দিত একটা নান আর একবোতল জল। এই দ্যাখো আমার হাতে মার খাবার দাগ।" বলে তৈরালা তার হাতের জখম দেখাল।

"তারপর কি হল?" আমি জানতে চাইলাম।

"আগে আমার চেহারাটা বেশ মোটা, তাগড়া ছিল।" তৈরালা হুম করে গাল ফুলিয়ে দেখাল। "জেলে থেকে আমি রোগা হয়ে গেলাম। অবশেষে আমি কুড়ি লক্ষ আফগানি ঘুষ দিলাম জেলারকে। এইসব করে জেল থেকে পালালাম।"

"এই যে এখন তালিবানরা সব হেরে গেল, তুমি কিছু করোনি?"

তৈরালা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, "জালিম ছিল ওরা সবাই। ওরা যখন কাবুল ছেড়ে পালাচ্ছিল তখন আমি ছ'টা তালিবানকে মেরেছিলাম। একটা তো ছাত দিয়ে পালাচ্ছিল, সে নীচে গিয়ে পড়ল।"

"তালিবানদের মারলে কী করে?"

"কেন? আমার কাছে দুটো এ-কে ৪৭ আছে তো। একশো ডলার দিয়ে

কিনেছিলাম। অবশ্য এখন দাম কমে গেছে। তোমাদের চাই তো বলো। আমি একটা রেখে দেব, অন্যটা তিরিশ ডলারে দিয়ে দিতে পারি। সঙ্গে দুটো ম্যাগাজিন মুফত।"

তাই শুনে আমরা সবাই হাত-পা ছুড়ে হাঁইমাই করে উঠলাম। ওরে বাবারে পাগল নাকি! এক সঞ্জয় দত্ত হাজতে গেছে, আমাদের হয়তো ফাঁসিই হয়ে যাবে।

তৈরালা বলল, "হিন্দুস্থানের উচিত পাকিস্তানকে আক্রমণ করা। ওরা আমাদের দেশটা খতম করে দিয়েছে। আর যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়, তা হলে আমি যুদ্ধে যোগ দেব।"

তৈরালা মিনিবাস চালাতে চালাতে হাত-পা ছুড়ে আমাদের গল্প শোনাচ্ছিল। শেষে সে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে আমাকে মিনিবাসটা চালাতে হল। বিদেশি হিন্দুস্থানি কাবুলের ডানহাতি ট্রাফিকে দিব্যি মিনিবাস চালাচ্ছে দেখে তৈরালা ভীষণ গদগদ ও খুশি। সেদিন থেকে তৈরালা আমাদের আন্তরিক বন্ধু হয়ে গেল।

জান মহম্মদ

জান মহম্মদ বলে একজন বেশ সাদাসিধে লোকের সঙ্গে আলাপ হল। সে এককালে ভারতীয় দূতাবাসে তারজুমান (দোভাষী)-এর চাকরি করত। এখন দূতাবাস খোলার খবর পেয়ে সে আবার দূতাবাসের লোকেদের কাছে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে।

জান মহম্মদ বলল, "তালিবানরা এসে আমাকে গ্রেপ্তার করল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ— আমি ভারতীয়দের সহায়তা করি এবং ঠিক লোককে ভিসা দিই না। বললাম, 'আমি ভিসার ব্যাপারে কিছু জানি না, ওটা অন্য লোকেরা দেয়।' তালিবানরা আমার কথা শুনল না। আমায় জেলে নিয়ে গিয়ে খুব মারল গাড়ি টানার চেন দিয়ে। তারপরে আমার হাত দুটো পেছন দিকে বেঁধে দিয়ে দুটো বাঁধা হাতের মাঝখানে একটা ডান্ডা ঢুকিয়ে দড়িবাঁধা হাত দুটোকে ঘুরিয়ে দিল। আমি কাঁদলাম, খুব কাঁদলাম; আমার হাত দুটো নীল হয়ে গেল। শেষে তালিবানরা বলল, 'এই হাত দিয়েই তুই ভারতীয়দের সহায়তা করেছিস।' বলে আমায় ছেড়ে দিল। আমি সেই রাত্রেই আমার বউ ও তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে পেশোয়ার পালিয়ে গেলাম। চার বছর ওখানে ছিলাম; টাইপিস্ট-এর কাজ করতাম। এই অগাস্ট মাসে আমার অস্ট্রেলিয়ার ভিসা হয়ে গেছল। আমি বেরোবার দশদিন আগে এগারোই সেপ্টেম্বরের কাণ্ডটা হয়ে গেল, আর সব আফগানিদের ভিসা বাতিল হয়ে গেল। তারপর যখন তালিবানদের রাজত্ব শেষ হল, তখন আমি ফিরলাম এখানে। অবশ্য এখনও পেশোয়ারের আশেপাশে কুড়ি-পঁচিশ লক্ষ আফগানি আছে। তারা বোধহয় নতুন সরকার গঠনের পরই ফিরবে।"

ড. কুরেশি যা বলেন

দূতাবাসের ড. কুরেশির সঙ্গে আলাপ হল। বেশ হামবড়া তবে কথাবার্তা গুছিয়ে বলেন। তালিবান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, "আসলে ওভাবে খুচখাচ ঘটনা দিয়ে তালিবানদের যাচাই করা যায় না। রুশিরা আফগানিস্তান ছাড়ার পরে এখানকার অবস্থা চরম বিপর্যস্ত হয়ে গেছল। সারা দেশে অজস্র হাতিয়ার, স্থায়ীভাবে কোনও সরকার নেই, আর দিনের পর দিন গৃহযুদ্ধ। ইসলাম ধর্মের ব্যাপারটা তো ছেড়েই দাও। সেইরকম এক পরিস্থিতিতে যখন কান্দাহারের কাছে এক মোল্লা আর তার কিছু ছাত্র লোকেদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করে, তখন সবাই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখল। এই মোল্লার দলবলের বক্তব্য ছিল গৃহযুদ্ধ থামানো আর ইসলাম ধর্মটা ঠিকভাবে পালন করা। মনেপ্রাণে সব আফগানিরাই সেটা চেয়েছিল। তা ছাড়া এদের ইন্ধন জুগিয়েছিল পাকিস্তান আর তেলপিপাসু আমেরিকা। আমেরিকা চেয়েছিল আফগানিস্তানে একটা স্থায়ী সরকার। সেদিক থেকে যদি দ্যাখো তা হলে গত পাঁচ বছরে আফগানিস্তানের তালিবানি সরকার পুরোপুরি স্থায়ী ছিল। খুনখারাবি চুরিডাকাতি কম ছিল অনেক। অবশ্য ইদানীংকালে এসব আলকায়দা-ফায়দা ঢুকে পুরো ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে পড়েছে। যাই হোক এখন তো সে সব ইতিহাস। আশা করি এবারে আফগানিস্তানের বরাত ফিরবে।"

মনে হল ড. কুরেশি যেন তালিবানের পক্ষপাতী। তবে উনি অনেকদিন এইসব অঞ্চলে ঘোরাফেরা করেছেন। পড়াশুনোও আছে বিস্তর। আর নানান দলের নেতাদের চেনেন। পুরো ছবিটা হয়তো রাজনীতিবিদের দৃষ্টিতে দেখছেন, সাধারণ লোকের হয়রানিগুলো মনে হয় চোখে পড়ছে না ওঁর।

আফগানি

আমরা যখন কাবুলে এসেছিলাম তখন ডা. পুরি আমাদের বলেছিলেন— এখানকার লোকেরা সবাই লাখোপতি। তার মানে?

আফগানিস্তানের টাকা হচ্ছে আফগানি। তিরিশ বছর আগে, রাজা জাহির শাহের সময়ে পাঁচ-ছয় আফগানির দাম ছিল এক ডলার। তারপর দীর্ঘদিন— তেইশ বছর যুদ্ধের দরুণ আফগানির দাম ধীরে ধীরে কমে যায় এবং তালিবানদের সময়ে এক ডলারে আশি হাজার আফগানি পাওয়া যেত। নিউ ইয়র্কের 'নয় এগারো'-র পরে যখন তালিবান সরকারের পতন হয়, আর ডা. পুরির দল কাবুলে পৌঁছয়, তখন এক ডলারে চল্লিশ হাজার আফগানি পাওয়া যাচ্ছিল। দেশের অবস্থা ভাল হবে, সব যুদ্ধ থেমে যাবে— এই আশাতেই আফগানির দাম দ্বিগুণ হয়ে পড়েছিল। এখন এক ডলারে তিরিশ হাজার আফগানি। কোনওরকম কেনাকাটা করলেই লাখ লাখ আফগানি দিতে হয়। কাজেই, আফগানিস্তানের সবাই লাখোপতি।

আমার একদিন একটা চামড়ার জ্যাকেট বেশ পছন্দ হল। অনেক দরদাম করে, 'দোস্ত অস্ত, হিন্দুস্থানি অস্ত' বলে কাকুতি মিনতি ঝগড়াঝাঁটি করে দাম সাব্যস্ত হল পাঁচলাখ আফগানি। ভাবলাম পয়সাটা ডলারে দিয়ে দিই। হিসেব করে দাঁড়াল প্রায় সতেরো ডলার। দোকানদারকে দিতে সে বলল, "সতেরো ডলার? না না ওটা পঁয়ত্রিশ ডলার হবে।"

"পয়ত্রিশ ডলার? পাগল নাকি? পাঁচলাখ আফগানি বললে তো। এক ডলারে তিরিশ হাজার আফগানি পাওয়া যায়। তা হলে কত হল বলো?"

"তিরিশ হাজার! নি অস্ত, নি অস্ত। আজ ডলারের দাম তো পড়ে গেছে; আজ এক ডলারে পনেরো হাজার আফগানি পাওয়া যাচ্ছে। সেই হিসেবে পঁয়ত্রিশ ডলার হচ্ছে।"

আমি তো হাঁ। এ আবার কী ব্যাপার? এরকম হয় নাকি? এক হপ্তায়

ডলারের দাম এত পড়ে গেছে! ইস! যদি আসামাত্র একরাশ আফগানি কিনে রাখতাম তা হলে আজ সেটার দাম দু'গুণ হয়ে যেত। ছুটলাম শাহজাদা বাজারের দিকে।

শাহজাদা বাজার হচ্ছে কাবুলের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর দালাল স্ট্রিটের মিশ্রণ। এখানে শেয়ার পাওয়া যায় না, তবে রোজ আফগানির দাম ওঠানামা করে। টেলিফোনের বিনিময়ে ব্যবসাদারের মতিগতির খেয়ালে আর রাজনীতির অবস্থা দেখে আফগানির দামটা ঠিক করা হয়। কাবুল নদীর ধারে একটা বাজারের মাঝখানে এক দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িতে ছোট ছোট খুপরির মতো ঘর। প্রত্যেক ঘরে দু'তিনটে দাড়িওয়ালা পাগড়িপরা আফগানি বসে রয়েছে। কিছু ঘরে লোকের ভিড়, কিছু ঘর ফাঁকা। বাড়ির মাঝখানে উঠোনের মতো একটা খোলা জায়গা। সেখানে অজস্র লোকের ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই। তারা সবাই "ডলার, কালদার, আফগানি" বলে বলে হালকা আওয়াজে চ্যাঁচাচ্ছে। কেউ বা উবু হয়ে বসে চা খাচ্ছে। সবার পায়ের কাছে দুটো দুটো বস্তা ভরে আফগানি টাকা। এরা সব এই বাজারের ছোট দালাল। কালদার হচ্ছে পাকিস্তানি টাকা এবং এখানকার সব ব্যবসাই কালদারের মাধ্যমে হয়। পেশোয়ার থেকে কাবুলে ফোন আসে, যাতে পাকিস্তানি কালদার আর আফগানির দাম বিনিময় হয়। তারপরে ডলার ইউরো ইত্যাদির দাম ঠিক করা হয়। ভারতীয় টাকার কোনও নামগন্ধ নেই এ বাজারে।

আমরা একটা ঘরে ঢুকলাম। যখন ডলার বদলানো হচ্ছিল তখন একটা স্যুটপরা লম্বাচওড়া আফগানি ঢুকল। পকেট থেকে দু'হাত দিয়ে দু'গোছা ডলার বার করে দোকানদারকে ধরাল। পনেরো মিনিট ধরে হিসেব হল; প্রথমে ডলার ও কালদার, তারপরে কালদার ও আফগানি। স্যুটপরা লোকটা দোকানদারকে "তশক্ খুর" বলে একবস্তা আফগানি নিয়ে চলে গেল। ডা. বালা বলল, "কী আশ্চর্য! টাকার নাম আর লোকেদের নাম এক। একেবারে মানুষটাকা টাকামানুষ।"

গুলবাহার

লাখোপতিদের বাজার থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা ভিডিও ক্যাসেটের দোকানে ঢুকলাম। এই ধরনের দোকান ইদানীং হয়েছে এখানে। হিন্দি সিনেমার খুব চল। বেশির ভাগ লোকই একবর্ণ বুঝতে পারে না তবু হাঁ করে সেসব সিনেমা দেখে। কিছু লোক অবশ্য সেই সমস্ত সিনেমা দেখেই ভাঙা ভাঙা হিন্দি ও উর্দু শিখে গেছে। এখানকার প্রচুর লোক হিন্দুস্থান বলতে বম্বে আর বলিউডকেই জানে। অমিতাভ বচ্চনের 'খুদাগাওয়া' আর ধর্মেন্দরের 'ধর্মাত্মা' সিনেমার অনেক অংশ আফগানিস্তানে তোলা হয়েছিল। লম্বা চওড়া জাঁদরেল আফগানিরা সেইসব সিনেমার মারামারির সিনগুলো একেবারে মুখস্থ করে রেখেছে। তালিবানরা বিদায় হবার পরে আবার করে হিন্দি সিনেমা আর বলিউডের আক্রমণ হয়েছে কাবুলে। রাস্তায়, ফুটপাথে সিনেমার হিরো-হিরোয়িনদের ছবির ছড়াছড়ি।

ভিডিও ক্যাসেটের দোকানে চারপাঁচজন উপুড় হয়ে হিন্দি সিনেমা দেখছে। আমরা ঢুকতেই সবাই একটু নড়েচড়ে বসল, কিছু লোক সরে দাঁড়াল। প্রচণ্ড কায়দা মেরে বললাম, "আমাদের বম্বের ছবি মনে হচ্ছে?"

"খো, খো, হিন্দুস্থানি সিনেমা খুব অস্ত্। বম্বে হিরো-হিরোয়িন খুব অস্ত্।"

"হ্যাঁ, আমরা জানি। আমরা তো বম্বে থেকেই আসছি।"

"অ্যাঁ! বম্বে থেকে আসছ? কোনও হিরোকে চেনো?"

জনতার ঔৎসুক্য ফেটে পড়ছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে একটা ছোটখাটো ভিড় জমা হয়ে গেল আমাদের চারদিকে। আমাদের দেখবার জন্যেই ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রি হবার জোগাড় হয়ে পড়ল প্রায়। ডা. বালা তখন একটু হেলে একটা হাত জিনস-এর পকেটে ঢুকিয়ে ঘাড়টা বেঁকিয়ে বলল, "চিনি। নাসিরুদ্দিন শায়ের সঙ্গে তো আমি খেলা করতাম। আর ওই যে মেয়েটা— করিনা কাপুর— ওর সঙ্গে তো আমার বেশ

ভালরকম বন্ধুত্ব আছে। প্রত্যেক হপ্তায় বাড়িতে আসে। তোমরা যদি কখনও বম্বেতে আসো তা হলে দেখা করিয়ে দেব।"

'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' কথাটার মানে যদি কেউ না জানত, তা হলে সেই জনতার চোখমুখ ও আচরণ দেখলেই বুঝতে পারত। মিনিট খানেক পিন-ড্রপ সাইলেন্স। সবার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল।

তারপরে হঠাৎ সবাই চিৎকার-চেঁচামেচি করে দরিভাষায় নিজেদের মধ্যে বচসা শুরু করে দিল। পর মুহূর্তেই দাড়িওয়ালা পাঠানস্যুটপরা লম্বাচওড়া আফগানিরা আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করার জন্যে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমরা দু'জন রোগারোগা হিন্দুস্থানি সেই ষণ্ডামার্কা চেহারাগুলোর মাঝখানে একেবারে চিঁড়ে চ্যাপটা। কোনওমতে তাদের পায়ের ফাঁক গলে দোকান থেকে বেরিয়ে হোটেলের দিকে ছুট।

"বাপরে। কী বাঁচান বাঁচলাম!"

ডা. বালা বলল, "আরও গুল দাও। গুলে পাপ পাপে মৃত্যু।"

ডাক্তারি

আমি কাবুলে এসেছিলাম ডাক্তারি করতে। আসার পরের দিনই হাসপাতালে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাঙালি তো বেড়াতে পেলে আর কিছু চায় না; আরও চায় না অন্য কথা বলতে— যদি বেড়ানোর গল্প বলতে বলা হয় তাকে। তাই একটু খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম।

এবার মূল প্রসঙ্গ— ডাক্তারিতে আসা যাক।

রুশিদের চলে যাবার পরে ভারত সরকার এইম্‌স হাসপাতাল (দিল্লি)-এর ডাক্তারদের সাহায্যে এখানে একটা ছ'শো বেডওয়ালা বাচ্চাদের হাসপাতাল খুলেছিল। তার নাম ইন্দিরা গাঁধী হাসপাতাল, বা সাধারণ লোকের কথায় 'সফাখানা-এ-হিন্দ্।' প্রায় চার বছর ধরে এইমস-এর ডাক্তারের দল কাবুলে এসে হাসপাতাল চালিয়েছে এবং এখানকার ডাক্তারদের পড়িয়েছে, এমনকী ডিপ্লোমাও দিয়েছে। তালিবান আসার পরে ওরা এখান থেকে চলে যায়। ভারতীয় ডাক্তারের দল এখন এই হাসপাতালেরই একটা অংশে নিজেদের ডিসপেনসারি খুলেছে, আমাদের কাজ এখানকার সার্জিক্যাল ইউনিটটাকে ঠিকঠাক করে তোলা।

হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট ডা. মুস্তাফা আমাদের দেখে যথারীতি বিগলিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে অবশ্য গৌতম মুখোপাধ্যায় আর ডা. কুরেশিও গেছলেন। কীভাবে ওঁরা সব গোলাগুলির মধ্যে হাসপাতাল চালিয়েছেন; কীভাবে বিনা মাইনেতে, বিনা ওষুধপত্রে চিকিৎসা চলেছে, ভারতীয়রা কত সাহায্য করত এককালে— ইত্যাদি সব শোনা হল। ডা. মুস্তাফা এইবার কাজের কথা বললেন।

"আমরা সবাই আশা করছি যে ভারতবর্ষ প্রচুর টাকাপয়সা ওষুধপত্র দিয়ে হাসপাতালের উন্নতি করবে। কী বলেন, মিস্টার গৌতম?"

গৌতম পাক্কা ডিপ্লোম্যাট। একটু ঘুরিয়ে বললেন, "ও, আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখি কী করা যায়।"

আমি ও ডা. বালা একজন সার্জেনের সঙ্গে হাসপাতাল দেখতে গেলাম। সিঁড়িগুলো অক্ষত আছে, তবে আলো নেই, কিছু জায়গায় রেলিং নেই, আর জানলার কাচগুলো ভাঙা। সেখান দিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা কাবুলি বাতাস হাসপাতালে ঢুকছে। বাচ্চাদের সার্জিক্যাল আই সি ইউতে ছ'টা ছোট-খাটো খাট, আর এক-একটাতে চারটে বাচ্চা শুয়ে রয়েছে। তাদের মায়েরা বোরখা পরে খাটের চারপাশে বসে আছে। মেজেটা নোংরায় হলদে হয়ে গেছে। দু-একটা বেড়াল ঘোরাঘুরি করছে। পাশে একটা আলমারিতে কিছু ওষুধ আর ইনজেকশন স্তূপাকার। এক কোনায় দু'জন নার্স টুলে বসে পা দোলাচ্ছে।

আমরা অপারেশন থিয়েটারের দিকে এগোলাম। সব ও.টি.-র মেঝেতেই একটা লাল দাগ থাকে যেটা পেরনোর আগে জামা ও জুতো বদলে মুখোশ আর টুপি পরতে হয়। আমরা সেই লাল দাগটা খুঁজতে খুঁজতে এদিক-সেদিক যাচ্ছি। হঠাৎ একটা দরজা খুলে পরদার বদলে কম্বল সরিয়ে আমরা একেবারে ও.টি.-র মধ্যিখানে।

"এ কী! জুতো পরেই যে ঢুকে পড়লাম!" দু'জনেই বললাম আঁতকে উঠে।

"ও পরবা নি অন্ত্। এখানে আমরা সবাই এইই করি। আসলে ভাল হিটার নেই তাই খুব শীত করে।"

ও.টি.-র অবস্থা বেশ খারাপ। একপাশে ভাঙা একটা রাশিয়ান মেশিন পড়ে আছে যা দিয়ে জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া দেয়। ডা. বালা সেটা নেড়েচেড়ে বলল, "এ আদ্যিকালের মেশিন, আমার কম্ম নয়।"

হাসপাতালের সার্জেন সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ওটা কাজ করে না। আমরা জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া দিই না। ইনজেকশন আর ইথার দিয়ে ম্যানেজ করি।"

ডা. বালা— "সব্বনাশ" বলে বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকাল! ও.টি.-র যন্ত্রপাতির অবস্থাও তথৈবচ। কিছু ভাঙা মরচেধরা কাঁচি যাতে কোনও ধার নেই। সার্জেন বলল— "এ সব যন্ত্রপাতি কাঁচিটাচি সব পাকিস্তানের তৈরি। ওখানকার জিনিস খুব খারাপ হয়। যদি ভারতবর্ষ থেকে জিনিস আসে, ভাল হয় তা হলে।"

আমরা বাকি হাসপাতালটা দেখলাম। একটা জার্মান এনজিও হাড়ের বিভাগটা চালাচ্ছে। সেখানকার অবস্থা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এরা নাকি গত

সাত বছর ধরে এখানেই কাজ করছে। পেট খারাপের বিভাগটা চালাচ্ছে আমেরিকানরা, আর ফুসফুসের বিভাগটা ফ্রান্সের ডাক্তাররা।

"সবই তো মনে হচ্ছে বাইরের লোকেরাই চালাচ্ছে—"

ডা. বালা বলল, "তা হলে আমরা কী করব?"

"তোমরা পুরো হাসপাতালটাকেই আপন করে নেবে আবার"— সার্জেনের উক্তি। আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম।

সফাখানা-এ-হিন্দের একপাশে একটা ছোট বিল্ডিংয়ের কিছুটা অংশ নিয়ে আমাদের ডিস্পেনসারি। তিনটে ঘর, আর তাতে ছ'জন ডাক্তার। ডা. বালা ও আমি একঘরে, ডা. পুরি ও রাও আরেকটাতে এবং ডা. হরি ও ডা. নাথ তৃতীয়টায়। একটা রান্নাঘরের মতো জায়গায় আমাদের তিনটন ওষুধ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া একটা কম্পাউন্ডারদের ঘর আর দুটো হাসপাতালের আফগানি ডাক্তারদের ঘর। আমাদের সঙ্গে একজন করে তারজুমান থাকে; কিছুদিনের জন্যে জান মহম্মদ সেই কাজ করল। আমাদের ঘরের দরজায় একজন বয়স্কা নার্স বসে থাকেন— জামিলা জান। জামিলার কাজ হল একটি একটি করে রোগী আমাদের কাছে পাঠানো। দরজার বাইরে বেশি ভিড় হলেই, জামিলাকে ধাক্কা দিয়ে একসঙ্গে পাঁচ-ছ'জন রোগী ঘরে ঢুকে আসে। সবাইকারই মনে আশঙ্কা যে আফগানিস্তানে সরকার পাল্টানোর মতো ডাক্তারের মত হয়তো পাল্টে যাবে। সে হয়তো আর কারুকে না দেখে উঠে চলে যাবে। ফলে ভিড় হলেই চ্যাঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি মারামারি। চড়-চাপড়-কিল-ঘুষি-লাথি-গালিগালাজ সবরকম রেসিপির একটা মিশ্রণ তৈরি করে রোগীদের বার করা হয় তখন। জামিলা একদিন তার নিজের হাতটা দেখালেন। তিনটে আঙুল ফুলে গেছে। বললেন, "রুগিদের সামলাতে গিয়ে মারামারিতে একজন রুগির মা আমার হাতের ওপর একটা ডান্ডা মেরেছে। ই জঙ্গ্ অস্ত্, জঙ্গ্।"

বেশির ভাগ রোগীই কম্পাউন্ডারদের কাছ থেকে ওষুধ লেখাবার কাগজ নিয়ে আসে। অনেকে অবশ্য একটা কাগজেই দু-তিন জন বাচ্চা দেখাবার চেষ্টা করে। তাদের এটা কিছুতেই বোঝানো যায় না যে সকলের ওষুধ একজায়গায় লিখলে কে কোনটা খেয়ে বসবে। বিস্তর ঝমেলায় পরে একদিন একজন রোগীর হাতটা টেনে বললাম, "কোথায় লিখব ওষুধগুলো? এখানে এই হাতে?"



বাগ্রামের রানওয়ের পাশে এটিসির ভগ্নস্তূপ



কাবুলের ফাঁকা রাস্তা



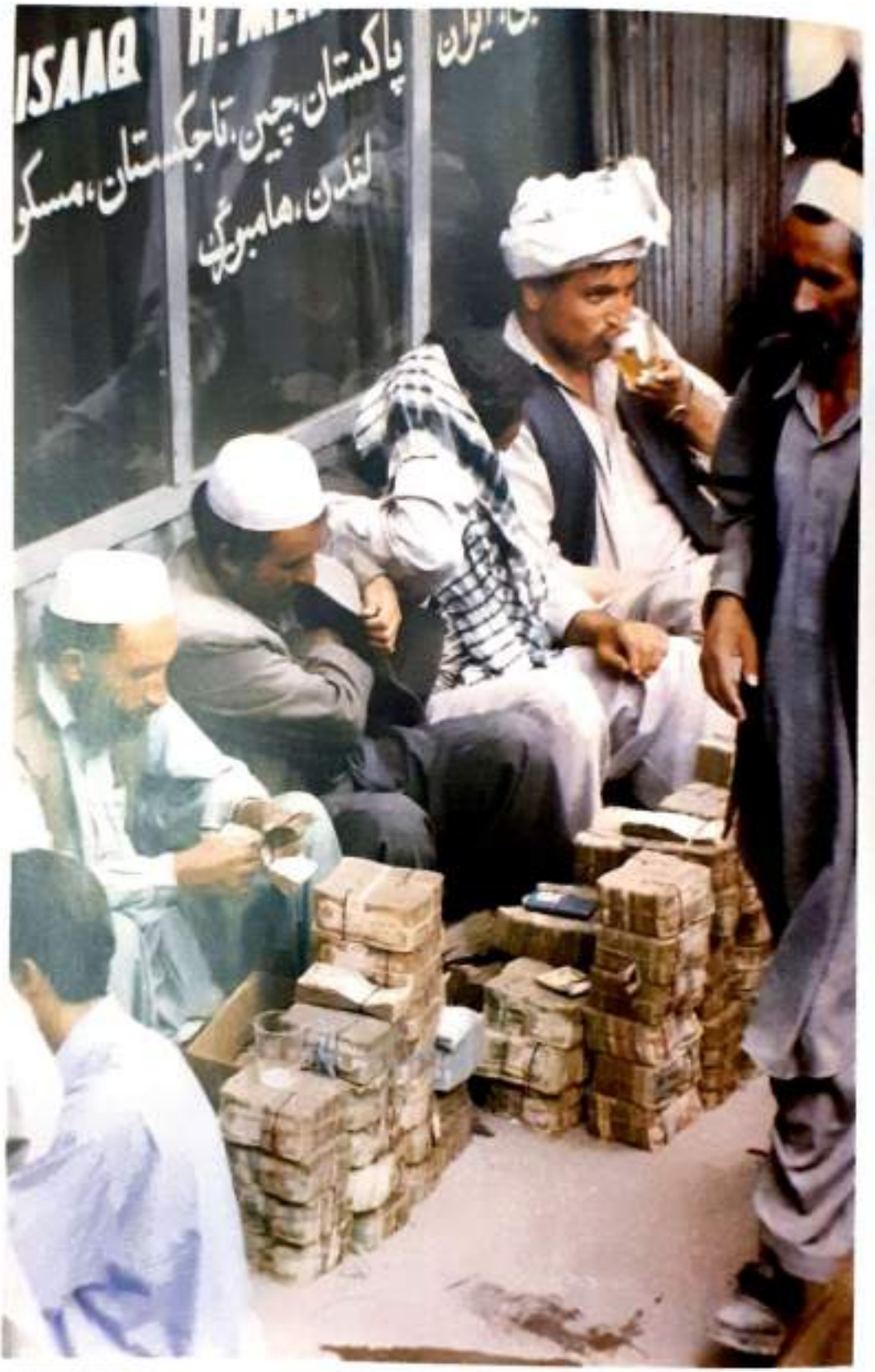
কাবুলিওয়ালার খাদ্য—নান্



কাবুলের বিমানবন্দর



কাবুলের মেওয়াওয়ালা



শাহজাদা বাজার



রুবিনা



আফগানিস্তানের এককালের রক্ষামন্ত্রক



হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণি



পাঞ্জশের উপত্যকা



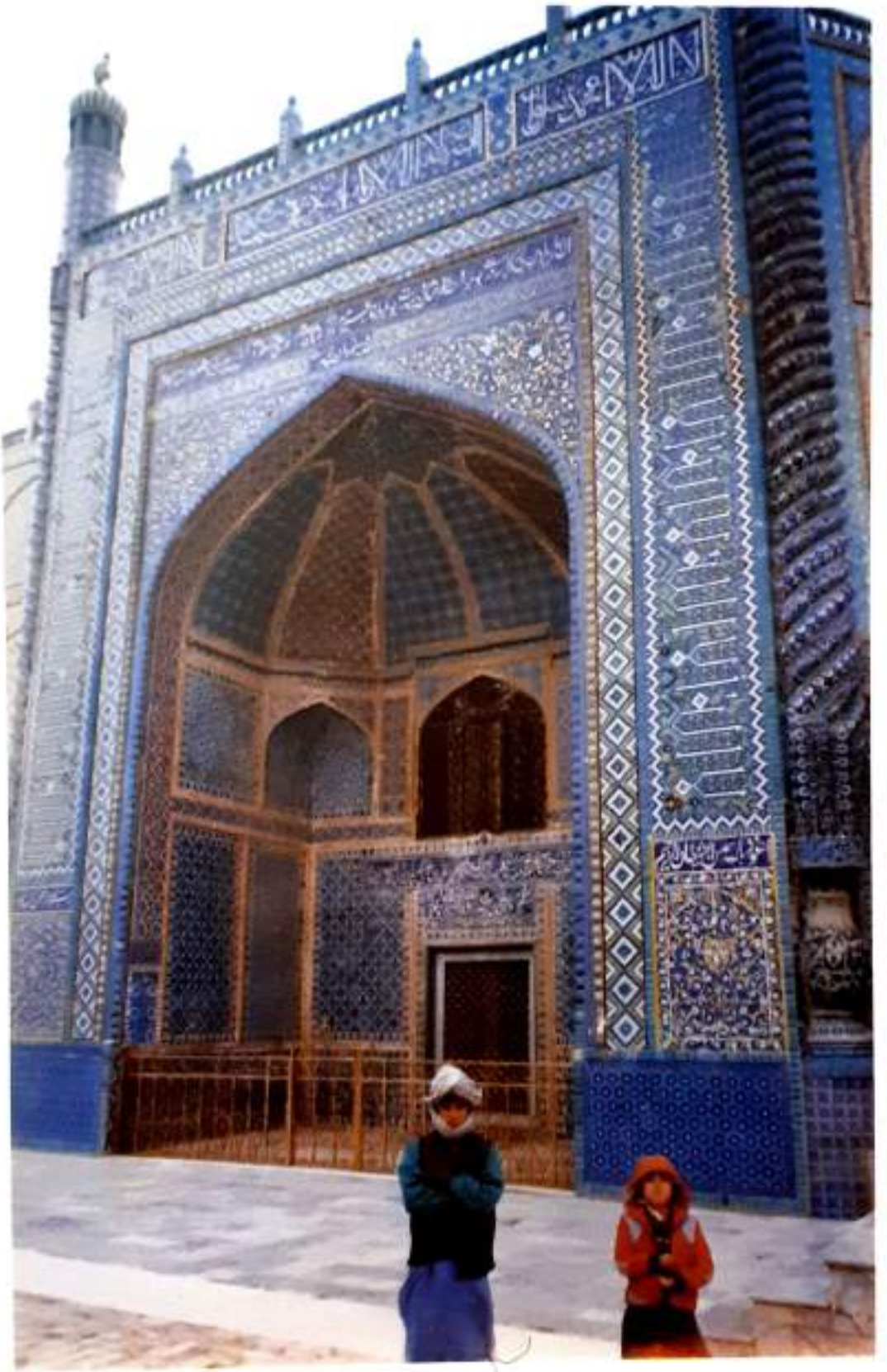
পাঞ্জশের-এ আহমেদ শা মাসুদের কবর



কাবুলের ধ্বংসাবশেষ



কুন্দুজ-এর পর্বত



মাজহার-এ-শরীফ



বামিয়ানের পথে



জাঁদরেল পাঠান



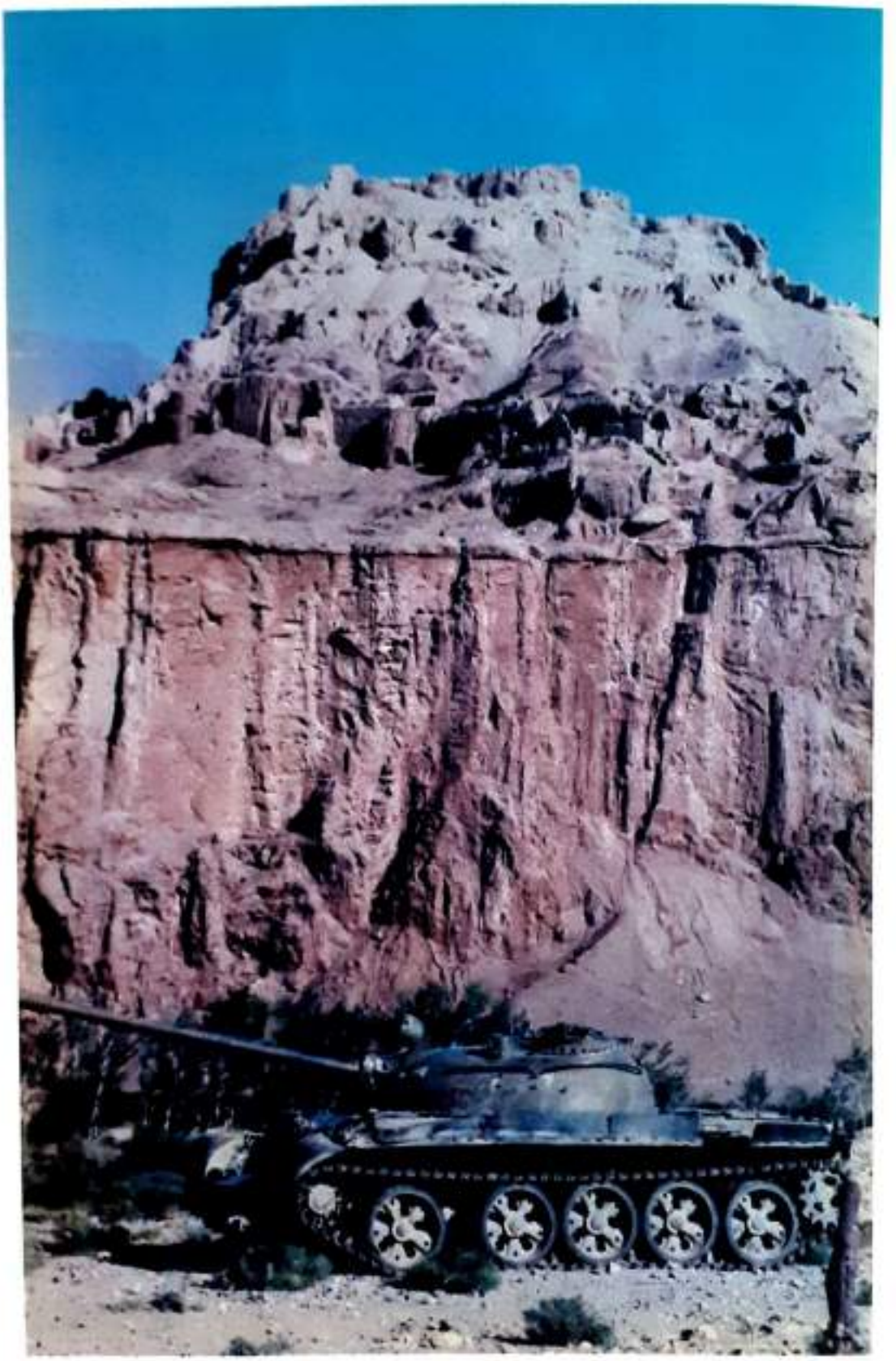
বামিয়ান উপত্যকা



বামিয়ান-এর মনাষ্টি



বামিয়ান-এর বুদ্ধ



শহর-এ-গোল্‌গোলা আর তালিবানের ট্যাঙ্ক



রিসেপশনে আর কারুর ছাড় ক্যাম্প, সামনে পড়ে আছে গ্রেনেড, রকেট লঞ্চার ও বোমা



বুজকাশি



আফিমের চাষ



বাবরের সমাধি

তখন রোগী তার ভাইয়ের হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আর এরজন্যেও লিখে দাও।"

এরা সবাই বেশ গরিব। অনেকের হয়তো খাবার পয়সা নেই। কিছু ওষুধ পাবার আশায় আসে। ভাবে, ওষুধ খেলেই গায়ে বল পাবে। খাবার-দাবার দরকার নেই।

আফগানি ডাক্তারের মধ্যে একজন ডাক্তার ডা. জারবারি। তিনি এককালে এইম্‌স-এর ডাক্তারদের কাছে পড়াশুনো করেছিলেন, এবং দীর্ঘকাল ধরে হাসপাতালে কাজ করছেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলেন; ডাক্তারির জ্ঞানটা তার চেয়েও ভাঙা ভাঙা। মাসে চল্লিশ ডলার বেতন পান (প্রায় হাজার দুই টাকা)। অবশ্য গত ছ'মাসে কিছুই মাইনে পাননি। রোগা ডিগডিগে দেখতে, একমুখ সাদা দাড়ি কিন্তু এনার্জির কোনও অভাব নেই। তিনি বারোটা ছেলেমেয়ের বাবা। পরে একদিন বলেছিলেন, "আসলে মাইনেটা কমে গিয়ে যখন একদম বন্ধ হয়ে গেল তখন ছেলেমেয়ে হওয়াটাও বন্ধ হয়ে গেল।"

আজ ডিস্পেনসারিতে প্রচণ্ড ভিড়। দাড়িওয়ালা লোকেদের সরিয়ে, বোরখাপরা মেয়েদের ঠেলে আমরা যখন এগোচ্ছি তখন একটা ফচকে পুলিশ আমাদের রাস্তা আটকে দাঁড়াল। এ-কে ৪৭-এর নলটা তাক করে বলে, "যাচ্ছ কোথায়? কাগজ কাটাও, পরে যেতে পারবে।"

আমরা সেটা অগ্রাহ্য করে "দূর বোকা সর এখান থেকে— আমরা এখানকার ডাক্তার, আমরা যাব না তো ভিড় কমবে কী করে।" বলে এক ধাক্কায় তাকে বারান্দার বাইরে পাঠিয়ে দিলাম।

ডিস্পেনসারির ভিড় বেসামাল হয়ে পড়ল। বোরখাপরা মেয়েরা বাচ্চা কোলে জোয়ারের ঢেউয়ের মতো হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে এল। কাকে আগে দেখা হবে সেটা ভীষণ সমস্যা। এসবের মধ্যে ফরিদা বলে একজন নার্স মুখ লাল করে চশমা খুলে ভেতরে ঢুকে বলে, "কারুকে দেখতে হবে না। এরা সব জংলি, এদের একটাও ওষুধ দিও না।"

স্পষ্ট বোঝা গেল ভিড় সামলাতে গিয়ে বিস্তর কিলচড় খেতে হয়েছে তাকে। হঠাৎ দড়াম করে একটা আওয়াজ হল। জামিলা জান এসে খবর দিল দরজা বন্ধ করাতে একজন মহিলা জানলার কাঁচ ভেঙে ফেলেছে— সেই ফুটো দিয়ে সবাই নিজেদের বাচ্চাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমরা ঝড়ের

বেগে রোগী দেখতে লাগলাম। কম্পাউন্ডারদের বলা হল তাড়াতাড়ি ওষুধ বিতরণ করো। ভিড় পাতলা হলেই নিষ্পত্তি। ডা. জারবারি গেলেন দেখতে কী ব্যাপার, একটু পরে ফিরে এলেন। আদ্ধেকটা টাকের মাথায় একটা তাজা আলু গজিয়েছে। বললেন, "আমার মাথা ঘুরছে। বোরখাপরা কিছু মেয়ে আমায় পিটিয়েছে।"

তখুনি জল আনো ওষুধ আনো শুইয়ে দাও করে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বিকট জোরে কড়াক-কড়াক-কটাকট-কটাকট করে আওয়াজ। ডা. জারবারি বললেন, "এ-কে ৪৭— আবার বোধহয় যুদ্ধ লাগল। ডিস্পেনসারিতে আবার হামলা করবে কে?"

হামলা? এ-কে ৪৭? গোলাগুলি চলছে যে। এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ! এবার বোধহয় প্রাণটাই গেল।

আমরা এদিক ওদিক চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। এ ছাড়া আর করার কিছু নেই। কোনও টেলিফোনও নেই যে দূতাবাসে খবর দেব। কোথা দিয়ে পালাব তাও বুঝতে পারছি না।

গোলাগুলির আওয়াজ বন্ধ হল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি রোগীর ভিড় দু-তিনটে সুন্দর পঙ্‌ক্তিতে বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ হতাহত হয়নি এবং কারুর মুখে কোনও আশঙ্কাও নেই। কী ব্যাপার? কে গুলি ছুড়ল আর কাকেই বা মারল।

জামিলা জান খবর আনল—

"বেসামাল ভিড় দেখে আফগানি পুলিশ হাওয়ায় কুড়িটা গুলি মেরেছে। তারপর রোগীদের দিকে বন্দুকের নল দেখিয়েছে। আফগানিরা ওই একটা ভাষাই বোঝে— দ্যাখো কীরকম সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।"

আফগানিস্তানের বিয়ে

আজ আফগানিস্তানের বিয়ে। গত তেইশ বছরে অবশ্য এরকম বিয়ে অনেকবার হয়েছে, আবার কিছুদিন পরে ভেঙে গেছে। তিন চার বছর পরে পরে নতুন আশা নিয়ে নতুন সরকার গদিতে বসে, আবার কয়েকমাস পরে যুদ্ধ হয়ে গদি উলটে যায়। এবারের বিয়েটা একটু অন্যরকম। তোড়জোড় করেছে বন-এ বসে সাদা চামড়ার লোকরা, আর এই বিয়ের মাথায় বড়দাভাই আমেরিকার আশীর্বাদ আছে। দূতাবাসেও আজকে একটা বিশেষ দিন। পাঁচ বছর আগে তালিবানদের আক্রমণের সময় ভারতীয়রা দূতাবাস বন্ধ করে পালিয়ে বেঁচেছিল। আজ, পাঁচ বছর পরে সেই দূতাবাস খোলবার জন্যে স্বয়ং বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিং আসছেন।

সকাল থেকে সব্বাইকার সাজের বাহার শুরু হল। স্যুটটাই, ঝকঝকে জুতো পরে সবাই তৈরি। দেখলাম অশোক খেরা দাড়ি কামিয়ে চান করে ঘরের এককোনায় তোয়ালে দিয়ে জুতো পালিশ করছে।

"কী করছেন এটা, খেরা সাব?"

"কিছু না সায়েব, এই তোয়ালেটা ধুতে দেব এর পরে। আর আজ তো আমাদের মন্ত্রী আসছেন। আজ যদি আমাকে টাই দিয়েও জুতো পালিশ করতে হয়, তাও করব। দেখছেন না, আজ আমি দাড়ি কামিয়েছি, চানও করেছি এই ঠান্ডায়।"

লোকটা বোধহয় হপ্তাখানেক পরে চান করল।

আমরা ডিস্পেনসারির দিকে এগোলাম। এটার নতুন নাম এখন হয়েছে পলিক্লিনিক। রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা, দু'-একটা ট্যাক্সি, আর কয়েকটা দূতাবাসের গাড়ি ছাড়া জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। রাস্তার কোনায় কোনায় এ-কে ৪৭ ধারী পুলিশ; নানা জায়গায় ব্যারিকেড। মাথার ওপর দিয়ে ভয়ংকর গর্জন করতে করতে দুটো পাখাওয়ালা আমেরিকার 'চিনুক' হেলিকপ্টার উড়ে গেল। তার

পেছনের দরজাটা পুরো খোলা, দু'দিকে চারজন আমেরিকান সৈনিক জ্যাকেট, হেলমেট, মাইক্রোফোন ইত্যাদি লাগিয়ে বন্দুক নিয়ে বসে আছে। বড়দা যে কোনওরকম গণ্ডগোলের সূত্রপাতের সুযোগ দিতে চাইছে না সেটা ভালভাবে বোঝা গেল।

পলিক্লিনিকে আজকে ভিড় কম। আমরা যখন বাচ্চাদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচির মধ্যে রোগী দেখছি তখন হঠাৎ ডা. রাও এসে বললেন, "মন্ত্রী এসে গেছেন, মন্ত্রী!"

বাইরে এসে দেখলাম কালো যোধপুরী কোট, তার ওপর কালো ওভারকোট আর কালো টুপি পরে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনিই বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিং— তাঁর সঙ্গে একজন স্থূলকায় ব্যক্তি। ইনি মি. লামবা। অবসরপ্রাপ্ত আই এফ এস এবং আফগানিস্তানের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের পেছনে দেখলাম মি. গৌতম— পকেটে হাত ঢুকিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে কেউ নেই। তাই তিনি কোনও কাজ না পেয়ে রোগীদের মাথায় হাত রেখে তাদের চুপ করাবার চেষ্টা করছেন। আমরা আসতেই সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

তারপর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ধরে সবকিছু দেখানো, বোঝানো এবং ঝপাঝপ ছবি। মন্ত্রী বিদায় নিলেন মার্সিডিজ গাড়ি চেপে। আর কোনও গাড়ি, পুলিশ বা এসকর্ট নেই। এমনকী এত যে ভারতীয় রিপোর্টার ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের একজনেরও টিকির দেখা পাওয়া গেল না। মন্ত্রী চলে গেলেন দূতাবাসের উদ্বোধন করতে। আমরাও কাজটাজ শেষ করে দুপুর নাগাদ হোটেলে ফিরলাম। আফগানিস্তানের বিয়ের ভোজটোজ খাওয়া কিছু জুটল না। এমনকী দূতাবাসের উদ্বোধন উপলক্ষে একপেয়ালা চা-ও কেউ দিল না।

সন্ধে নাগাদ প্রবলপ্রতাপ সিং-এর ঘরে গেলাম আড্ডা মারতে। সেখানে দেখি জন পনেরো সাংবাদিক চিৎকার-চ্যাঁচামেচি আর গালিগালাজ করছে। এরা সবাই এসেছিল যশবন্ত সিং-এর সঙ্গে আফগানিস্তানের বিয়ে দেখতে, আর দূতাবাসের উদ্বোধনের গল্প লিখতে। ফেরবার সময় দূতাবাসের লোকেরা যতক্ষণে ওদের মিনিবাসে বসিয়ে বাগরাম পাঠায় ততক্ষণে যশবন্ত সিং মার্সিডিজ চেপে প্লেনে উঠে পড়েছেন। পনেরো জন সাংবাদিকের নাকের সামনে দিয়ে প্লেনটা উড়ে দিল্লি চলে গেল। সাংবাদিকেরা রাগে খিদেতে

ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে প্রবলপ্রতাপের ঘরে এল। এরা সব লাফিয়ে পড়ল দূতাবাসের লোকেদের ওপরে। তুর ঘাবড়ে গিয়ে শেষে দূতাবাসের ভেতরেই ওদের থাকার ব্যবস্থা করল।

আমরা প্রবলপ্রতাপকে একটু বকাঝকা করলাম।

"তোমরা তো আচ্ছা লোক। আজ সকালে মন্ত্রী এলেন আমাদের পলিক্লিনিকে, তোমরা একজনও কেউ এলে না ছবি তুলতে!"

"পলিক্লিনিক? কোন পলিক্লিনিক? ও হো, কী ভীষণ বোকা লোকটা। আগে যদি তোমরা বলতে...।"

"কোন লোকটা?"

"আমরা তো সবাই মন্ত্রীর পেছনে পেছনে মিনিবাসে উঠছিলাম। এমন সময়ে খেরা আমাদের বলল মন্ত্রী এবার পলিটেকনিকে যাচ্ছেন। ভাবলাম মাঠের মাঝখানে কোনও পলিটেকনিকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছেন তিনি। ভাল স্টোরি হবে না ভেবে আর গেলাম না। ইস, আগে যদি জানতাম যে ওটা পলিক্লিনিক— মন্ত্রীও ছিলেন, রোগীও ছিল, তোমরাও ছিলে— বেশ ভাল স্টোরি হত।"

প্রবলপ্রতাপ হাত কচলাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে প্রবলপ্রতাপ ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল।

"রাজীব, রিপোর্টিং-এর সময় হয়ে গেছে।"

ক্যামেরাম্যান রাজীব গুপ্তা ভিডিও ক্যামেরা, স্যাটেলাইটের ছাতা, ইনমার সেট ইত্যাদি সব নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। আমরা ঘরের এককোনায় বসে পড়লাম লাইভ রিপোর্টিং দেখার জন্যে।

প্রবলপ্রতাপ খানিকক্ষণ পায়চারি করল। পায়চারি করতে করতে বলল, "কীভাবে শুরু করব?"— বলেই ঢকাস ঢকাস করে দু'পেগ রাম খেয়ে নিল। "হ্যাঁ এবার মাথাটা ঠিক কাজ করছে। রাজীব, দিল্লি লাগাও।"

'আজ তক'-এর এক সাংবাদিকের ছবি এল ইনমার সেটে— "আর, এবারে আমরা আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি কাবুলে, যেখানে আমাদের রিপোর্টার প্রবলপ্রতাপ সিং রয়েছেন।" প্রবলের ছবি ক্যামেরার এল; রেকর্ডিং শুরু হল—

"প্রবল, ওখানকার নতুন সরকার গঠনের সময়ে কী হল? কী প্রতিক্রিয়া লোকেদের? প্রবল!"

প্রবল বলাতেই সে বুঝল আর কোনও প্রশ্ন আসছে না। প্রবল শুরু করল—

"এখানকার অবস্থা ভাল। সবাই অনেক আশা নিয়ে এই সরকারের গঠন দেখতে এসেছিল... ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকী, বোরখা ছাড়া একদল মেয়েও হামিদ কারজাইকে সম্মান জানাতে এসেছিল। আশুতোষ।"

আশুতোষ বলাতেই দিল্লি থেকে আবার প্রশ্ন শুরু হয়ে গেল। এইভাবে প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে গল্প পাঠানো হল দিল্লিতে। বেশ সুন্দর পরিষ্কার ছবি, কথাবার্তা, কোনওরকম লাইন খারাপ বা ঝিরিঝিরি বা 'অ্যাঁ কী বলছ' নেই। গল্প পাঠানোর পরে রাজীব জিজ্ঞেস করল, "ক্লোজ?"

প্রবলের জবাব, "হ্যাঁ ক্লোজ। এখন রাত্তিরের জন্যে নিশ্চিন্ত।"

আমরা নৈশভোজ প্রবলের ঘরেই করলাম। সেই তিন ফুট লম্বা নান, আধপোড়া ডাল, স্যালাড আর শুকনো কাবাব।

দেশওয়ালি ভাই

দুনিয়ার যে কোনও জায়গায় দুটো জিনিস সবসময় পাওয়া যায়; এক হল আলু, আর অন্যটা হচ্ছে সর্দারজি।

কর্তার সিং বলে একজন সর্দারজির সঙ্গে ডিস্পেনসারিতে আলাপ হল একদিন। জানলাম যে অনেক সর্দার পরিবার কাবুলে আছে এবং তাও প্রায় দু'শো বছর ধরে। হয়তো এরা রঞ্জিত সিংয়ের আমলে কাবুলে এসেছিল। কর্তার সিং অবশ্য বলল ওরা সব নানকের সময় থেকে এখানেই আছে।

'কারতে পরবান' বলে এক এলাকার গলিতে একদিন ঢুকলাম আমরা। সামনে একটা বিশাল উঁচু দেওয়াল তাতে কালো রঙের মজবুত লোহার গেট। গেটের আশেপাশে একগাদা সর্দারজি ছেলে বুড়ো বাচ্চা ঘোরাঘুরি করছে। এটাই কাবুলের গুরুদোওয়ারা। ভেতরে বিরাট এলাকার মধ্যে একটা বড়সড় দোতলা গুরুদোওয়ারা। কোনও গম্বুজ নেই তবে হলদে রঙের খালসাদের পতাকা উড়ছে। আশেপাশে একরাশ একতলা ঘর, বাড়ি, সিঁড়ি, রাস্তা, রান্নাঘর, বাথরুম ইত্যাদি নিয়ে একটা মস্ত দুর্গের মতো ব্যাপার। দেওয়ালের বাইরে বেশ কিছু সর্দারজির দোকানপাট। কর্তার সিং বলল— "তালিবানদের সময়ে বেশ অসুবিধে হয়েছিল। অনেকেই পুরনো ব্যবসা বন্ধ করে ভারতবর্ষে ফিরে গেছল। তালিবানরা আমাদের বলেছিল হলদে পাগড়ি পরতে আর সব মেয়েদের বিন্দি পরাতে যেহেতু ওরা নিজেরা কালো পাগড়ি পরত। আমরা অবশ্য বলেছিলাম সমস্ত টাকাপয়সা, ব্যবসা তোমরা নিয়ে নাও, আমাদের ভারতবর্ষে যেতে দাও। তারপর থেকে বিশেষ গণ্ডগোল করেনি ওরা; এক আধটা রকেট অবশ্য পড়েছিল এখানে।"

"কী কাজ করো তোমরা এখানে?"

"বেশির ভাগ লোক ব্যবসা করে। ভারতবর্ষে আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। ভিসা পেতে অসুবিধে হত তালিবানদের সময়ে। তখন আমরা পাকিস্তান গিয়ে

সেখান থেকে অমৃতসর যেতাম। আমার কাপড়ের ব্যবসা আছে— এখন নতুন সরকারের মিলিটারিকে কাপড় বেচব পঞ্চাশ হাজার মিটার।"

মনে মনে ভাবলাম পঞ্চাশ কিলোমিটার কাপড় বেচছে লোকটা। তাই তো করে খাচ্ছে এইসব দুর্গম জায়গায়।

কর্তার সিং আমাদের ঘুরিয়ে দেখাল গুরুদোওয়ারাটা। একটা বড়সড় ঘরে আমরা একটা মেডিক্যাল ক্যাম্প চালালাম। ছেলে-বুড়ো মেয়ে সবরকমের রোগী দেখা হল। অনেকে অবশ্য শুধু ডাক্তারদের দেখতেই এসেছিল। নতুন হিন্দুস্থানির মুখ দেখতে কে না চায়! পেস্তা-বাদাম-কিসমিস আর আফগানি চা খেতে খেতে রোগী দেখা চলতে লাগল ।

এরপর আমরা গুরুবাণী শুনে লঙ্গরে খেতে গেলাম। কর্তার সিং বলল, "তালিবানরা এখানেও এসেছিল। যখন দেখল কোনও মূর্তির পুজো হচ্ছে না তখন চলে গেল। যাবার সময়ে বলেছিল যে গুরুদোওয়ারার পতাকাটা নিচু রেখে উড়িয়ো। ওটা যেন কোনও মসজিদের চেয়ে উঁচু না হয়।"

লঙ্গরে খাবার বেশ মুখরোচক। দিশি গোল রুটি, উরুদ ডাল, কপির তরকারি আর স্যালাড। শেষকালে চা, পেস্তা-বাদাম, আখরোট।

মন্দিরে

একদিন দুপুরের দিকে আমরা 'কোহেয়াসামাই' পাহাড়ের দিকে গেলাম। পাহাড়ের ঢালে গায়ে গায়ে ছোট ছোট অনেক বাড়ি, তারই গলির মধ্যে দিয়ে আমাদের মিনিবাস একটা মস্তবড় দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল। চেহারাটা অনেকটা গুরুদোওয়ারার দেওয়ালের মতো তবে আকারে অনেক ছোট। ভেতরে ঢুকে দেখলাম এটা এখানকার মন্দির। সুখজিৎ বলে একজন দাড়িওয়ালা মাথায় রুমাল বাঁধা লোক আমাদের জায়গাটা দেখাল।

এটা হচ্ছে আসামাঈ মন্দির। আসামাঈ যে কোন দেব বা দেবী তা বলতে পারব না। মোটমাট শক্তি, শিব ও কৃষ্ণের পুজো হয়। এই অঞ্চলে প্রায় শখানেক হিন্দু পরিবার আছে। তারাই এই মন্দির চালায়। মন্দিরের চত্বরের চারদিকে ছোটবড় অনেক ঘর, এক কোনায় একটা বিরাট বড় গাছ— সেটা কী তাই নিয়ে একটু বচসা হল। মন্দিরের ঘরগুলোতে একটা করে ছোট বেদী, তাতে কোনও মূর্তি নেই। পুরো এলাকাটায় একটা চেনা চেনা গন্ধ— জ্বলে যাওয়া ঘি আর ধূপ মেশানো। ডা. বালা একটু লম্বা শ্বাস টেনে বলল, "আঃ। এতদিন পরে একটা মন্দির মন্দির গন্ধ পেলাম। প্রাণটা ঠান্ডা হয়ে গেল।"

সুখজিৎ বলল, "তালিবানদের সময়ে মূর্তিপুজো বারণ ছিল। ওরা সব মূর্তিকেই বুদ্ধ বলত। আমরা বেশির ভাগ মূর্তিই মাটির তলায় একটা লুকোনো ঘরে রেখে দিয়েছিলাম। কিছু বড় মূর্তি যেগুলো সরাতে পারিনি সেগুলোর সামনে দেওয়াল তুলে দিয়েছিলাম। এক-আধবার তালিবানরা এসেছিল, এখানে কোনও মূর্তি না পেয়ে ভাঙচুর না করেই চলে গেছল।"

ভাবছিলাম, পাঁচ বছর ধরে সমস্ত দেবমূর্তি বন্দি! কিন্তু এখন তো নতুন উদার রাজ। এখন সেইসব মূর্তিকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে বাধা কোথায়?

সুখজিৎ বলল, "দিল্লিতে আমাদের গুরু আছেন; তিনি যখন লগ্ন জানাবেন

তখন আমরা সব মূর্তি বার করব। আপাতত তোমরা আজ রাত্তিরে বাবা তীরথনাথের দরগায় এসো। সেখানে শিবরাত্তিরের পুজো আছে।"

"দরগায় পুজো?"

"এখানে মন্দিরকে দরগাও বলা হয়।"

তীরথনাথের দরগাটা আসামাঈ মন্দিরেরই থেকে একটু দূরে। ঘুপচি গলির মধ্যে দিয়ে ঢুকে আমরা গেলাম দরগার ভেতরে। সেটাও একটা ছোটখাটো কেল্লার মতো। একপাশে একটা হলঘর, অন্যপাশে অনেক ঘরবাড়ি। সেখানে এখানকার হিন্দু পরিবাররা থাকে। বাচ্চারা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে খেলা করছে, মেয়েরা শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ পরে ঘরের কাজ করছে, কাপড় মেলছে— লোকেরা দরগার কাজে ব্যস্ত। তারা সব কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে দেখতে লাগল। মুখে যেন একটু আশংকার ভাব। সঙ্গে সুখজিৎকে দেখে তারা খানিকটা আশ্বস্ত হল। একটা স্তম্ভ দেখিয়ে সুখজিৎ বলল যে ওর ভেতরে একটা গাছ আছে যার তলায় বসে বাবা তীরথনাথ ধ্যান করতেন। তিনি কে, কবে ছিলেন সে ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না।

মন্দিরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মারবেল ও টালি দিয়ে তৈরি একটা হলঘর— সামনে একটা শিবলিঙ্গ, আর তার পাশে রাধাকৃষ্ণের ছবি। আমরা যাওয়াতে গান শুরু হল। সে অবশ্য খুব বেসুরো গান, তার সঙ্গে এক বুড়ো লোক হাতের চেটো দিয়ে দুমদুম দমাস করে তবলা বাজাল। তবে পুরো গানের আসরে, যে নিষ্ঠা ছিল সেরকম ভক্তিভাব ভারতবর্ষের খুব কম মন্দিরেই দেখা যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গানে যোগ দিচ্ছিল, চোখ বন্ধ করে মন্ত্র আওড়াচ্ছিল। কোনওরকম চ্যাঁচামেচি নেই, কোনও ঝিকিমিকি আলো নেই, জোর করে দানদক্ষিণা চাওয়া বা পাণ্ডাদের উপদ্রব নেই। এরা হয়তো শিবরাত্রি আর জন্মাষ্টমীর তফাতও জানে না। কিন্তু এদের একটাই যা সম্বল সেটা আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে। নয়তো এই জায়গায় এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে শুধু একটা মন্দিরে আস্থা রেখে ক'টা লোকই বা বাঁচতে পারে।

সংসার

কাবুল হোটেলের ঠান্ডা নান আর শুকনো মাংস খেয়ে খেয়ে আমাদের অরুচি হয়ে গেল। তা ছাড়া কাপড় জামা ধুতে মাঝে মাঝে পঞ্চাশ হাজার আফগানি চাইত হোটেলের লোকরা, হিসেবে সেটা দাঁড়ায় প্রায় দেড়শো টাকা। এবার দূতাবাস থেকেও আমাদের একটা থাকবার ব্যবস্থা করার কথা হল। সব মিলিয়ে আমরা, সব ডাক্তাররা এবং কম্পাউন্ডাররা মনস্থির করলাম যে, অনেক হয়েছে, এবার নিজেদের একটা বাসায় থাকতে হবে। একটাই অসুবিধে, এই শীতের মধ্যে রান্নাবান্নাটা নিজেদেরই করতে হবে। ও.টি. অ্যাসিসট্যান্ট পিটার বলল, "কোনও ব্যাপার নয় স্যার, আমরা সবাই মিলে রান্না করে নেব।" সবাই মানে? ডালে কতটা নুন দেয় তাই জানি না আমি। খুব উদ্বেগ নিয়ে পিটারকে সেকথা বলাতে বেজায় হাসল ও।

ওয়াজির আকবর খান বলে এক এলাকায় আমরা বাড়ি পেলাম। এটা আমাদের পলিক্লিনিক থেকে হাঁটা পথ। কাবুলের একমাত্র এলাকা— যেখানে প্রায় সব বাড়িগুলোই অক্ষত আছে। এটা হচ্ছে এখানকার চাণক্যপুরী। চারদিকে দূতাবাস, বিদেশি এবং হোমরাচোমরাদের বাড়ি। আমাদের সামনে মাসুদের সাকরেদ আফগানিস্তান সরকারের রক্ষামন্ত্রী জেনারেল ফাইমের বাড়ি। সবাই বলল, "তোমাদের নিরাপত্তার কোনও অসুবিধে হবে না। বাড়ির সামনে সবসময় একগাদা সৈনিক থাকবে। তবে যদি ফের গণ্ডগোল হয়ে গৃহযুদ্ধ বা অন্য কোনও লড়াই লাগে তা হলে এক-আধটা গুলি সামনের বাড়ি থেকে ছিটকে এসে তোমাদের লাগতে পারে।"

বাড়িওয়ালার নাম গারদেজি। এর বাড়ি গারদেজ বলে এক প্রদেশে; সে হচ্ছে ঠেঁট পাস্তুন। দেখতে বিশালাকার পাঠানের মতো নয়। দোতলা বাড়িতে মোট পাঁচটা শোবার ঘর, তিনটে বাথরুম তার একটাও কোনও শোবার ঘরের লাগোয়া নয়। একটা বসার ও খাবার ঘর। দুটো ছোটখাটো বারান্দা; বাড়ির

তলায় একটা বেসমেন্ট তার পাশে একটা গ্যারাজ। পেছনদিকে একটা শুকনো মতো বাগান। খাবার ঘরের এক কোনায় একটা রান্নাঘর। পুরোটার ভাড়া পনেরোশো ডলার— প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা। তার সবটাই অবশ্য দূতাবাস দেবে।

রান্নাঘরের কিছু সরঞ্জাম কিনে, লেপকম্বল নিয়ে আমরা বাড়িতে ঢুকলাম। গ্যাসের খুব সোজা হিসেব— বাজার থেকে সিলিন্ডার আর ভাঙামতো একটা রেগুলেটার কিনে দোকান থেকে গ্যাস ভরে নিলেই ব্যাস— চুল্লি তৈরি। দশ কিলো ভরাতে আড়াই হাজার আফগানি— প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা। মিক্সার, খুন্তি-ছান্তা, ঘটিবাটি সব পাওয়া গেল। চাকি বেলুন পাওয়া গেল না। একটা গোল কাঠ দিয়ে বেলনা হল, আর কাঠের বোর্ড হল চাকি। বাড়ির প্রাণ রান্নাঘর চালু হল। হেড শেফ ও.টি.-র অ্যাসিসট্যান্ট পিটার। সামনের বাড়ি থেকে এসে একটা ফরসামতো ছেলে এদিক ওদিক কাজ করতে লাগল। হিন্দি সিনেমা দেখে দেখে ভালই হিন্দি বলে। তার নাম ফরহাদ। ফরহাদকে আমরা পিটারের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলাম।

নতুন বাড়িতে আমরা ঢুকলাম একত্রিশ ডিসেম্বর। সাহসের বলিহারি— সেইদিনই রাত্তিরে দূতাবাস থেকে আজাদ সিং তুর আর ডা. কুরেশিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে দিলাম। পিটার অবশ্য নির্বিকার— কোনও ব্যাপার নয় স্যার।

সন্ধে নাগাদ তুর তার ছোট হারমোনিয়ামটা বগলদাবা করে ডা. কুরেশির সঙ্গে এল। শুরু হল মজলিস। ডা. নাথ টেবিল বাজাল আর আমি মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম আর মাঝে মাঝে মাউথঅর্গান। ভীষ্মলোচন শর্মার মতো তুরের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। ভাগ্যিস জানলাদরজাগুলো বন্ধ ছিল। বাকিরা অবশ্য সেই হট্টগোলেও ঝিমোতে ঝিমোতে করুণ মুখ করে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' ভাবে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। ড. কুরেশি অবশ্য মাঝেমধ্যেই 'বাঃ বাঃ' করে গানের মাঝখানে চিৎকার করছিলেন।

চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে দশটা নাগাদ খেতে গেলাম আমরা। রুটি, ডাল, কপির তরকারি, স্যালাড আর রাজমা, সব যেন অমৃতের মতো খেতে লাগছিল। বছরের শেষ রাতে আমাদের অসামান্য ভোজন!

শেফ

পিটারের পক্ষে হাসপাতাল আর রান্নাঘর সামলানো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে। তাই রান্নাঘরে এক বাবুর্চি রাখা হল তার নাম হাবিবুল্লা। লম্বাচওড়া এই পাঠান যখন কাজ করতে ঢুকেছিল তখন বোকামতো একটা হাঁ করা লোক ছিল। একবর্ণ হিন্দি জানত না কাজেই কোনও কথাই বুঝতে পারত না। গত দু'মাস হল সে রান্নাবান্না ভালই করে, হিন্দিটাও বেশ ভালই রপ্ত করেছে। একদম গ্র্যান্ড হোটেলের শেফ নয়, তবে কাজ চলে যায়।

হাবিবুল্লা একদিন মুখ চুন করে আমাদের ঘরে ঢুকে এককোণে দাঁড়াল। বলল, "আমার এখানে কাজ করতে ভালই লাগছে। তোমরা সবাই খুব ভাল লোক। কিন্তু আমার একটা অসুবিধে হয়েছে। এখানকার কাজ আমায় ছাড়তে হবে। তোমরা কেউ কিছু চিন্তা কোরো না— আমি এখানকার জন্যে ভাল লোক এনে তাকে পুরো কাজ শিখিয়ে দেব। কিন্তু আমি কাল্ল থেকে কাজ ছেড়ে দেব।"

আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত। আমরা হামলে পরে ওকে নানান প্রশ্ন করতে শুরু করলাম।

হাবিবুল্লা তার পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল। ফার্সিতে কীসব লেখা, একপাশে তার ছবি। বলল, "আমি আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। গত চার বছরে, তালিবানদের জন্যে আমাদের কলেজ আর ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে গেছল। কিছুদিন আগে রেডিয়ো আর কাবুল টিভিতে খবর এসেছে যে কলেজ আবার খুলছে। এই মাস থেকেই ক্লাস শুরু হবে। পড়া শুরু করতে চাই আবার করে।"

"কী পড়ছ ওখানে?"

"ফিজিক্স, ম্যাথম্যাটিকস, ট্রিগনোমেট্রি, টেকনিক্যাল ড্রয়িং— সবই। আমার ভাইয়েরও কলেজ খুলে গেছে। সেও আবার পড়াশুনো করবে।"

"ভাই? কে ভাই?"

"ওই যে নাকিবুল্লা বলে তোমাদের পলিক্লিনিকে গার্ডের কাজ করে— ও তো আসলে আমার ভাই। ওর মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বছর হয়েছিল; ও পেডিয়াট্রিকস নিয়ে পড়াশুনো করছে। ও-ও আবার ডাক্তারির পড়া শুরু করবে।"

আমরা তো হতবাক। ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র আমাদের বাবুর্চি, আর ডাক্তারির ছাত্র আমাদের ডিস্পেনসারির পাহারাদার! আফগানিস্তানে যে কী চরম দুরবস্থা হয়েছিল তার একটা ঝলক পাওয়া গেল। সাধারণ লোকেদেরই বা কী অবস্থা হয়েছিল? কে জানে তারা খিদের জ্বালায় কী কী কাজ করত। বেশির ভাগই মনে হয় সহজ রাস্তায় যেত— বাজার থেকে এ-কে ৪৭ কিনে কোনও এক দলের সঙ্গে মিশে যাও।

যদি এ ধরনের একটা যুদ্ধ ভারতবর্ষে হত তা হলে—? ভাবতেই গা ছমছম করে উঠল।

ভিসিডি

এবাড়িতে আসার গোড়া থেকেই ফরহাদ আমাদের সাহায্যকারী। কাজ মোটামুটি ভালই করে, একটাই নেশা— সকাল বিকেল সিনেমা দেখে।

আমরা পয়সা জোগাড় করে একটা ভিসিডি কিনলাম। প্রায় রোজ সন্ধেবেলাই তাতে সিনেমা দেখা হয়। শুক্রবারে যে সিনেমা বম্বেতে বাজারে নামত সেই সিনেমার সিডি আমরা শনিবারে দেখতাম— পাকিস্তানের চোরাই বাজারের দরুণ। একদিন সন্ধেবেলা বসবার ঘরে ঢুকে ঘরটা অন্যরকম লাগল। প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

"ভিসিডি-টা কোথায়?"

ভিসিডি চুরি হয়ে গেছে। ফরহাদকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল পাশের বাড়ির ছেলে জল নিতে আসে, তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত। সামনের বাড়ির সৈনিকদের জিজ্ঞেস করাতে তারা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে এ-কে ৪৭ বাগিয়ে ধরে রাস্তা বাড়িময় দৌড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একজন বলল, "তোমাদের কাজের লোক ফরহাদ ওটা নিয়েছে আমি জানি। ওকে দু'দিনের জন্যে আমাদের কাছে ছেড়ে দাও, আমরা তোমাদের ভিসিডি ফেরত দিয়ে দেব।"

"কী ভাবে?"

"ওই যে লোহার কন্টেনার দেখছ, দু'দিন ধরে ওকে ওতে বন্ধ করে রাখব। আলো-বাতাস জল খাবার কিছুই পাবে না, মাঝে মাঝে মার খাবে; আল্লার নাম নিয়ে ভিসিডি ফেরত দিয়ে দেবে।"

"সে কী? তা কী করে সম্ভব? তোমার কাছে প্রমাণ কী?"

"প্রমাণ? আমরা সৈনিক আমাদের সন্দেহই যথেষ্ট।"

আমরা অবশ্য এই ধরনের ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী নই। সৈনিকরা সাবধান করে দিল। কারুর ওপর বেশি ভরসা কোরো না। আফগানিদের ওপর তো

একেবারেই নয়। তারা টাকার জন্যে যাইচ্ছেতাই করতে পারে এতকাল যুদ্ধের পরে।

আমরা মন ভার করে ভিসিডি-র লোকসানটা ভোলবার চেষ্টা করলাম। আমাদের ড্রাইভার তৈরালা বলল, "চিন্তা কোরো না। এসব এখানে হতেই থাকে। এত ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ভাবলে চলে না আফগানিস্তানে। এত বছরের যুদ্ধে এখানে কত লোক মরেছে মশামাছির মতো, সেখানে ভিসিডি নিয়ে চিন্তা করলে চলে? তোমাদের টাকাপয়সা আছে, রুটি খাবার ফুরসত আছে। বউ বাচ্চা ভালভাবে রয়েছে— এসব ভিসিডি চুরিটুরি নিয়ে চিন্তা কোরো না।" সে হাঃ হাঃ করে হেসে পিঠ থাবড়ে দিল আমাদের— হ্যান্ডশেক করে দিল।

ভিসিডি পাওয়া গেল না। ফরহাদের চাকরি গেল।

আজিম

একদিন ঘুরতে ঘুরতে আমরা কাবুলের খবরের কাগজের অফিসে এলাম। তিনতলা বাড়ি, বেশি অংশই এখন অকেজো। মনে হয় এককালে বেশ বড় অফিস ছিল। একতলায় প্রিন্টিং প্রেস, সেখানে আরবি অক্ষরের খবরের কাগজ ছাপা হচ্ছে। দোতলায় যেতে গিয়ে ধুলোবালি আর ঝুলমাখা সিঁড়ি পার হতে হল। ওপরে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের বসালেন। এঁর নাম আজিম, ইনি 'কাবুল টাইমস'-এর একজন সম্পাদক। মাঝারি উঁচু শ্যামবর্ণ, ছোট ছোট দাড়ি আর মুখে একটা হালকা হাসি, সব মিলিয়ে বেশ শান্তগোছের। আমাদের সবকিছু দেখালেন— কী কী কাজ হয় ইত্যাদি। ভদ্রলোকের ইংরেজিটা সাধারণ আফগানিদের থেকে অনেক ভাল; তবে কোথাও যেন একটা খটকা লাগছিল। ইংরেজিতে একটা অদ্ভুত টান ছিল, অনেকটা বাঙালি ইংরেজির মতো। আজিম জিজ্ঞেস করলেন—

"Mr. Ranjit, you are from...?"

"Well, I mean I am from Bengal— a town called Barrackpur."

শান্ত আজিম হঠাৎ তিনহাত লাফ মারলেন।

"Barrackpur! Actually I am also from there. I left India forty years back. I had come to Kabul to establish a printing press. Then I settled down here. I have left India for good. I do not think about going back."

বলে আজিম যেন একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন। আমরা তো হাঁ। মি. রঞ্জিত বললেন, "What a place to meet another man from Barrackpur!"

আজিম তখন আমার সঙ্গে তাঁর মরচেধরা ভাঙা ভাঙা বাংলায় গল্প শুরু করলেন। মনে হল যেন চল্লিশ বছর পরে বাংলা বলছেন। বাংলাটা প্রায় তিনি ভুলেই গেছেন। তবে খাঁটি বাঙালি রক্ত টগবগিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগে

না। এতদিন পরে মাতৃভাষায় কথা বলতে পেরে তিনি আর লোভ সামলাতে পারছেন না। এতকাল ধরে হয়তো আফগানি হয়ে গেছেন কিন্তু হাজার হোক বাঙালিই তো।

আজিম আমাদের বাড়ির ঠিকানা নিলেন। আমরা যখন অফিস থেকে বেরোচ্ছি তখন মি. রঞ্জিত আমাকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। পরে বললেন, "এঁর কথা আমি ড. কুরেশির কাছে শুনেছি। ইনি আসলে একজন হিন্দু বাঙালি। এখানে যখন এসেছিলেন তখন এঁর বয়েস কুড়ি-পঁচিশ ছিল। এখানে নিশ্চয়ই কোনও মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে-থা করে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাই মুসলমান হয়ে গেছেন।"

অদ্ভুত ব্যাপার। চল্লিশ বছর ধরে— যার মধ্যে তেইশ বছর শুধুই যুদ্ধ, একটা লোক নিজের পৈতৃক বাড়িঘর সব ছেড়ে সমস্ত আত্মীয়স্বজন আর প্রিয়জনদের ভুলে এখানে বসবাস করছে। একবারও ভারতবর্ষে ফিরে যায়নি। মনে হয় না কোনও চিঠিপত্র বা টেলিফোনে যোগাযোগ আছে। হয়তো আজও এর কোনও ভাই বোন বা বুড়ো বাপ-মা এখনও এই আশায় বসে আছেন যে সে হয়তো কোনওদিন ব্যারাকপুরে ফিরে আসবে।

আজিম দু'বার আমাদের বাড়িতে এলেন। আমার সঙ্গে প্রাণপণে বাংলা বলবার চেষ্টা করেন। একদিন উনি ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন। আমরা গেলাম মেকোরিয়ান। এই সেই এলাকা যেখানে রুশিদের তৈরি অজস্র ছাঁচে ঢালা ফ্ল্যাটবাড়ি আছে। এককালে এখানে রুশিরা থাকত। আজ সাধারণ লোকেরা— যে যেমন পেরেছে।

আমরা ফ্ল্যাটের সামনে আসতেই আজিম সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। ভীষণ গদগদ হয়ে 'নমস্কার' বলে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। চারতলা উঁচু কালচে রঙের ফ্ল্যাট, তার বেশির ভাগ সিঁড়িগুলোই ভাঙা। জানলার কাচ নেই, সিঁড়িতে ও ঘরের ভেতরে সেন্ট্রাল হিটিংয়ের ব্যবস্থা— সেগুলো এখন মরচেধরা, একপাশে পড়ে রয়েছে। সব ফ্ল্যাটগুলোরই অবস্থা বেশ সঙ্গীন।

জুতো খুলে ঘরে ঢুকলাম। মেঝেতে লাল গালচে পাতা রয়েছে, ঘরের তিনদিকে লম্বা লম্বা তিনইঞ্চি মোটা গদি। একপাশে একটা বইয়ের আলমারি। তাতে কিছু পুরনো ইংরেজি বই, মনে হয় আজিম এগুলো চল্লিশবছর আগে নিয়ে এসেছিলেন, বা তখন কিনেছিলেন। ঘরের অন্যপাশে

একটা নতুন টিভি— বোধহয় তালিবানদের পতনের পরে কেনা হয়েছে। আজিমের চার ছেলে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করল। বড় ছেলে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় এয়ারলাইনস— 'আরিয়ানা এয়ারলাইনস'-এর পাইলট। সে রুশ দেশে গিয়ে পাইলট হয়েছে— ইংরেজি ও রুশি ভালই জানে। আজকাল অবশ্য বেকার বসে আছে। 'আরিয়ানা এয়ারলাইনস'-এর মাত্র দুটো প্লেন আছে যার মধ্যে একটা খারাপ। অতএব, বিস্তর পাইলট একটা প্লেনকেই বারে বারে চালায়। দ্বিতীয় ছেলে অ্যাকাউন্টেন্ট। বাকি দু'জন পড়াশুনো করছে। এরা বিশেষ ইংরেজি টিংরেজি জানে না। আজিমের বড় ছেলে আমিন আমাদের সঙ্গে গল্পসল্প করল।

খাবার এল। লম্বা প্লাস্টিকের দস্তরখান পাতা হল। একটা বিরাট লোটাজাতীয় পাত্র থেকে জল ঢেলে হাত ধোয়া হল। এ জিনিসটা অবশ্য আমি আমাদের বর্ধমানের দেশের বাড়ির চাষিদের ঘরেও দেখেছিলাম। প্রথমে এল আফগানি পোলাও-কাবুলি। এটার সঙ্গে আমরা পরিচিত কাবুল হোটেল থেকে। এর পরে এল মুরগি। তবে শুকনো নয়, ঝোলওয়ালা। একটু বাঙালির ছোঁয়াচ রয়েছে। তারপরে এল অশাক— এটা এখানকার নিরামিষ মোমো। সঙ্গে এল দই, পুদিনা ইত্যাদি আর এল নান, সেগুলো সব ছোট ছোট টুকরো করে ধপাস ধপাস করে দস্তরখানের ওপর ফেলা হল। শেষে এল রিমঝিম কোলা। এটা এখানকার কোকাকোলা— ইরানের তৈরি; আর তার সঙ্গে কমলালেবু।

বেশ খিদে পেয়েছিল। নিমেষের মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল। পেট ফুলে ঢোল— আবার তার ওপরে পড়ল আফগানি চা। আজিম আমাদের জন্যে চায়ে দেবার চিনির ব্যবস্থা করেছিলেন। আমিন পুরো খাবার পরে ছ'কাপ চা খেল।

ভাঙা ভাঙা বাংলায় আজিম অনেক পুরনো কথার উল্লেখ করছিলেন।

"আচ্ছা, ট্রামগুলো এখন চলে? মেট্রো সিনেমা— আছে? বোরোলিন পাওয়া যায়? খুব ভাল জিনিস, এখানে বড্ড ঠোঁট ফাটে।"— ইত্যাদি। কথায় জানলাম তাঁর মা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। বাড়ির কথাতে অবশ্য একবারও তাঁর বাবার উল্লেখ করলেন না। হয়তো এখানে এসে, ধর্ম পরিবর্তন করে বিয়ে-থা করাতে তাঁর বাবার সঙ্গে ঘোর মনোমালিন্য হয়েছিল। মনে হয় তাই থেকেই দেশে আর না ফেরার রোখটা চেপে যায় এঁর। মাঝে মাঝে মনে

হচ্ছিল তাঁর একটু আক্ষেপ হচ্ছে। কথা বলতে বলতে চুপ করে যাচ্ছিলেন, জানলার বাইরে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিলেন। ব্যারাকপুরের বাড়ির ছবি দেখালেন। তবে বাড়ির লোকেদের কোনও ছবি নেই। কিংবা হয়তো আমাদের দেখাতে চান না পাছে আমরা বুঝতে পেরে যাই যে তিনি এককালে হিন্দু ছিলেন।

খাওয়াদাওয়ার পরে আজিম বললেন, "আমার বঙ্গবন্ধুর জন্যে আমি এইটুকুই করতে পারি। বঙ্গবন্ধুকে আমি কোনওদিন ভুলব না।"

বাংলার খাবারের কথার মাঝে বললেন, "কে সি দাস এখনও আছে কি?"

অশাক তৈরি করার কায়দাটা যখন বলছিলেন তখন হঠাৎ বলে উঠলেন, "এটা দেখে আমার পিঠের কথা মনে পড়ে যায়। পুলিপিঠে, গুড়পিঠে, রাঙাআলুর পিঠে আরও কী কী সব ছিল।"

আমরা যখন আজিমের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি তখন রান্নাঘরের মধ্যে থেকে কয়েকজন মহিলার মৃদু আওয়াজ শোনা গেল। এঁরা হয়তো আজিমের বউ আর তাঁর ছেলের বউ। এঁরাই আমাদের জন্যে সব রান্নাবান্না তৈরি করেছিলেন। তাঁদের কেউই একবারও বাইরে এলেন না— এমনকী বোরখা পরেও না। আজিম যে পুরোপুরি আফগানি হয়ে গেছেন সেটা বুঝতে পারলাম। গত পাঁচ বছর তালিবান শাসনের দরুণ, বা তাদের আধিপত্যের ভয়ে তিনি পুরনো পরিবেশে ফিরে যেতে পারছেন না। কাল যে কী হবে কেউ তা জানে না। যদি তালিবান বা সেই ধরনের অন্য কোনও দল আবার ফিরে আসে?

পাঞ্জশের

মি. রঞ্জিত একদিন বললেন, "পাঞ্জশের যাওয়া যাক। ওখানে যদি একটা ছোট চিকিৎসাকেন্দ্র করা যায় তাহলে মন্দ হয় না।"

সকাল ছ'টায় টয়োটা গাড়ি এসে হাজির। সারাদিন যাতায়াতের জন্যে নেবে একশো ডলার— হাজার পাঁচেক টাকা। ড্রাইভারের নাম জারিফ, একটু-আধটু হিন্দি জানে। আমি, ডা. বালা আর মি. রঞ্জিত গাড়িতে চেপে বসলাম।

কাবুল শহর যখন ছাড়লাম তখন ভাল করে ভোর হয়নি। গাড়িতে হিটার চলছে আর টেপে চলছে হিন্দি সিনেমার গান। আস্তে আস্তে পাহাড়ের পেছন থেকে চারদিকে সোনালি আলো ভরে যেতে লাগল। দু'পাশের পাথর, বালিওয়ালা ন্যাড়া পাহাড়, তার মাঝে বিরাট একটা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে চওড়া রাস্তা—নব্বই কিলোমিটার গতিতে আমরা এগিয়ে চলেছি। জলের কোনও লক্ষণ নেই তাই চাষবাসের কোনও বালাই নেই। রাস্তার ধারে সেই চেনা সাইনবোর্ড—"Beware of Landmines." এক জায়গায় দেখলাম গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা বাড়ি; কিছু বাড়ি অক্ষত তবে বেশিরভাগই ভেঙে গেছে। দু'-একটা নালা দেখা গেল, তার আশেপাশে ক্ষেত। এখানে যে এককালে চাষবাস হত বোঝা গেল। জারিফ বলল, "এই অঞ্চলের নাম সোমালি। এককালে এটা আফগানিস্তানের খুব উর্বর জায়গা ছিল। ওই যে দূরে পাহাড় দেখছ, ওটা হিন্দুকুশ। এখান থেকে ওই অবধি আঙুরের ক্ষেত ছিল। এখানকার গ্রামের লোকেরা বেশ ধনী ছিল। কান্দাহারের আঙুরের পরেই শোমালির আঙুরের নাম। গৃহযুদ্ধের সময়ে এবং তারপর মাসুদ ও তালিবানদের লড়াইয়ের দরুণ এখানকার লোকেরা সব পালিয়ে যায়। ওই প্রকাণ্ড উপত্যকার পুরোটাই একটা রণক্ষেত্র হয়ে গেছিল। তালিবানরা এই এলাকাটা কবজা করে; পাছে মাসুদের লোক এখানে আবার ঘরসংসার

পাতে— সেটা এড়াতে ওরা সমস্ত আঙুরের গাছ কেটে দিয়েছিল। জলের নালাতে বিষ দিয়ে দিয়েছিল আর চারদিকে মাইন লাগিয়ে দিয়েছিল। এখন দেখো কী অবস্থা।"

মাইলের পর মাইল মাটির বাড়ির মধ্যে দিয়ে আমরা যেতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল কোনও এক ভুতুড়ে সিনেমার সেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। একটা ঘাসেরও চিহ্ন নেই, কাকপক্ষী তো দূরের কথা। এখানে হয়তো কোনওদিন আঙুর ফলানো যাবে না আর। শুনেছি আঙুরের লতা গজাতে দীর্ঘ কয়েক বছর লাগে।

সাতটা নাগাদ পরবান প্রদেশের রাজধানী চারিকায় এলাম। ছোট্ট শহর, বেশ কিছু দোকানপাট খুলে গেছে। বাকি সব খুলব খুলব করছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জীবনযাত্রা শুরু হয়ে যায়। সন্ধে নাগাদ বন্ধ হয়ে যায় সব দোকানপাট। রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে যে যার নিজের বাড়িতে। কোনও 'নাইট লাইফ' নেই এখানে। তার একটা কারণ—এত বছরের যুদ্ধ, তা ছাড়া কে যে ভাল লোক, কে যে কোন দলের তা কেউ জানে না। অবশ্য এসব এলাকায় বিজলিও নেই।

জাবুলসারাজে রাস্তা দু' ভাগ হয়ে গেল। সোজা গেল হিন্দুকুশের সালাং টানেল পার হয়ে মাজার-এ-শরিফ। ডানদিকে চলে গেল পাঞ্জশের উপত্যকা। জারিফ বলল যে, একটু পরে আমরা পাঞ্জশের ঢুকব। ইংরেজিতে একে বলা হয় পাঞ্জশির। পাঞ্জশের মানে পাঁচটা শের। তারা কারা, সিংহ না মানুষ, সে ব্যাপারে ও কিছু বলতে পারল না। মনে খটকা লাগল—তারা কি কোনও কারণে পঞ্চপাণ্ডব হতে পারে? এসব তো এককালে ভারতবর্ষেই ছিল। গান্ধার অঞ্চলটাও খুব দূরে নয়।

দূর থেকে দেখা গেল কাপিসা বলে একটা এলাকা। এই কাপিসায় কুষাণরাজা কনিষ্কের রাজধানী ছিল। গরমে তিনি এখানে থাকতেন, শীতের সময় দিল্লি-মথুরা চলে যেতেন। মনে পড়ল ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক-এ যেন পড়েছিলাম— এই কাপিসাতেই কী সব খোঁড়াখুঁড়ি করে একগাদা ধনরত্ন উদ্ধার করা হয়েছিল।

গুলবাহার বলে একটা গ্রাম পেরিয়ে একটা চেকপোস্ট এল। আমরা পাঞ্জশের উপত্যকায় ঢুকলাম। ডানদিকে অনেক নীচে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি নদী। নদীর ধারে ধারে জল এত স্বচ্ছ যে তলার পাথরগুলো পর্যন্ত দেখা

যাচ্ছিল। মাঝখানের জলটা ময়ূরকণ্ঠী রং— গাঢ় নীলচে সবুজ। বাঁদিকে খাড়া পাথরের পাহাড় উঠে গেছে। পাথরের পথটা এঁকেবেঁকে দূরে একটা গ্রাম অঞ্চলের দিকে চলে যাচ্ছে। সেখানে কিছু সবুজ আর হলদে ক্ষেত, মনে হয় গমের। পাহাড়ের মাথায় ছিটেফোঁটা বরফ। আকাশের রং গাঢ় নীল, একটুকরো মেঘও নেই। সব মিলিয়ে একদম ছবির মতো দৃশ্য।

দৃশ্যটা ছবির মতো হলেও প্রায়শই তাতে খ্যাঁচ করে হেঁচকি লাগছিল। জায়গায় জায়গায় ভাঙা ট্যাঙ্ক ও জিপ পড়ে আছে। দু-এক জায়গায় দুমড়ানো-মুচড়ানো ব্রিজ। অবশ্য কোনও মাইনফিল্ডের বোর্ড দেখলাম না। পাঞ্জশের ছিল আহমেদ শাহ মাসুদের গড়। এই এলাকা থেকে সে মুজাহিদ্দিন হয়ে রুশিদের সঙ্গে লড়াই করেছিল, তারপর নাজিবুল্লা সরকারে এবং তারপরে গৃহযুদ্ধে লড়েছিল। তালিবানদের সঙ্গেও সে এইখান থেকে লড়ত। পাঞ্জশের উপত্যকাকে অন্য কোনও সৈনিকের দল আজ অবধি কবজা করতে পারেনি।

আমাদের গাড়িটা একটা ছোট পাহাড়ের ওপর উঠে গেল। একটা সাইনবোর্ড দেখলাম—"The Chief of Martyrs hill"— জারিফ ফিসফিস করে বলল, "মাসুদের কবর।" গাড়ি থেকে নামলাম। হিটার থেকে সোজা পাহাড়ি ঠান্ডায় নামতেই হাত-পায়ে কনকনে ব্যথা করতে লাগল। কবরের ওপরের বাড়িটা একটা মসজিদের মতো তৈরি হচ্ছে। চারদিকে মিস্ত্রিদের ছড়াছড়ি। মিলিটারির লোকেরা বন্দুক নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। ভেতরে মাসুদের মাটির কবর, তার ওপরে ধূপবাতি লাগানো রয়েছে প্লাস্টিকের ফুলের সঙ্গে। রুশি আমল থেকে মাসুদের উপাধি ছিল— "শের-এ-পাঞ্জশের।" উনপঞ্চাশ বছর বয়েসে যখন তালিবান ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রে মাসুদকে গুলি করা হয়, তখন তার সৈনিকরা ভীষণ হতাশ হয়ে গেছিল। এখানকার লোকেরা বলে সেদিন নাকি কিছু তালিবান যোদ্ধারাও চোখের জল ফেলেছিল—এরকম যোদ্ধা নাকি আফগানিস্তানে আর জন্মাবে না। আজ আহমেদ শা মাসুদের জয়জয়কার চারদিকে। সে এখন জাতীয় নেতা। তার দলের অনেক হোমরাচোমরারা সরকারের বড় বড় মন্ত্রী। তার মধ্যে একজনের সঙ্গে আমরা তো এলাম—ইউনুস কানুনি। ডা. বালা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "Poor man! I feel he has been cheated by fate! মহানায়ক হবার যখন সময় এল তখন সে আর রইল না। লোকটা বেঁচে থাকলে আজ রাজা হত।"

মুজাহিদ্দিনদের একটা শিক্ষানবিশী এলাকা পেরিয়ে আমরা এক গ্রামে এসে থামলাম। যতক্ষণে চায়ের দোকানে ঢুকলাম ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে। মনে হল আমরাই প্রথম বিদেশি এই এলাকায়। ছেঁড়া কার্পেট পাতা চায়ের দোকানের এক কোনায় একটা বড় বুখারি—একটা টিনের গোল বালতির মতো— যার থেকে একটা চিমনি বেরিয়ে আছে। বুখারির ভেতরে কাঠের আগুন জ্বলছে— তার ওপরে রাশি রাশি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি চায়ের কেটলি রাখা রয়েছে। কার্পেটে বসে পাঁচ-ছ'টা দাড়িওয়ালা বুড়ো আফগানি বা পাঞ্জশেরি চা খাচ্ছে। আমরা বসতে দস্তরখান পাতা হল— নান এল আর এল ফুটন্ত চা। দাড়িওয়ালা আফগানিরা আমাদের দেখে খুব বিগলিত, দুঃখের বিষয় এক বিন্দুও হিন্দি জানে না। শুধু কাজের কথাটা বলতে পারল, "দোস্ত, খুব অস্ত্।" বলে দাড়ির ভেতর থেকে হলদে হলদে বত্রিশপাটি দাঁত বার করে হাসল।

জল সরবরাহের একটা অন্যরকম ব্যবস্থা দেখলাম। পাহাড়ি নদী থেকে জায়গায় জায়গায় নালী কাটা রয়েছে। নদীর জল বইছে সেই সব নালীতে; নদীটা পাহাড় দিয়ে কয়েকশো ফুট নীচে নেমে যাচ্ছে আর নালীটা চলেছে রাস্তার ধার দিয়ে। সেই জল অবশেষে অনেক দূরে কোনও গ্রামে বা ক্ষেতে পৌঁছচ্ছে। এইভাবে এইসব শুকনো পাহাড়ি এলাকায় জল যায়। এই নালীঘটিত ব্যাপারটাকে বলে 'জোয়ে'। এটা নাকি কয়েক হাজার বছরের পুরনো ব্যবস্থা।

দূরে একটা বাড়ি দেখিয়ে জারিফ বলল, "ওইটে মাসুদের শ্বশুরবাড়ি।"

"ওখানে এখন কে কে আছে?"

"ওর বউ আর চারজন ছেলেমেয়ে ওখানেই ছিল। দু'দিন আগে তারা হেলিকপ্টার করে তোজিকিস্তান চলে গেছে। সরকারই সব ব্যবস্থা করেছে। ছেলেমেয়েরা ওখানেই পড়াশুনো করবে। এখন এখানে মাসুদের শ্বশুর তাজউদ্দিন থাকেন।"

আমরা কাকা তাজউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভেতরে ঢুকতেই একজন আধবুড়ো লোক হইহই করে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরে প্রায় চুমুটুমু খায় আর কি। সেই একই গল্প—হিন্দুস্থানিরা কত ভাল ইত্যাদি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা শুনে তাজউদ্দিন প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল, পারলে কালই চালু করে ফেলে। হাত-পা ধরে আমাদের রাত্তিরে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলল সে। ভারী

বেগতিকে পড়লাম আমরা। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঞ্জশের থেকে বেরতে পারলাম।

এবার জাবুলসারাজ হয়ে সালাঙের দিকে রওনা হলাম। রাস্তায় ভাঙা ভাঙা ট্যাঙ্ক ও অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট বন্দুক দেখলাম। গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা তাতে চড়ে খেলা করছিল। অনেককাল আগে আমার বোনের গাওয়া একটা গান মনে পড়ে গেল।

"সব যুদ্ধ থেমে যাবে একদিন,
রণক্ষেত্র ছেয়ে যাবে ঘাসে
জঙ্গলে পড়ে রবে রাইফেল
ডুবে যাবে সব বোমারু।
ট্যাঙ্কের ওপরে করবে খেলা শিশুরা
মুক্তির আলোকে হেঁটে যাবে যুবরা
বীর সেনানীর শুভ্র সমাধিতে
দিয়ে যাবে ফুল দেশপ্রেমী মানুষেরা।"

দেখা যাক এ কবিতাটা এখানে কতদিন খাটে।

জাবুলসারাজে ফিরে এসে আমরা এবার অন্য রাস্তা ধরলাম। আমরা যাচ্ছি সোজা হিন্দুকুশের দিকে—এই রাস্তা হিন্দুকুশ ফুঁড়ে সালাং টানেল হয়ে উত্তর আফগানিস্তানে চলে যায়। সেখান থেকে পুল-এ-কুমরি, কুন্দুজ, মাজার-এ-শরিফ আর আমুদরিয়া নদী পর্যন্ত যায়। হিন্দুকুশটা মোটামুটিভাবে আফগানিস্তানের মাঝখানে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তিনভাগের দু'ভাগ আফগানিস্তান হিন্দুকুশের দক্ষিণে; বামিয়ান উপত্যকাটা হিন্দুকুশের কোলের মধ্যে।

গাড়ি আস্তে আস্তে পাহাড়ে চড়তে লাগল। বেশ রোমাঞ্চিত লাগছিল। সেই বিখ্যাত হিন্দুকুশ, যেখান দিয়ে আলেকজাণ্ডার থেকে আরম্ভ করে সব পশ্চিমি আক্রমণকারীরা ঢুকেছে ভারতবর্ষে। রাস্তার ধারে দেখা দিল ঝরনা থেকে তৈরি করা ছোট ছোট জোয়ে। গ্রাম ও ক্ষেতের সংখ্যা কমে যেতে লাগল; ঝোপঝাড় শেষ হয়ে গিয়ে বরফ দেখা দিল। বিরাট বড় বড় হেয়ারপিন বেন্ড এল; পথের ওপরে সিমেন্ট ও কংক্রিট দিয়ে বরফের ধ্বস আটকাবার জন্যে স্নো-শেড দেখা

দিল। একটা বেন্ডে এসে জারিফ বলল, "ওই দেখো একটা বাস কনডাক্টরের দরগা। বাসভর্তি লোক এই মোড়টায় আসার পর ব্রেকটা খারাপ হয়ে যায়। কনডাক্টর ও দু'-তিনজন ঠেলাঠেলি করে বাসটাকে আটকাবার চেষ্টা করে; তাতেও যখন থামল না, তখন কনডাক্টর গাড়ির চাকার সামনে শুয়ে পড়ে। সে তো চেপটে মরে গেল কিন্তু বাসসুদ্ধ লোক বেঁচে গেছিল।"

ভয়ংকর গল্প। জাঁদরেল পাঠানদের পক্ষেই এ কীর্তি করা সম্ভব। আমাদের দেশেও এ ধরনের একটা গল্প আছে— সে অবশ্য অনেক নিরীহ— তার নাম আরুণি।

সালাঙের কাছাকাছি এসে দেখলাম প্রচুর ট্যাক্সির ভিড়। গত কয়েক বছরের যুদ্ধের দরুণ এই টানেলটা ভেঙে গেছে। অতএব রাস্তা বন্ধ। উত্তর আফগানিস্তান যাবার জন্যে আগে যাত্রীরা বামিয়ানের দিকে গিয়ে অর্ধেক হিন্দুকুশ ঘুরে উত্তরদিকে যেত। কিছুদিন হল সালাং টানেলের কাজ আরম্ভ হয়েছে। যাত্রীরা ট্যাক্সি করে এতদূর অবধি আসে, তারপর জিনিসপত্র ঘাড়ে নিয়ে অন্ধকার, ধুলো, পাথরওয়ালা দমবন্ধকরা টানেলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ওপারে যায়, সেখান থেকে অন্য ট্যাক্সি ধরে উত্তর আফগানিস্তানে যায়।

আমরা সালাং টানেলে হেঁটে ঢুকলাম। বাইরের আলো ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। ভেতরে একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ, চারদিকে ধুলো উড়ছে, তারই মধ্যে ডা. বালা, "উঃ বড্ড থকে গেছি" বলে একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল। তাকে এক থাবড়া দিয়ে বারণ করলাম। ভেতরের হাওয়ায় কী গ্যাস আছে জানা নেই; মিথেন থাকা অসম্ভব নয়। ভেতরে কিছু রুশি ইঞ্জিনিয়ার প্রাণপণে টানেল মেরামতের কাজ করে চলেছে। মস্ত বড় বড় এক্সাভেটার, বুলডোজার এইসব দিয়ে কাজ চলছে। তারা বলল যে, আড়াই-তিন কিলোমিটার রাস্তা ধ্বসে গেছে। খুলতে দশ-পনেরো দিন লাগবে। আমাদের অবশ্য মনে হল আরও বেশিদিনও লাগতে পারে।

রুশি সরকারের ব্যাপারস্যাপার ঠিক বুঝতে পারলাম না। এককালে এরাই দশ বছর ধরে আফগানিস্তানকে কবজা করার চেষ্টা করছিল। বাড়িঘর রাস্তাঘাট সব নিজেদের ধাঁচে তৈরি করেছিল। তারপরে খেদানি খেয়ে ফেরত যায়। আজ আবার তারাই বিনামূল্যে আফগানিস্তান সরকারকে প্রাণপণ সাহায্য করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সন্ধে নাগাদ আমরা কাবুল ফিরে এলাম।

কাবুল দর্শন

কাবুল শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কাবুল নদী। এই নদী এককালে বেশ বড় ছিল; ইদানীংকালে বরফ কম পড়াতে একটা শুকনো নালার মতো হয়ে গেছে। নদীর একপাশে পুরনো পুরনো অনেক বাড়ি আর একটা মসজিদ। ওপারে ছোট ছোট দোকানের ঘিঞ্জি ভিড়। সেই ভিড়ের মাঝখান থেকে উঠেছে এক বিরাট গম্বুজের মতো সৌধ, এটা এখানকার আগেকার রাজা তিমুর শাহের সমাধি। এই তিমুর শাহ কিন্তু তিমুর লঙ নয়। এ একজন ছোটখাটো রাজা আফগানিস্তানের, পুরো বাজার এলাকাটার নাম তাই তিমুরশাহি।

আমরা একদিন তিমুরশাহিতে গেলাম। কবরের পাশ দিয়ে বাজারে ঢুকলাম। ওলি-গলি, ভুলভুলাইয়ার মতো, কাদায় প্যাচপ্যাচে বাজার। কেউ বিক্রি করছে কাপড়, কোথাও দরজির দোকান। কিছু নতুন দোকানে দেখলাম মেয়েদের সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি হচ্ছে। নীল বোরখাপরা মেয়েরা উত্তেজিত কণ্ঠে কলরব করে লিপস্টিক-নেলপলিশ-পাউডার সব কিনছে। ভেতরদিকের গলিগুলোতে পাহাড় করে রাখা রাজমা কিসমিস পেস্তা বাদাম আখরোট খুরমানি চিলগোজা— আরও একরাশ শুকনো ফল। দাড়িওয়ালা আফগানিরা, বুড়ো কাবুলিওয়ালারা সেসব বিক্রি করছে। এরা বোধহয় মিনির কাবুলিওয়ালা নয়। এদের ব্যবসার মাত্রা অনেক বড়। ঝোলা ভরে, উটের পিঠে পাহাড় পেরিয়ে দূরদেশে গিয়ে মেওয়া বিক্রি করার লোক এরা নয়। মোটামুটি জাঁদরেল ব্যবসাদার—দরদামের ওঠাপড়ায় বিশ্বাস করে না। বাজারের আরও ভেতরে, গলির মধ্যে পাকিস্তান থেকে আসা রংবেরঙের বেডফোর্ড ট্রাকের ভিড়। ট্রাক থেকে বস্তা করে চাল, গম, ডাল, তেল, মশলাপাতি, সাবান, নুন, দেশলাই— সবরকম জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে। এটাই কাবুলের সাংসারিক পাইকারি বাজার। বাজারের মেরুদণ্ডই হচ্ছে

কাবুল দর্শন

কাবুল শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কাবুল নদী। এই নদী এককালে বেশ বড় ছিল; ইদানীংকালে বরফ কম পড়াতে একটা শুকনো নালার মতো হয়ে গেছে। নদীর একপাশে পুরনো পুরনো অনেক বাড়ি আর একটা মসজিদ। ওপারে ছোট ছোট দোকানের ঘিঞ্জি ভিড়। সেই ভিড়ের মাঝখান থেকে উঠেছে এক বিরাট গম্বুজের মতো সৌধ, এটা এখানকার আগেকার রাজা তিমুর শাহের সমাধি। এই তিমুর শাহ কিন্তু তিমুর লঙ নয়। এ একজন ছোটখাটো রাজা আফগানিস্তানের, পুরো বাজার এলাকাটার নাম তাই তিমুরশাহি।

আমরা একদিন তিমুরশাহিতে গেলাম। কবরের পাশ দিয়ে বাজারে ঢুকলাম। ওলি-গলি, ভুলভুলাইয়ার মতো, কাদায় প্যাচপ্যাচে বাজার। কেউ বিক্রি করছে কাপড়, কোথাও দরজির দোকান। কিছু নতুন দোকানে দেখলাম মেয়েদের সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি হচ্ছে। নীল বোরখাপরা মেয়েরা উত্তেজিত কণ্ঠে কলরব করে লিপস্টিক-নেলপলিশ-পাউডার সব কিনছে। ভেতরদিকের গলিগুলোতে পাহাড় করে রাখা রাজমা কিসমিস পেস্তা বাদাম আখরোট খুরমানি চিলগোজা— আরও একরাশ শুকনো ফল। দাড়িওয়ালা আফগানিরা, বুড়ো কাবুলিওয়ালারা সেসব বিক্রি করছে। এরা বোধহয় মিনির কাবুলিওয়ালা নয়। এদের ব্যবসার মাত্রা অনেক বড়। ঝোলা ভরে, উটের পিঠে পাহাড় পেরিয়ে দূরদেশে গিয়ে মেওয়া বিক্রি করার লোক এরা নয়। মোটামুটি জাঁদরেল ব্যবসাদার—দরদামের ওঠাপড়ায় বিশ্বাস করে না। বাজারের আরও ভেতরে, গলির মধ্যে পাকিস্তান থেকে আসা রংবেরঙের বেডফোর্ড ট্রাকের ভিড়। ট্রাক থেকে বস্তা করে চাল, গম, ডাল, তেল, মশলাপাতি, সাবান, নুন, দেশলাই— সবরকম জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে। এটাই কাবুলের সাংসারিক পাইকারি বাজার। বাজারের মেরুদণ্ডই হচ্ছে

পাকিস্তান। কাজেই আফগানিরা মনেপ্রাণে পাকিস্তানিদের যত ঘেন্নাই করুক না কেন, তাদের ছাড়া ওরা অনাহারে মরে যাবে।

গলিতে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধে হয়ে গেল আমাদের। যখন কাবুল নদীর দিকে ফিরে আসছি, ততক্ষণে অনেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন আমার জ্যাকেটটা খামচে ধরে কীসব বলতে লাগল ফারসি ভাষায়। তাকিয়ে দেখলাম একটি কম বয়সী ছেলে—তার ভাল করে গোঁফ বেরোয়নি—পুলিশের পোশাক পরে আমাদের ডাকছে। পিঠে একটা এ-কে ৪৭। তার ভাষা কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। আশেপাশের দোকানদাররা বলল, "ও বলছে তোমাদের ওর সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

"কেন? কী জন্যে?"

"তোমরা কে, কী করছ এখানে, তাই জানতে চাইছে ও।"

আমরা তখন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পাসপোর্ট বার করে, "দোস্ত—হিন্দুস্থানি ভাই"— এইসব বলে পুলিশকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। সে নাছোড়বান্দা, "দরকার নি অস্ত্" বলে এ-কে ৪৭-এর নলটা আমার কোমরে ঠুসে দিল। এ তো আচ্ছা আপদ। আঙুল ফসকে যদি পিড়িং করে একটা গুলি বেরিয়ে যায়, তাহলে তিমুর শাহের পাশে আমাকে শুতে হবে। আমরা তখন বাধ্য ছেলের মতো তার সঙ্গে থানার দিকে রওনা হলাম।

থানার গেটের পাশে একটা ছোট ঘরে ক'টা পুলিশ বসেছিল। তাদের মধ্যে একজন হিন্দি জানত। ফচকে পুলিশ তাদের কাছে আমাদের জিম্মা দিয়ে কীসব বলল। মনে হল যেন 'দুশমন' কথাটা কানে এল। পুলিশটা জানতে চাইল কী ব্যাপার। আমরা পাসপোর্ট বার করতে একটু ঘাবড়ে গেল। ডা. নাথের কাছে ইন্দিরা গাঁধী হাসপাতালের কার্ডটাও ছিল, সেটা বার করতে তারা আরও ঘাবড়ে গেল। শেষে থানার বড়সায়েব উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে— 'আসলে ওই ছেলেটা নতুন পুলিশ হয়েছে। ঠিক বুঝতে পারেনি, পাকিস্তানি ভেবে তোমাদের ধরে নিয়ে এসেছে। অ্যাম সরি, ড্যাম সরি, ভেরি ভেরি সরি। মশলা খাবে?' ইত্যাদি বলে আমাদের মাথা ঠান্ডা করবার চেষ্টা করতে লাগল। এবার আমাদের মেজাজ দেখাবার পালা। এ-কে ৪৭-এর সুড়সুড়িটা ভুলে আমরা প্রচণ্ড রেগে বললাম, "তোমাদের লোককে বোলো আমাদের কথাটা অন্তত ঠিক করে শুনুক।" বড়সাহেব তখন

"জি" বলে ফচকেটাকে ডেকে পাঠাল। কোথায় ফচকে? সে ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে ঘরের মধ্যে গুরুতর গণ্ডগোল চলছে, বেগতিক দেখে দৌড়ে পালিয়েছে।

আমাদের জন্যে গরম গরম চা, পেস্তা বাদাম কিসমিস এল। সেসব খেয়ে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে; যাও, তোমাদের ক্ষমা করলাম—এরকম একটা ভাব দেখিয়ে বেরলাম। জীবনে প্রথমবার থানায় আসার অভিজ্ঞতাটা মন্দ হল না।



কাবুলে সম্রাট দর্শন

আজাদ সিং তুর একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করল, "সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেছ? অ্যাপয়েন্টমেন্টের দরকার নেই, যাও আজই চলে যাও।"

আমরা সবাই মিনিবাস চেপে বেরিয়ে পড়লাম। কাবুল নদীর পাশ দিয়ে, কোহে আসামাই পাহাড়ের ধার দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। একটা মরচেপড়া পুরনো ধাঁচের ব্রিজ, অনেকটা গোল্ডেন গেট ব্রিজের মতো দেখতে। তৈরালা বলল, "এটা খুদা গাওয়া ব্রিজ। যেখানে অমিতাভ বচ্চন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে শ্রীদেবীকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছল—"খুদা গাওয়া" সিনেমাতে।"

কাবুল নদী পার হয়ে আমরা শহরের একপ্রান্তে চলে এলাম। রাস্তাটা খারাপ হয়ে গেল। কিছুটা গিয়ে দেখলাম, একটা ভাঙা দেওয়ালওয়ালা ফাটক। বাইরে অজস্র সাইকেলের ভিড় আর আট-দশটা গাড়ি। এত লোক কি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?

ভেতরে ঢুকে দেখি মাঠের এককোনা লোকে লোকারণ্য, তার মাঝখানে মুরগি লড়াই চলছে। চারদিকে দু-তিনশো আফগানি চিৎকার চেঁচামেচি করে মুরগির ওপরে বাজি লাগাচ্ছে। চার-পাঁচটা লোক, বিশ হাজার আফগানি-টাকা আগাম জমা দিয়ে রাখছে। বিজয়ী মুরগির দল ডবল টাকা পাবে। ভিড়ের মধ্যে বেশ কিছু বিদেশি বসেছিল (আমরা ছাড়া)। তারা সব ঝপাঝপ ছবি তুলছে। এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে নতুন নয় অবশ্য। তাই অন্য বিদেশিদের মতো, আমরা ভারতীয়রা তেমন উত্তেজনার কিছু পাইনি। তবে ভারতীয় মুরগির তুলনায় এসব মুরগি আকারে প্রায় ডবল, আর পায়ে কোনও ছুরি বা কাঁটা বাঁধা নেই। মুখের চোঁচ দিয়ে অন্য মুরগিকে আহত করতে হবে। যাকে বলে খালি হাতে যুদ্ধ। এদেরই বলে "পাঠান মুরগি।" লড়াইয়ের মাঝে মাঝে কয়েক মিনিটের বিরতি, সেই সময় মুরগিদের ট্রেনার তাদের চাঙ্গা করে তুলছে। বিশাল বড় কালো পাগড়িপরা ঢলঢলে সালোয়ারওয়ালা ছ' ফুট লম্বাচওড়া

আফগানি ট্রেনার মুরগিগুলোকে কোলে বসিয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে জিভ দিয়ে, থুতু দিয়ে তাদের ক্ষতবিক্ষত জায়গা ভিজিয়ে আবার লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত করছে। ভিড়ের চিৎকার বাড়াতে আবার লড়াই শুরু হল।

আমরা এগিয়ে গেলাম। বিরাট বড় এলাকায় ধাপে ধাপে সিঁড়ি, তার দু'পাশে কিছু শুকনো ভাঙা ফোয়ারা। এককালে বেশ ভাল বাগান ছিল বোঝা যায়। পুরো জায়গাটা শালিমার নিশাত বাগের কায়দায় তৈরি। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাগানের এক কোনায় গেলাম। একধারে একটা মসজিদ জাতীয় বাড়ি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। তার পাশে খাপরাচালে ঢাকা একটা চৌকো বারান্দা মতো এলাকা। মোটামুটি দশ ফুট বাই দশ ফুট। এইখানে আমাদের সম্রাটের সঙ্গে দেখা হল।

খাপরাচালের তলায় শুয়ে আছেন মোগল সম্রাট জাহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর। দু'পাশে পরিবারের দু'জনের কবর, সম্ভবত বাবরের দুই রানি। বাবর মারা গেছিলেন দিল্লিতে, তাঁকে সেখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল। পরে তাঁর এক রানির কথামতো সেখান থেকে খুঁড়ে তাঁকে কাবুলে এনে এখানে সমাধিস্থ করা হল। বাবর যদিও সমরকান্দের লোক ছিলেন কিন্তু তিনি কোনওদিনও সমরকান্দ জিততে পারেননি। কাবুল ছিল তাঁর প্রথম রাজত্ব এবং সেখান থেকে ভারতবর্ষ।

সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে আমাদের মোটেই ভাল লাগল না। এককালে কী ছিল জানি না, তবে এখনকার এই বিধ্বস্ত অবস্থা আর অবহেলা দেখে মেজাজ ভাল থাকার কথা নয়। আশেপাশে কোনও সাইনবোর্ড বা নোটিশ কিছুই নেই। নাজিবুল্লার সময়ে এটা পিকনিক স্পট ছিল। দূরে একটা ভাঙা রেস্তোরাঁ আর সুইমিং পুল দেখতে পেলাম। পরে অবশ্য এইসব এলাকায় মাইন লাগানো হয়েছিল। সেগুলো আজ নেই বলেই আজ আসা গেছে।

বাগ-এ-বাবর নামে ধূলিধূসরিত, ভাঙা, অযত্নের জায়গায় মোগল সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

কাবুল শহরের একপাশে পাহাড়ের ওপরে একটা চৌকো বাক্সর মতো ব্যাপার— তাতে গোল গম্বুজ বসানো। আমরা কাঁচা রাস্তা দিয়ে সেই পাহাড়ে গেলাম। চৌকো বাক্সটা একটা চাতালে বসানো। তার সামনে একটা ভাঙা তোরণ। বাক্স দিয়ে ঢুকে ভেতরে চারখানা দেওয়াল—ওপরটায় গোল গম্বুজের ছাত। এটাই হচ্ছে আফগানিস্তানের এককালের রাজা নাদির শাহের সমাধি। এই

নাদির শাহ পারস্য দেশের কুখ্যাত নাদির শাহ নন। ইনি উনিশশো উনত্রিশ থেকে উনিশশো তেত্রিশ অবধি রাজত্ব করে মারা যান। এঁরই ছেলে জাহির শাহ ছিলেন আফগানিস্তানের শেষ রাজা। জাহির শাহকে তার এক দূর সম্পর্কের ভাই দাউদ খান উনিশশো পঁচাত্তর সালে কাবুল থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং তার কিছুকাল পরেই আফগানিস্তানে শুরু হয় রুশি আক্রমণ— তারপর তেইশ বছরের যুদ্ধ।

নাদির শাহের কবরের অবস্থা বেশ খারাপ। একপাশের দেওয়াল বোমা লেগে ফেটে গেছে। গম্বুজে অজস্র গুলি ও গোলার ফুটো। দেওয়ালগুলো কালো ও সাদা মার্বেলের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি হলেও তাতে অসংখ্য লোক তাদের নাম-ধাম-ঠিকানা-চিঠি লিখে রেখেছে। অনেকটা আমাদের দেশের মতো। একটা চিঠি বেশ দুঃখের। কে একজন লোক পাকিস্তান থেকে এসে রাজার কবর দেখতে চাইছিল, তাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। সেই কাহিনী সে দুঃখের সঙ্গে দেওয়ালে লিখে গেছে। নাদির শাহের কবরের সামনে একরাশ ছোট ছোট কবর। তাতে কোনও নাম ঠিকানা নেই। পরে জানলাম ওগুলো হচ্ছে দাউদ খান, তার পরিবার আর তার মন্ত্রীমণ্ডলীর কবর। এদের নাকি রুশিরা আসার পরে নিষ্করুণভাবে মেরে দেওয়া হয়েছিল। পাছে বেশি জানাজানি হয় তাই পাহাড়ি টিলার ওপরে এই তুচ্ছ জায়গায় কবর দেওয়া হয়েছিল। অথচ এই দাউদ খান নাকি বছর পাঁচেক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং আফগানিস্তানের কিছু উন্নতিরও চেষ্টা করেছিলেন।

একটা সিঁড়ি দিয়ে মাটির তলায় ঢুকে নাদির শাহের আসল কবরটা দেখলাম। আশেপাশে তার ভাই ও বউয়ের কবর। পুরো জায়গাটায় ধুলোবালি পড়ে নোংরা হয়ে আছে। দূরে একটা খালি জায়গা ছিল, সেটা দেখে ডা. বালা ফিসফিস করে বলল, "ওইখানে বোধহয় নাদির শাহের ছেলে জাহির শাহের জন্যে জায়গা রাখা রয়েছে।"

আফগানিস্তানের রাজপরিবারের কবরগুলোর অবস্থা বেশ শোচনীয়। অথচ এই দেশে কত ইতিহাস মাটি চাপা পড়ে আছে। পশ্চিম দেশ থেকে ভারতবর্ষে আসার জন্যে এটাই ছিল প্রধান দরজা। সেসব কথা মনে হয় এখানকার লোকেরা জানে না, হয়তো জানবেও না কোনওদিন। চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে সিকন্দর-এ-আকবরের সমাধি বা গোলাগুলিতে ক্ষতবিক্ষত রাজঘাট। ভাবতেও পারলাম না।

ভারতবর্ষে বেশ সুখেই আছি আমরা।

রিশখোর

রিশখোর যাবার প্রবল ইচ্ছে আমাদের। সেইমতো এক বিকেলে মিনিবাস চেপে যাব ঠিক করলাম। ড্রাইভার তৈরালা প্রচণ্ড আপত্তি জানাল, "ওখানে এখন যাওয়া ঠিক নয়। দুপুরের পরে ওদিকে কেউ যায় না। ওখানে অনেক লোক আছে, তাদের বন্দুক আছে, তারা সব লুট করে নেবে, তা ছাড়া ওখানে দেখবার কিছুই নেই" ইত্যাদি। তৈরালার ঘাবড়ে যাবার কারণ অবশ্য ছিল— রিশখোর— কাবুলের কাছে আল-কায়দার সবচেয়ে বড় ক্যাম্প।

আমরা বেপরোয়া। খুদা গাওয়া ব্রিজ ছাড়িয়ে কোটেসাংগি বলে এক এলাকায় এলাম। এখানে আহমেদ শাহ মাসুদ আর গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ারের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল। মাইলের পর মাইল ভাঙা রাস্তা, ভগ্নস্তূপ বাড়ি আর জনমানবহীন এলাকা। এমনকী রাস্তায় কুকুর বেড়ালও নেই। যেন কোনও ভূতের সিনেমার শুটিং চলছে।

কাবুল শহর ছাড়লাম। ছোটখাটো সব গ্রামগঞ্জের মধ্যে দিয়ে মিনিবাস এগিয়ে চলেছে। বাঁদিকে বিশাল পর্বতশ্রেণী, অনেক দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়; নানান ধরনের বিভিন্ন আকারের পাহাড় ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। দূরে ছোট একটা নদী, তার আশে পাশে সবুজ রঙের ক্ষেত। রুক্ষ পাথরের খয়েরি পাহাড়ের মাঝখানে সবুজ রংটা বেশ মনোরম লাগছে। আমাদের মিনিবাস পাহাড়ে উঠছে। অবশেষে কাঠের তৈরি একটা ফটকের নীচে দাঁড়ালাম। সেখানে কয়েকটা মিলিটারির লোক আমাদের দেখে আমরা কে কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে ভেতরে ঢুকতে দিল। তাদেরই মধ্যে একজন আমাদের গাড়িতে চেপে বিনা পয়সার গাইড হয়ে গেল। আমরা এখন আল-কায়দার ক্যাম্পে এসে গেছি।

রাস্তার দু'ধারে দেখা দিল ভাঙা ভাঙা ট্যাঙ্ক। গাইড বলল, "রুশকি, রুশকি।" এগুলো সব রাশিয়ার ট্যাঙ্ক যা ওরা মুজাহিদ্দিনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার

করেছিল বা হয়তো তারা এগুলোকে চালান করেছিল নাজিবুল্লার সরকারে। আশেপাশে কিছু ছোটখাটো ভাঙা বাড়িঘর দেখা দিল। এককালে এখানে রাশিয়ার মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট ছিল। ইদানীং এটা আল-কায়দার ক্যাম্প হয়েছিল।

একটা মস্তবড় দোতলা বাড়ি দেখিয়ে গাইড বলল, "বড়া আদমি, বড়া আদমি—লাদেন"। বুঝলাম ওই বাড়িতেই ওসামা বিন লাদেন মাঝে মাঝে এসে থাকত এবং ক্যাম্পের সৈনিকদের নিরীক্ষণ করত। যুদ্ধের সম্ভাবনা হওয়াতে সে এবং আল-কায়দার বড়সাহেবরা এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

পাহাড়ের গায়ে দেখা দিল একগাদা ছোট ছোট গর্ত। এগুলো সব আমেরিকানদের বোমার দরুন হয়েছে। দূরে একটা ভাঙা হেলিকপ্টার পড়ে আছে। পাহাড়ের মাথায় একটা লোহার জালের বাক্স। গাইড বোঝাল ওটা এককালে ছিল একটা লোহার কন্টেনার—এতে করে আমেরিকাবাসীরা মুজাহিদ্দিনদের কাছে অস্ত্র পাচার করত। বোমা পড়ে এখন লোহা গলে গিয়ে একটা জালের বাক্স হয়ে গেছে।

এসে পড়লাম আল-কায়দার সৈনিকদের ব্যারাকের সামনে। চারিদিকের পাহাড়ের ওপরে ছোট ছোট ঘর—এগুলো সব সৈনিকদের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি। গাড়ি থেকে নামবার আগে গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম, "আশাকরি এখন এখানে কোনও আল-কায়দার লোক টোক নেই, এক-আধটা? আর, মাইন নেই তো?" গাইড তার দাড়ির ভেতর থেকে হলদে দাঁতগুলো বার করে হা হা করে হাসল, "খতম। সব আল-কায়দা খতম। মাইন নি অস্ত্।"

আমাদের চারদিকে ইট ছড়ানো। দু-একটা ঘর ছাড়া সবকিছু ভেঙে চুরমার। হাওয়ায় থমথমে ভাব, একটা পাখিরও আওয়াজ নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে ডেডলি সাইলেন্স। তারই মধ্যে আমরা খচমচ করে ক্যাম্প দেখতে লাগলাম। আশেপাশের জমিতে বিরাট বড় বড় গর্ত, কয়েকটা প্রায় দশ বারো ফুট নিচু। আমেরিকান বম্বার বি ৫২-র অটুট নিশানার নমুনা। পাশে একটা ভাঙা অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট বন্দুক, আর কিছু খালি কারতুজের বাক্স। এই বন্দুক দিয়েই আল-কায়দার লোকরা আমেরিকান বম্বারকে গুলি মেরে নামাবার চেষ্টা করত। একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এদিক ওদিক হাঁটছি হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠল, "সাবধান। পা বাড়িও না।" তলায় দেখলাম পড়ে আছে কয়েকটা রকেট। সেগুলো কোনওদিন ব্যবহার হয়নি। পা দিয়ে ফিউজে ধাক্কা

লাগলে ফেটে যেতে পারে। মাটিতে পড়ে আছে অজস্র এ-কে ৪৭-এর নতুন গুলি। কাছেই একটা ভাঙা ঘর— তার মাটিতে রাখা ছিল বাক্স বাক্স গ্রেনেড, ভাঙা একটা রেডিয়ো ট্রান্সমিটার আর কিছু যন্ত্রপাতি। অন্য ঘরে আধছেঁড়া কাগজ আর খাতাপত্রের ছড়াছড়ি। সবই আরবি ভাষায় লেখা, তবে বোঝা যাচ্ছে যে সেগুলো রকেট আর মিসাইল ছোঁড়ার সম্বন্ধে নির্দেশ। কীভাবে কোনাকুনি মারলে কতটা আঘাত করবে, বন্দুক ধরা, বন্দুক ছোঁড়ার নানারকম কায়দা, কীভাবে হাতে তৈরি বোমা হয় ইত্যাদির হদিশ। এইসব শিখেই এরা সব নানা দেশে গিয়ে আতঙ্ক ছড়াবার কাজ করে। খুব গুছিয়ে, পরিপাটি করে যে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

মাটিতে পড়েছিল একটা ছেঁড়া, জ্বলে যাওয়া মাপের ফিতে, আর তার পাশে একটা অ্যাপ্রন। গাইড বলল ওটা নাকি এখানকার ডাক্তারের পোশাক। তার মানে আল-কায়দার ক্যাম্পে ডাক্তারও ছিল। সে হয়তো বোমা পড়ায় মারা গেছে।

আমরা অতি সন্তর্পণে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ছবি তুললাম। ডা. বালা বলল, "গাইডের কথায় বেশি ভরসা কোরো না। যদি কোনও বোকাসোকা আল-কায়দার লোক বেশি চালাকি করে পালাবার আগে এদিক ওদিক মাইন লাগিয়ে দিয়ে থাকে, তা হলেই হল।" একপাশে দেখলাম কয়েকটা অক্ষত ঘর। একটাতে রাশি রাশি পেপসি ও ফ্যান্টার খালি বোতল— অথচ এই আল-কায়দা আর তালিবানের লোকেরাই কড়া নিয়ম করেছিল এসব না খাবার। ওদিকে নিজেরাই কায়দার আর আরামের জীবন যাপন করত। পাশের ঘরটা দেখে মনে হল এটা হয়তো সৈনিকদের অস্ত্রাগার। অজস্র নতুন এ-কে ৪৭, রকেট, গুলি এবং মিসাইলের বাক্স। আমরা অতি সাবধানে ঘরে ঢুকে যখন ছবি তুলছি তখন গাইড আমাদের ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি করে একটা রকেট তুলে আমাদের হাতে দিয়ে দিল। আমরা সবাই হাউমাউ চিৎকার করে উঠলাম, "ওরে বাবারে ওটাতে হাত দিয়ো না, ওটা তো জ্যান্ত রকেট, ফেটে যেতে পারে, পালাও এখান থেকে" ইত্যাদি। গাইড আমাদের লাফালাফি দেখে হেসেই কুটিপাটি। অবশেষে গাইড একটা গোল রকেটের বাক্স খুলে তার ঢাকনাটা আমায় দিয়ে বলল, "এটা আল-কায়দার তরফ থেকে উপহার। অ্যাশ-ট্রে করতে পারো।"

পায়ের কাছে দেখলাম কিছু খাম আর কার্ড। নিমন্ত্রণ কার্ডে নিমন্ত্রণকর্তার

নামের বদলে ছিল কিউবার অ্যামবাসাডরের নাম। অতিথির জায়গাটা অবশ্য খালি ছিল, তবে এতগুলো কিউবার অ্যামবাসাডরের কার্ড আল-কায়দার ক্যাম্পে কী করছে ঠিক বুঝলাম না। এদের সঙ্গে কি কোনও সাঁটঘাট ছিল? কিউবা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ে। ওরা কি আল-কায়দার লোকেদের আমেরিকায় ঢোকাতে সাহায্য করেছিল? ব্যাপারটা খুব জটিল মনে হল।

সন্ধে হয়ে আসছে দেখে আমরা ফেরার ব্যবস্থা করলাম। পেছন ফিরে দেখলাম ক্যাম্পের ভাঙা বাড়ির মধ্যে খেলা করছে ছোট ছোট ছেলেরা। গর্তের মধ্যে ঝাঁপাচ্ছে, রকেট লঞ্চার নিয়ে টানাটানি করছে। গোলাগুলি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। আশাকরি এরা জ্যান্ত গ্রেনেড নিয়ে ছোড়াছুড়ি করবে না। এরাই সব আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ। বাকি দেশের ছেলেদের মতো এদের কাছে ফানস্কুল, লিও টয় বা ম্যাটেলের প্লাস্টিকের খেলনা নেই। কিন্তু শৈশবকে তো বেঁধে রাখা যায় না। এরা তাই বড়দের খেলনা নিয়েই খেলা করছে।

আশ্চর্য ব্যাপার। আশ্চর্য দেশ।

শপিং

কাবুলের এক রাস্তায় বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগত। অনেক বিদেশিই এখানে ঘুরে বেড়াত। রাস্তাটার নাম মুর্গ ফরোসি বা চিকেন স্ট্রিট। এ রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট দোকান— তাতে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। আমি প্রথমবার এরকম এক দোকানে ঢুকে মহা উল্লাসে 'খোসামুদ্দিন, খোসামুদ্দিন' করতে করতে দোকানদারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে গেলাম। দোকানদার অবশ্য ভীষণ হকচকিয়ে গেল। কারণটা স্বাভাবিক— 'খোসামুদ্দিন' কথাটার মানে আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল এর মানে How do you do বা Good morning এই জাতীয় কিছু। কাজেই আমি খুব উত্তেজিত হয়ে তাই-ই বললাম। কথাটার মানে আসলে 'স্বাগতম'। বেচারা আফগানি যখন দেখল একজন বিদেশি তারই দোকানে ঢুকে তাকেই স্বাগতম-স্বাগতম বলছে, তখন তার ঘাবড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

সরু মতো দোকানটায় ঠাসা জিনিসপত্র। মিংকের কোট, খরগোশের চামড়ার জ্যাকেট, লিংকস-এর টুপি আর নানা ধরনের ফারকোট। সব মিলিয়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকারীদের চক্ষু চড়কগাছ করার মতো দোকান। বাক্সের মধ্যে রাখা ছিল বাঘনখ আর চিনের তৈরি টাইগার বাম। এক জায়গায় দেখলাম একটা স্নো-লেপার্ডের ছাল। ভালভাবে তৈরি করা হয়নি তখনও, পাঁজরগুলো পর্যন্ত অক্ষত ছিল। আমি আঁতকে উঠে বললাম, "একি, এ তো এনডেনজারড স্পিসিস, দোকানে এরকম রাখলে হয়তো পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। হিন্দুস্থানে রাখলে জেল হয়ে যাবে।" দোকানদার হেসে বলল, "এখানে তো মানুষ মেরে তাকে টাঙিয়ে রাখা হয়, আর আপনি বাঘের কথা বলছেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মানুষ মারে তো জানি, টাঙিয়ে আবার কোথায় রাখা হল?"

দোকানদার বলল, "এখন যে আমেরিকান দূতাবাস আছে, তার কাছে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে। তালিবানরা যখন কাবুল আক্রমণ করে, তখন আমাদের অতীতের রাষ্ট্রপতি নাজিবুল্লা পালাতে দেরি করে ফেলেন। তালিবানরা তার বাড়িতে ঢুকে তাকে মেরে ঘষটাতে ঘষটাতে নিয়ে আসে, তারপর সকলের সামনে তাকে টাঙিয়ে দেয় ওই ল্যাম্পপোস্টে। ডান হাতে গুঁজে দেয় দশ হাজার আফগানি নোট একটা, আর বাঁ হাতে একটা সিগারেট। নোটের ইঙ্গিত ভ্রষ্টাচার, আর সিগারেটের ইঙ্গিত ধর্মের অমান্যতা। ছ' ঘণ্টা ধরে ওইভাবে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি ল্যাম্পপোস্টে ঝুলে রইলেন, আর আপনি বলছেন বাঘছালের কথা।"

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমরা একটা কার্পেটের দোকানে ঢুকলাম। তাতে বিভিন্ন ধরনের উলের কার্পেট ও কিছু সিলকের কার্পেট পড়ে আছে। অত্যন্ত নিখুঁত কারুকার্য, তবে দোকানদার এক বর্গ ইঞ্চিতে ক'টা গাঁট, সে সবের খবর রাখে না। বেশির ভাগ নকশাই পারস্য ধরনের। সে সবের দাম দু'শো থেকে পাঁচশো ডলার পর্যন্ত। খুব আগ্রহের সঙ্গে কার্পেট দেখছিলাম। দোকানদার বুঝল আমরা হয়তো এক-আধটা কিনেই ফেলব। ভেতরে একটা ছোট দরজা খুলে আমাদের নিয়ে গেল দোকানের নীচে। সেখানে থাকে থাকে গোল করে গুটোনো কার্পেট। তার মধ্যে থেকে দোকানদার একটা খুলে দেখাল। দু' ফুট বাই তিন ফুট কার্পেটটা খুলতেই চোখ ঝলসে গেল। হালকা ক্রিম আর নীল বর্ডারের কার্পেটে অসম্ভব সূক্ষ্ম কাজ, একপাশ থেকে দেখলে মনে হবে যেন পুরো কার্পেটের ওপরেই একটা পাতলা কুয়াশার স্তর রয়েছে। কার্পেটটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে নীলচে রং বদলে সমুদ্র-সবুজ রং হয়ে গেল। দাম জিজ্ঞেস করতে বলল, "তোমরা হিন্দুস্থানি দোস্ত, তোমাদের জন্যে এর দাম হাজার ডলার। সাহেবদের জন্যে এর দাম আরও বেশি।" আমরা ব্যাজার মুখ করে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

মুর্গ ফরোসিতে অনেক দোকানে গয়নাগাটি আর পুরনো জিনিস পাওয়া যায়। পুরনো জিনিস বেশিরভাগই মনে হল বড় বড় বনেদি বাড়ি থেকে আনা। প্রচুর পুরনো বন্দুক, তলোয়ার, ঢাল, পোশাক আশাক, ট্যাকঘড়ি, জামাটামা, পয়সা, ফুলদানি— আরও একগাদা অ্যান্টিক ধরনের জিনিস। অনেক দোকানে রুপোর গয়নাগাটি ছিল। তার কারুকার্য ভারতবর্ষের মতো সূক্ষ্ম নয়

তবে সবগুলোতেই পাথর বসানো। এখানকার 'লাপিজ লাজুলি' পাথর খুব বিখ্যাত। এখানকার লোকে যাকে বলে 'লাজোয়ার'। উত্তরপূর্ব আফগানিস্তানে বদখ্শান ও পামির অঞ্চলের পাহাড় থেকে এইসব পাথর পাওয়া যায়। গাঢ় নীলচে রঙের এই পাথরের মধ্যে ছিটে ছিটে সোনার দানাও থাকে। বেশিরভাগ গয়নার ভেতরেই এই লাজোয়ার ব্যবহার হয়। অন্য ধরনের পাথর দিয়েও গয়না হয়— চুনি, পান্না, ম্যালাকাইট ইত্যাদি। একটা এক ইঞ্চি লম্বা পান্না দেখলাম বেশ সুন্দর দেখতে। দাম বলল হাজার ডলার। একবার ভাবলাম পয়সা টয়সা জোগাড় করে তাল ঠুকে কিনেই নিই। তবে সত্যি না নকল তা যাচাই করার উপায় নেই কোনও। ভীরু বাঙালি। কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে দোকান থেকে সুড় সুড় করে বেরিয়ে এলাম।

মুর্গ ফরোসির ফুটপাথেও অনেক টুকিটাকি জিনিস পাওয়া যায়। এক জায়গায় দেখলাম সুন্দর সুন্দর নানা আকারের ফুলদানি। নীল, সবুজ রঙের স্বচ্ছ কাচের এই ফুলদানিগুলো হেরাতের জিনিস বলে জানা যায়। এককালে এগুলো শুধু হেরাতেই তৈরি হত, আজকাল এখানেও হয়। দোকানদার বলল, এগুলো সব নাকি হাতে তৈরি। আমাদের পেছনের দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে দেখি এক বুড়ো আগুনের সামনে মুখের ওপর একটা বিরাট লম্বা পাইপ লাগিয়ে বসে আছে। পাইপের ডগায় একটা জ্বলন্ত কাচের গোলা। পাইপে ফুঁ দিতেই সেটা বলের মতো ফুলে উঠল। তারপর সেটাকে একটা লোহার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আকৃতি দিল। সেই গরম কাচের ওপরে ঠান্ডা কাচের টুকরো বসিয়ে দিতেই তাতে অ্যাবস্ট্রাকট কারুকার্য হয়ে গেল। এরপর পাশে রাখা এক জলের টবে কাচটা ডোবাতেই লাল রঙের গরম কাচ ঠান্ডা হয়ে নীল বা সবুজ হয়ে গেল। বুড়োর হাতে কোনও দস্তানা নেই, সে নির্বিকারভাবে একটার পর একটা ফুলদানি তৈরি করে যাচ্ছে। দোকানি বলল, ফুলদানি তৈরির এই প্রথাটা বহু পুরনো। আর এই লোকটা হেরাতেরই কারিগর। ফুলদানির দাম বেশ সস্তা— এক একটা দু' ডলার। আত্মীয়স্বজনদের জন্যে অনেকগুলো কিনে ফেললাম।

মুর্গ ফরোসিতে বেশির ভাগ দোকানে ঢুকলে মন খারাপ হয়ে যায়। নানান ধরনের লোভনীয় জিনিস অথচ কেনার মতো পয়সা নেই। অবশ্য সাহেবরাও যে ভীষণ একটা কেনাকাটা করে তা নয়। তারাও আমাদের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে এইরকমই করে যাকে বলে Window shopping।

এ-দোকান সে-দোকান করতে করতে আমরা আর একটা কার্পেটের দোকানে ঢুকলাম। দোকানদার অনেক ধরনের উলের কার্পেট দেখাল আমাদের। কাজটা একটু মোটা ধরনের—বেশিরভাগই মাজার-এ-শরিফের তৈরি।

একটু অন্য ধরনের নকশা দেখতে চাইলে সে একটা ছ' ফুট বাই চার ফুট খুলে বসল। পাতলা নকশার বর্ডার, জমিটাতে নিখুঁতভাবে কারুকার্য করা ট্যাঙ্ক, গ্রেনেড, এ-কে ৪৭। রকেট বন্দুক ইত্যাদি। কার্পেট দেখে আমরা আঁতকে উঠলাম। এ কী, এরকমও হয় নাকি? এটা ভাল ডিজাইন?

দোকানি উত্তেজিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, খুব অস্ত্। এ ডিজাইন আজকাল খুব চলছে।" বলে আমাদের কেনাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তার মনের অবস্থা দেখে মায়া হল। যুদ্ধ, বন্দুক, গ্রেনেড এখন এদের জীবনের একটা অভিন্ন জিনিস। এগুলো ছাড়া তারা সাধারণ জীবন ভাবতেই পারে না। তাই জন্যে কারিগরের নিখুঁত নকশাতেও এইসব জিনিসের কারুকার্য ফুটে উঠছে। এরা মনে হয় সাধারণ মানুষের মতো ভাবতেও ভুলে গেছে। দোকানিকে বললাম কিছু রেশমের কার্পেট দেখাতে। সে দুটি কার্পেট দেখাল।

"ব্যাস দুটোই আছে মোটে?"

"আরও ছিল। অনেক ছিল। পরশু রাত্তিরে চোর সে সব চুরি করে নিয়ে গেছে। থিভস্, মিলিটারি থিভস্।"

"মিলিটারি থিভস্? সে আবার কি ব্যাপার?"

"হ্যাঁ, তারা সব আর্মির, নাকি পুলিশের না কীসের জানি না। জিপে করে বন্দুক নিয়ে ইউনিফর্ম পরে এসেছিল। সব লুটপাট করে নিয়ে চলে গেল। মিলিটারি থিভস্।" বলে সে করুণ মুখে আমাদের দিকে তাকাল। বুঝতে পারলাম কোনও মুজাহিদ্দিন সৈনিক বা আফগানিস্তানের নবগঠিত শাসক দলের কোনও সৈনিক বা আহমেদ শাহ মাসুদের কেউ বা কারা এই কাণ্ডটি করেছে। আফগানিস্তানের অবস্থা শুধরোতে যে অনেকদিন লাগবে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তালিবানের বদলে যারা এসেছে তারা যে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নয়, সেটা জানতে আর বাকি রইল না। —"আমন্ দূর আস্ত্!"

ক্রীড়া

আফগানিস্তানের জাতীয় ক্রীড়া হচ্ছে 'বুজকাসি'। 'বুজকাসি' মানে ছাগলটানা। এককালে এই খেলাটা মধ্য এশিয়ার সব গ্রামগঞ্জের ঘোড়সওয়াররা খেলত। খেলাটা আরম্ভ হয়েছিল উজবেকিস্তানে। আজ সেটা আফিগানিদের খুব প্রিয়।

খেলার নিয়মকানুন বিশেষ নেই। তিরিশ-পঁয়তিরিশ কেজির মরা একটা ছাগলকে দুটো দলের ঘোড়সওয়ার তুলে বা ঘষটে টেনে নিয়ে মাঠের এককোনায় একটা গোল আকারের দাগের মধ্যে ফেলবে, পেছনে ধেয়ে আসবে অন্যদলের ঘোড়সওয়ার— তীরের বেগে ছাগলটাকে ছিনিয়ে নিতে। ঝাপটাঝাপটির মধ্যে ঘোড়া উলটোনো, চাবুক মারা, ঘুষোঘুষি সবই চলতে পারে। এমনকী দুটো ঘোড়সওয়ার লড়তে লড়তে যদি পাশে-বসা দর্শকের ঘাড়ে উঠে পড়ে আর একআধটা দর্শক যদি পিষে যায় তা হলে সেটা কোনও ব্যাপার নয়— 'পরওয়া নি অস্ত্'। আমরা একদিন সেই খেলা দেখতে গেলাম। একটা স্টেডিয়ামের বাইরে দেখলাম বিরাট ভিড়। ছেলে-বুড়ো দাড়িওয়ালা পাগড়িওয়ালা সিকিউরিটি গার্ড, সবাই ঢোকবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে। আমরা বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে এক আমেরিকান কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, 'ওইদিকে যাও, চারশো মিটার হাঁটো, বাঁদিকে ঘোরো, ছ'শো মিটার হাঁটো, আবার বাঁদিকে ঘোরো— পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে একটা গেট পাবে।' তার কথামতো আমরা গিয়ে গেটটা পেলাম। পঁচিশ হাজার আফগানি ছিল টিকিটের দাম, তবে হিন্দুস্থানিরা দোস্ত— তাই সেটা মাপ হয়ে গেল। আমাদের ট্যাক্সি ভেতর অবধি চলে গেল। প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তারপর দেওয়াল টপকে আমরা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে গেলাম।

মাঝখানে একটা মাঠ, তাতে ধুলোয় ধুলো, চারদিকে গোল করে গ্যালারি তাতে লোকের দাঁড়াবার জায়গাও নেই। দূরে কিছু ফ্ল্যাটবাড়ি, তার ছাতে আর জানলায় লোক বসে আছে। মাঠের এককোনায় কুড়ি-পঁচিশটা ঘোড়সওয়ার

তাদের ঘোড়াদের জল খাওয়াচ্ছে। একটা ভাঙা লাউডস্পিকারে খ্যানখ্যানে গলায় কমেন্ট্রি চলছে। কিছু প্রেসের লোক ক্যামেরা নিয়ে এদিকওদিক ছুটছে। সব মিলিয়ে নরক গুলজার। তখন বুজকাসির হাফ-টাইম হয়েছে। কে জিতছে কার সঙ্গে কার খেলা হচ্ছে, কত স্কোর— সেসব জানবার বিশেষ চেষ্টা করলাম না। হুইসিল বেজে উঠল, বুজকাসি শুরু হল।

দূরে দেখতে পেলাম সব ঘোড়সওয়ার একটা বিরাট জটলা করে প্রচণ্ডভাবে ঠেলাঠেলি করছে, সপাসপ চাবুকও চলছে। আস্তে আস্তে একটা ধুলোর চাদর তাদের ঢেকে দিল। হঠাৎ দেখলাম ট্র্যাকসুট পরা একটা ঘোড়সওয়ার ভিড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে তীরের বেগে ঘোড়া ছোটাতে লাগল মাঠের উলটোদিকে। তার মুখে একটা চাবুক ধরা। বাঁহাতে ঘোড়ার লাগাম, আর ডানহাতে একটা বড়সড় মাপের মরা পাহাড়ি ছাগল। সেইসব নিয়ে সে মাঠের অন্যপাশে একটা খুঁটির দিকে এগোতে লাগল। খুঁটিটা পরিক্রমা করে তাকে আবার ফিরে আসতে হবে সেখানে, যেখান থেকে সে ছাগলটা তুলেছিল। অমনি তার পেছনে বাকি পনেরো-ষোলো ঘোড়সওয়ার ধাওয়া করল। মনে হচ্ছিল যেন রুশদেশের উপকথায় কোনও সৈনিকদলের গল্প দেখছি। মধ্য এশিয়ার কশাকরা এইভাবেই ঘোড়া ছুটিয়ে মারামারি করত। সেইসব রক্ত নির্ঘাত এই আফগানিদের মধ্যে বয়ে চলেছে।

একজন ঘোড়সওয়ার ছাগলটা ছিনিয়ে নিল, কিন্তু বেশিক্ষণ টানতে পারল না, ছাগলটা মাটিতে পড়ে গেল। অমনি পনেরোটা ঘোড়সওয়ার সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠেলাঠেলি মারামারি শুরু হয়ে গেল আমাদের থেকে দশফুট দূরে। বিরাট লম্বা-চওড়া দাড়িওয়ালা পাগড়ি ও ঢিলে আলখাল্লা পরা আফগানি ঘোড়সওয়াররা প্রাণ ভরে চাবুক চালাতে লাগল নিজেদের ঘোড়াকে। মাঝেমধ্যে এক-আধটা চাবুক গিয়ে পড়ল অন্যদের ঘোড়ায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম লাথি। ধুলোর ঝড় উঠে গেল তাদের চারপাশে, আর সেটা ভেদ করে তাদের হই-হই চিৎকার কানে আসতে লাগল। ভিড়ের মধ্যে দেখলাম দু'জন খেলোয়াড় দু' হাতে ছাগলটাকে নিয়ে টানাটানি করছে, আর তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরো ঘোড়সওয়ারের দল একবার বাঁদিকে যাচ্ছে আবার ডানদিকে আসছে। লড়তে লড়তে পুরো ভিড়টা— বারো-চোদ্দোজন ঘোড়সওয়ার আমাদের গ্যালারির দিকে এসে সিঁড়িতে চড়ে পড়ল। চারদিকে কোলাহল বেঁধে গেল— যে যেদিকে পারল ছুট দিল পাছে ঘোড়ার খুরে না

পড়ে। আমরাও ক্যামেরা বগলদাবা করে দিলাম দৌড়। মনে হল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে গিয়ে ইডেন গার্ডেন্স-এ পুলিশের লাঠিচার্জ হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়াগুলো মাঠে চলে গেল আর গ্যালারির আফগানিরা 'বিশি, বিশি' বলে গ্যালারির সিঁড়িতে বসে পড়ল।

খেলোয়াড়রা কিন্তু তখনও ছাগল টানাটানি চালিয়ে যাচ্ছে। একটা ঘোড়া ধাক্কাধাক্কিতে পড়েও গেল। তার সওয়ার তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে নেমে ঘোড়াটাকে চ্যাংদোলা করে দাঁড় করিয়ে আবার ঘোড়ায় চেপে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যে ঘেমে নেয়ে গেছে। একজনের মুখ থেকে রক্ত পড়ছে। সপাসপ্ চাবুকের আওয়াজের মধ্যে হঠাৎ দেখলাম একজন ঘোড়সওয়ার ছাগলটাকে ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে এল। বাকিরা অমনি তার পেছনে ঘোড়া ছোটাল। প্রথম খেলোয়াড়কে ধরার আগেই ছাগলটাকে সে গোলাকার রেখার মধ্যে ফেলে দিল— মাইকে ফার্সি ভাষায় উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার হল, আর চারদিকে হাততালি। একটা পয়েন্ট পেয়েছে, বা গোল হয়েছে, বা 'ছাগল' হয়েছে, মোটমাট একদল এগিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট বিরতির পর আবার খেলা শুরু। আবার সেই ধাক্কাধাক্কি, ধুলো, চাবুক— টগবগ টগবগ ঘোড়া আর ছাগল। প্রায় একঘণ্টা ধরে বুজকাসি চলল। শুনলাম কাবুল আর পরোয়ানের মধ্যে খেলা হচ্ছিল। তবে খেলার শেষে কে জিতল সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

আমরা ধুলোবালি মেখে ঘামতে ঘামতে বাইরে এলাম। সকলের চেহারাই একরকম মনে হচ্ছিল, যেন আমরাই ফুটবল বা ওই ধরনের কিছু খেলে ফিরছি।

"বাপরে, কী খেলা।" ডা. বালা বলল।

"খেলা মানে? ভয়ংকর! একেবারে Wild!"

নওরোজ

২১শে মার্চ। আজ আফগানিস্তানের নতুন বছর শুরু হল। 'নওরোজ'— নতুন দিন, তাই চারদিকে ছুটি-ছুটি মেজাজ— হাসপাতালও বন্ধ আছে।

কাবুল নদীর একপাশে কাবুলের ইদগাহ মসজিদ। আরও কিছুটা এগিয়ে কাবুলের বিখ্যাত ফুটবল স্টেডিয়াম। এইখানেই এককালে, তালিবানদের সময়ে লোকেদের বিচারের ফলাফল জানিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। আফগানিরা খেলাধুলো আর ফুর্তি করতে ভালবাসে। ফুটবল খেলাটা ওদের খুব প্রিয়। খেলার যখন হাফটাইম হত তখন তালিবানরা জিপ ভরতি করে এসে দর্শকদের আটকে রাখত স্টেডিয়ামে। তারপর তাদের সামনে বিচারকদের রায় শুনিয়ে লোকেদের শাস্তি দিত। এতে দুটো ফল হত— একসঙ্গে অনেকের শাস্তি দেওয়া যেতে পারত, আর একগাদা লোককে জানান দেওয়া হত, যে, আমাদের কথা মান্য করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আস্তে আস্তে অবশ্য খেলাধুলো সবই বন্ধ হয়ে গেছিল, স্টেডিয়ামটা শুধু শাস্তির জন্যেই ব্যবহার করা হত।

আজ সেই স্টেডিয়ামে আনন্দের মিছিল চলছে। তালিবানরা নেই, নতুন সরকার এসেছে, গোলাগুলি অনেক কমে গেছে। স্টেডিয়ামের বাইরে গাড়ির ভিড়, লোকে লোকারণ্য। চারদিকে পুলিশ, গেটপাস, রেডিয়ো, ভেতর থেকে ঢোল-করতালের আওয়াজ আসছে। আমরা আমাদের পুরনো কায়দায় দোস্ত, হিন্দুস্থানি বলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম, এবারে সেটা কাজ দিল না। আফগানি পুলিশ নাছোড়বান্দা, আমরা ততোধিক। শেষে তাকে পাসপোর্ট দেখিয়ে বললাম, "এই দ্যাখো আমরা দূতাবাসের লোক, তাড়াহুড়োয় অ্যাম্বাসাডারের কাছ থেকে পাস নিতে ভুলে গেছি।" পাসপোর্ট দেখে পুলিশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে আমাদের যেতে দিল কিন্তু ভেতরের বড় দরজায় ইউ এন এবং আমেরিকান পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। তারা দোস্ত, দূতাবাস, হিন্দুস্থানি—

কিছুই শুনল না। পাস না হলে কেটে পড়ো। আমরা যখন এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারছি তখন কোথা থেকে একটা লোক এসে— 'তোমরা তো ভারতীয়, তোমরা ভাল লোক— আমার সঙ্গে এসো' বলে একপাশের একটা রাস্তা দিয়ে অনেকগুলো ভাঙা অন্ধকার ঘর, বাথরুমের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল। মনে হল এটা এককালের ড্রেসিং রুম ছিল। শেষে অনেকগুলো ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় তুলে একটা বারান্দার মধ্য দিয়ে একদম স্টেডিয়ামের উঁচু স্ট্যান্ডে বসিয়ে দিল। আর দিয়েই গায়েব হয়ে গেল । সে যে কে, তা জানতেই পারলাম না।

আশেপাশের লোকেরা একটু কৌতূহলের সঙ্গে দেখল, যখন জানল ভারতীয় তখন যথারীতি বন্ধু হয়ে গেল।

বিরাট বড় ফুটবলের মাঠ, তার চারপাশে দৌড়োবার জন্যে ট্র্যাক। মাঠের মধ্যে কিছু পুলিশের ভিড়, একটা লোক নিজের মনে জিমনাস্টিক করে যাচ্ছে। ট্র্যাকের ওপর দিয়ে নানানধরনের লোকের ট্যাবলো যাচ্ছে। ডা. বালার চিৎকার, "আরে দ্যাখ, এখানেও সর্দারজি!" দেখলাম দূরে কর্তার সিং তার দলবল নিয়ে রঙিন পোশাক আর হলদে পাগড়ি পরে ঢোল বাজিয়ে ভাংরা নাচছে। তারপরে লাঙল, খুরপি, কোদাল, ডাণ্ডা নিয়ে চাষিদের মিছিল এল। আলাদা আলাদা প্রদেশ থেকে লোকেরা গাছের সবুজ ডাল নাড়তে নাড়তে চলে গেল। পাশের লোকেরা বুঝিয়ে দিল এগুলো নওরোজের সময়ে লাগালে তার থেকে গাছ হয়ে যাবে। এরপর এল তালিবান আর আহমেদ শাহ মাসুদের ট্যাবলো। পুরো স্টেডিয়ামে হাজার হাজার লোকের চিৎকার, আনন্দ, হাততালিতে আকাশ ফেটে যাবার জোগাড়। আমাদের পর্যন্ত লোম খাড়া হয়ে গেল। মাসুদের বিশাল একটা ছবির সামনে ছোট বাচ্চারা গান গেয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। ভিড়ের মধ্যে একটা আধবুড়ো লোক পাগলের মতো নাচতে নাচতে চিতপটাং হয়ে পড়ে গেল। মনে হয় তেইশ বছরের যুদ্ধে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে তার। তালিবানদের ট্যাবলোতে একটা কালো সালোয়ার পরা লোক বন্দুক নিয়ে মাটিতে পড়া একটা লোকের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তার পাশে ভাঙা বাড়িঘর আর জ্বলন্ত আগুন। ট্যাবলো যখন সামনে দিয়ে গেল তখন তালিবানের মূর্তিটা জ্বালিয়ে দেওয়া হল। চারদিকে আনন্দের উল্লাস উঠল। পাশের লোকটা বলল, "এসব দেখতে বেশ লাগছে। তোমরা অবশ্য কোনওদিনও জানবে না আমরা

কীভাবে বাস করেছি এখানে। এককালে এখানে আনন্দের আওয়াজ হলেই জেল হতে পারত।"

জানতে চাইলাম, "কী ধরনের শাস্তি হত এখানে?"

সে বলল, "ছোটখাটো ব্যাপার হলে পঞ্চাশ ঘা, একশো ঘা চাবুক, আর বড়সড় চুরি হলে হাত কেটে দেওয়া হত।"

"কিন্তু হাত কাটলে তো রক্তপাত হয়ে মরে যাবে, তাই না?"— আমার সার্জিক্যাল মাথায় প্রশ্ন।

"তা কেন? ডাক্তার থাকত, সেলাই-টেলাই করে, ব্যান্ডেজ করে তাকে বাড়ি পাঠানো হত।"

"আর খুনখারাপি করলে?"

"তা হলে তাকে গুলি করা হত। নিহত ব্যক্তির বাড়ির লোকেরা যদি চাইত তাহলে সে মাফি পেত— অবশ্য তাদের নিজেদেরও খুনিকে গুলি করার অনুমতি ছিল। মেয়েরা যদি দোষ করত বড়রকমের, তা হলে তাকে পাথর দিয়ে ছেঁচে মারা হত। এই যে আমরা দর্শক বসে আছি, তিন-চার বছর আগে এখানে ফুটবল খেলার দর্শকরা জোর জবরদস্তি এইসব শাস্তি দেখত। যে মাঠে এখন নাচ হচ্ছে সেখানে রক্ত পড়ে থাকত।"

গা ছমছম করে উঠল। ভাবতেই অসম্ভব লাগল। আশা করি এধরনের শাস্তির কাজে এই স্টেডিয়াম আর ব্যবহার হবে না।

জালালাবাদ

সকালে স্নান করে উঠে বেরিয়েছি, এমন সময় ডা. বালা বলল, "চলো জালালাবাদ যাই।"

বলি, "অ্যাঁ! জালালাবাদ? এখন? সেখানে তো ওসামা বিন লাদেন থাকতে পারে। তোরাবোরা তো নাকি সেখানেই। আচ্ছা দাঁড়াও, পনেরো মিনিট সময় দাও।"

মি. রঞ্জিত জালালাবাদ যাচ্ছিলেন। চিকিৎসাকেন্দ্র খোলবার ব্যবস্থা দেখতে। ট্যাক্সিটা খালি যাচ্ছে দেখে আমরাও উঠে পড়লাম। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ, আর ক্যামেরা। থাকবার-শোবার কোনও ব্যবস্থা নেই। তবে শুনেছি ওখানে নাকি একটা গুরুদোওয়ারা আছে।

কাবুল শহর ছাড়িয়ে আমরা এবার পূর্বদিকের পাহাড়গুলোর দিকে এগিয়ে চলেছি। খয়েরি-কালো পাথুরে পাহাড়ের মধ্যে আমাদের টয়োটা ট্যাক্সি ঢুকে পড়ল। রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কাবুল নদী। ভাঙাচোরা রাস্তাটা পাহাড়ের গা দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে নামছে। নদীটা সঙ্গত রাখবার জন্যে পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তোড়ে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের পাথরের রং বদলাচ্ছে। কখনও মাটিরং, কোথাও বা লালচে, আবার কখনও কালো, বা হলদে খয়েরি মেলানো। প্রাকৃতিক আর কৃত্রিম নানাধরনের সুড়ঙ্গ দেখা দিল রাস্তায়। বেশ দুর্গম পথ, একপাশে খাড়া পাহাড়, অন্যপাশে হাজার ফুট খাদ। সূর্যের আলো তখনও পাহাড়ের মধ্যে ঢোকেনি। আশেপাশে গাছপালা দূরস্থান, ঝোপঝাড়েরও চিহ্ন নেই। এই সেই রাস্তা যেখান দিয়ে বহুকাল ধরে ব্যবসাদার এবং আরব সৈন্যেরা ভারতবর্ষে আসত, আর এই রাস্তা দিয়েই একদিন সুভাষ চন্দ্র বসু পেশওয়ার থেকে কাবুল এসেছিলেন। ভাঙা বাসে করে, লাফাতে লাফাতে মুজতবা আলিও এই পথ দিয়ে গিয়েছিলেন।

মাহিপার বলে এক জায়গায় সকালের জলখাবার খাওয়া হল। খাবারটা অবশ্য 'ব্রাঞ্চ' হয়ে গেল। বুখারির পাশে লাল প্লাস্টিকের দস্তরখান— সেখানে বসে আফগানি পোলাও 'কাবুলি', তিনফুট লম্বা নান, মাংসের ঝোল, কাবাব আর স্যালাড। মুহূর্তের মধ্যে খাওয়া শেষ করে মাহিপারের শুকিয়ে-যাওয়া হাইডেল প্রজেক্টের পাশ দিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। কিছু পরেই জমিটা সমতল হয়ে গেল। কাবুল নদী এখন আর নালার মতো নয়, বেশ চওড়া হয়েছে। একেবারে পাটনার গঙ্গা নয়, তবে বেশ একটা নদী-নদী ভাব, দেখলে ভক্তি হয়। পাথুরে পাহাড়গুলো দূরে সরে গেল, রাস্তাটা চওড়া হল বটে কিন্তু সেটা আর রাস্তা রইল না, খালি মাটি আর পাথরের একটা চওড়া রেখা। রাস্তার ধারে ফুলকপির খেত, আর দূরে গমের চাষ, ছোটছোট গ্রাম দেখা দিল। ধুলোর মধ্যে দিয়ে লাফাতে লাফাতে আমরা দেখলাম লাইন করে কুড়ি-পঁচিশটা পুরনো বেডফোর্ড আর লেল্যান্ড ট্রাক আসছে— বিকট রং— সবুজ, নীল আর হলদে। কারুর মাডগার্ড ঢলঢলে, কারুর হেডলাইট ভাঙা, তবে গায়ে বাহারে ময়ূর, বাঘ, জঙ্গল, পাখি, ঘোড়া— এইসবের ছবি আঁকা, তা ছাড়া নানাধরনের ডিজাইন আছেই। অনেকটা মুজতবা আলির নড়বড়ে বাসটার মতো। এই ট্রাকে করে পেশওয়ার থেকে কাবুল জিনিসপত্র আসছে। ট্রাকে আছে দেশলাই থেকে শুরু করে চাল ডাল কাপড় জামা কলকব্জা মেশিন ইত্যাদি। এই রাস্তাটাই হল কাবুলের প্রাণ।

কাবুল নদীর ওপরে অনেক জায়গায় হাইডেল বিদ্যুৎকেন্দ্র। কয়েকটা ভাঙা, আর কয়েকটা তার চুরি হয়ে যাওয়াতে অকেজো। রাস্তার দৃশ্য ভয়ানক নীরস। দূরে ছিটেফোঁটা গাছপালা, রাস্তার ধারে ঝোপঝাড় আর চারদিকে বালি পাথর। মাঝে মাঝে এক আধটা বিশাল উঁচু দেওয়ালওয়ালা গ্রামের বাড়ি। বাড়ির সামনে হয়তো একটা খরমুজের লতা। সেখানে মাঝবয়েসি একটা লোক কাজ করছে, আর তার চার-পাঁচটা ছেলে গাধার পিঠে চেপে এখান-ওখান ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরে দূরে উঁচু-নিচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ঘাসের কোনও চিহ্ন নেই, আবহাওয়া বেশ গরম। রাস্তার ধারে মাঝখানে এক-আধটা চা-খানা বা সরাইখানা। কোনও গাছের ছায়া নেই, রাস্তার ধারে পান দোকান নেই, এস টি ডি বুথ বা পুলিশের চৌকি নেই। অনেক দূরে একটা স্কুল জাতীয় কিছু দেখতে পেলাম। রাস্তায় কখনওই কোনও মহিলার দর্শন পেলাম না। সব মিলিয়ে যেন একটা অন্য গ্রহের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছি।

এমনি চলতে চলতেই দূরে অনেকগুলো লোকের ভিড়। সেখানে লাল-নীল জামা, টুপি পরা মেয়েরা আর বাচ্চারা নাচগান করছে। ছেলে, বুড়ো, বয়স্করা সবাই হইচই করছে। পাশে কয়েকটা গোরুর গাড়ি রয়েছে। ড্রাইভার বলল, 'এরা সব কোচি।' কোচি মানে যারা কোচে থাকে। অর্থাৎ গোরুর গাড়ির বাক্সটায়। আমাদের ভাষায় এরা হচ্ছে বেদে। ঘরবাড়ি নেই, গোরুটানা কোচে কোচে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। আজ এদের আনন্দের দিন— আজ এদের বাড়ির কারুর বিয়ে হচ্ছে।

এরপর রাস্তাটা ভাল হয়ে গেল। সবুজ ক্ষেতের সংখ্যা বেড়ে গেল, আশেপাশে জলের খাল দেখা গেল। খেজুরগাছ আর নানান বড় বড় গাছ দেখা দিল। রাস্তায় দেখলাম আমাদের চিরপরিচিত অটোরিক্শা। তবে আকারে বেশ বড় আর রংচঙে। ড্রাইভার বলল, 'জালালাবাদ আসছে।'

জালালাবাদ বেশ ঘিঞ্জি শহর। ভিড়ভাড়, বাজারহাট, টেম্পো-ট্রাক-ঠ্যালা, নালি-নর্দমা— সব মিলিয়ে উত্তর ভারতের কোনও এক ছোট শহরের মতো। এখানকার লোকেদেরও মাথায় পাগড়ি খুব কম। আশেপাশে বাগানে নিম, পেঁপে, আম, খেজুরের গাছ। বাজারের একটা রাস্তায় লাইন বরাবর দাড়িওয়ালা পাগড়ি পরা লোকেদের দোকান, আমাদের চোখে অভ্যস্ত সর্দারজি। এখানকার বড় সর্দারের নাম সন্তোখ সিং। সে আমাদের নিয়ে গেল জালালাবাদের দরগাতে। বেচারামতন একজন লোক, মুখে দাড়ি, মাথায় ফেজটুপি পরে আমাদের দরগা দেখতে নিয়ে গেল। ইটের ছোট বাড়ি। ভেতরে চাতাল, দূরে কয়েকটা ঘর। জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কার দরগা?"

সে বলল, "এটা মথুরাদাস নামের এক সাধুর দরগা। তিনি এখানে দু'-তিনশো বছর আগে এসেছিলেন।"

"মথুরাদাস?... সে কি হিন্দু? আর তুমি?"

"আমার নাম অমরদাস। আমিও হিন্দু। মথুরাদাসের পরিবারের একজন। এই আমার ছেলে শিবকুমার। আসলে, এখানে বাঁচবার জন্যে এইরকম বেশ পরে থাকতেই হয়।"

"তোমরা এখানে কতদিন আছ?"

"আমার দাদুর দাদু এখানে এসেছিলেন। অবশ্য দাদুও ঠিকমতো জানেন না কে কবে এসেছিল। আগে এখানে প্রায় দশহাজার ভারতীয় ছিল। তালিবানরা

আসার পরে সেটা কমে এখন নব্বইটা শিখ পরিবার এবং দশটা হিন্দু পরিবারে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই শুধু এটাই জানি যে আমরা ভারতীয়। হিন্দুস্থান যেতে ইচ্ছে তো করে, তবে ওখানে গিয়ে কোথায় থাকব? কী কাজই বা করব, কী খাব? তার চেয়ে বরং এখানেই পড়ে থাকি।"

"তোমরা এখানে নিশ্চিন্ত?"

"পুরোপুরি নয়। তালিবানরা থাকাকালীন বেশ অসুবিধে হত। ওরা আমাদের হলদে পাগড়ি বাঁধতে বলেছিল আর কপালে লাল টিপ পরতে বলত। আমরা অবশ্য সেসব করিনি। তালিবানদের আগেও যে অবস্থা ভাল ছিল তা নয়। রাস্তায় একলা এদিকওদিক বেরলে অসুবিধে হত। বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে এখানে অনেক মুজাহিদ্দিন ঢুকে মন্দিরের মূর্তি আর শিবলিঙ্গ ভেঙে দেয়। একটা পুজোর ঘর তৈরি হচ্ছিল, সেটাও ভেঙে দিয়েছিল। তারপরে পয়সা জোগাড় করে সেটাকে আর বানানো হয়নি।"

দরগার ভেতরে মথুরাদাসের সমাধি, তার সামনে ঠাকুর দেবতাদের ছবি। একপাশে ছোট শিবলিঙ্গ। শিবকুমার আমাদের কমলালেবু দিল প্রসাদ হিসেবে। এরা হয়তো নকুলদানা বা বাতাসা কখনও দেখেইনি। হিন্দুদের দেবালয়কে যে মন্দির বলে তাও হয়তো জানে না। এই দরগার মধ্যেই কয়েকটা ঘরে এরা থাকে, খায় আর এখান-সেখান থেকে লেখাপড়া করে। ছোটখাটো কয়েকটা দোকান আছে। দরগা থেকে যখন আমরা বেরিয়ে আসছি তখন দেখলাম অমরদাস আর শিবকুমার করুণ মুখ করে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে।

অমরদাসের চেহারাটা অনেকক্ষণ ধরে চোখে ভাসতে লাগল। এঁর চেয়ে বড় পূজারী বোধহয় খুব কমই আছে। পুঁথিগতভাবে হয়তো ইনি ধর্মের কিছুই জানেন না, কিন্তু শুধুমাত্রই এই দরগাটিকে আঁকড়ে ধরে পুরো নিষ্ঠার সঙ্গে, এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ঠাকুরের সেবা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষে বসে ধর্ম সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেওয়া বা গেরুয়া কাপড় পরে দলে দলে জুলুস বার করা খুব সহজ। তাদের মধ্যে একজনও কি অমরদাসের এই কাজটা সামলাতে পারবে? মনে হয় না।

জালালাবাদ নিংরাহার প্রদেশের রাজধানী। পাকিস্তানের সীমানা এখান থেকে ঘণ্টাখানেক দূরে। সন্তোখ সিং বলল, "এখানে কে যে পাকিস্তানি আর কে আফগানি তা বলা শক্ত। প্রচুর আই এস আই-এর লোক থাকে এখানে।

সাধারণ লোকেরা পাকিস্তানের কারসাজি বুঝে গেছে, তাই ওদের ওপর ঘেন্না জন্মেছে। অবশ্য এখানে পাকিস্তানের টাকা ভালভাবে চলে। জালালাবাদে পেশওয়ার থেকে বেশি পাকিস্তানি টাকা আছে, আর পেশওয়ারে জালালাবাদের থেকে বেশি আফগানি আছে। কাজেই ওদের ঘেন্না করলেও পাকিস্তানিদের ছাড়া এখানকার লোকদের উপায় নেই।"

কাবুল নদীর ধারে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের পেছনে সূর্যাস্ত দেখলাম আমরা। দূরে লালচে আকাশে কয়েকটা বি ৫২ বম্বার দেখা গেল। সন্তোখ সিং বলল, "ওইদিকেই তোরাবোরা। শুধু পাহাড় আর পাথরের গুহা। ওইখানে বিন লাদেন লুকিয়ে আছে। প্লেনগুলো বোধহয় ওকেই খুঁজছে। এখান থেকে ঘণ্টা তিনেকের পথ। তোমরা যাবে নাকি?"

আমাদের মুখের দিকে দেখে বলল, "না। থাক। রাস্তাটা বেশ খারাপ।"

রাত হয়ে গেল। আমরা গুরুদ্বারায় রুটি, ডাল, সব্জি, ভাত, স্যালাড, সফট্ ড্রিংক খেয়ে খাটের ওপর বসে বগলে বালিশ গুঁজে গ্যাঁজাতে শুরু করলাম। সন্তোখ সিং বলল, "এখানকার লোকেরা মুজাহিদ্দিন সৈনিকদের অত্যাচারে বেশ বিরক্ত হয়ে গেছল। তারা সব লোকেদের লুট করত। দোকানদারদের কাছ থেকে পয়সা নিত, যাকে-তাকে তুলে নিত, চরম অরাজকতা ছিল। পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে তালিবানরা যখন জালালাবাদে ঢুকল তখন সাধারণ লোকেরা তাদের আফগানি ও পাকিস্তানি টাকা দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল। রাস্তায় আফগানির বৃষ্টি হয়েছিল। তালিবানরা আসামাত্রই মুজাহিদ্দিনদের ওপরে ওদের নিজস্ব শত্রুতার আক্রোশ দেখিয়েছিল। বহু সৈনিক মারা গিয়েছিল। পরে অবশ্য তালিবানরা মুজাহিদ্দিনদের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে গিয়েছিল।"

"তা হলে তালিবানদের প্রতি এত আক্রোশ কেন?"

"ওরা সব ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করত। ধর্মের নাম নিয়ে বিশেষ করে। জোরজার করে লোকেদের দোকানপাট বাজারহাট থেকে টেনে এনে নমাজ পড়াত। জোরজবরদস্তিটা, আফগানিরা একদম পছন্দ করে না কারণ এরা শুরু থেকেই ভয়ংকর স্বাধীন প্রকৃতির লোক, যেজন্যে এদের জীবনযাপনে শৃঙ্খলা নেই। এরা নিজে থেকেই হয়তো নমাজ পড়ত, কিন্তু জোরজার করায় সব গেল বিগড়ে। তালিবানদের মতটাই ছিল একমাত্র, অন্যদের মতের কোনওই দাম ছিল না। দুনিয়াতে কী হচ্ছে তাতে ওদের কিছুই এসে যেত না।

আফগানিস্তানকে ওরা একঘরে করে দিয়েছিল। মেয়েদের ব্যাপারে বলত, জনানির জায়গা হচ্ছে হয় কামরার ভেতরে, নয়তো কবরের মধ্যে।"

"আল-কায়দার সঙ্গে তালিবানদের কী সম্পর্ক ছিল?"

"আল-কায়দার লোকদের তালিবানরা খুব ভয় পেত। বেশির ভাগ লোকেরাই আফগানিস্তানের বাইরের ছিল। হয় আরব, বা চেচনিয়া বা সুদান বা ফিলিস্তিনের লোক। ওরা সব ছ'ফুট লম্বা চওড়া জোয়ান, পাঠানদের থেকেও ভয়ংকর দেখতে। ওদের হাতেই দেশের চাবিকাঠি, তবে ওরা সাধারণ ছোটখাটো ব্যাপারে নাক গলাত না। অবশ্য ওদের বর্বরতার তুলনায় তালিবানরা শিশু।"

কথাগুলো শুনে মনে হল সত্তর বছর আগেকার জার্মানির কথা। আল-কায়দারা ছিল এস. এস.-দের মতো আর তালিবানরা জার্মান সেনার মতো। তফাতটা বিন লাদেন আর হিটলারের রাজত্ব করার কায়দায়। হিটলার জার্মানির প্রধান ছিল, আর বিন লাদেন আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ত।

"আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণার পর এখানে গণ্ডগোল হয়নি?"

"প্রচুর। কাতারে কাতারে পাকিস্তানিরা এই অঞ্চলে এসেছিল। বাচ্চা, বুড়ো, জোয়ান যে যা পেরেছে অস্ত্র নিয়ে এখানকার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। কারুর হাতে ছিল বাপদাদার আমলের বন্দুক, কেউ বা এনেছিল তলোয়ার। ছোরা, কাট্টা বা লাঠি। দিনরাত তারা সব আল্লাহো আকবর চিৎকার করে ঘুরে বেড়াত। তারপর যেই একদিন আমেরিকার একটা বোমা জালালাবাদের কাছে এসে পড়ল, তারা সবাই দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল।" বলে সন্তোখ সিং হা হা হি হি করে হেসেই কুটিপাটি। "কে যে কোনদিকে গেল বোঝাই গেল না। আমরাও সেই ফাঁকে তালিবানের চার-পাঁচটা লোককে ধরে পিটিয়ে দিলাম। এই যে বসে আছে দয়াল সিং, এ একবার আল-কায়দার লোকের কাছে গ্রেপ্তার হয়েছিল। আমেরিকার বোমা ফেলার পরে সবাই যখন এদিক-সেদিক পালাচ্ছে, আমরা সবাই গিয়ে সেই আল কায়দার লোকটাকে পিটিয়েছিলাম।"

রসালো গল্প। রাত বারোটা বেজে গেল। চারদিকে নিঝুম অন্ধকার, দূরে কোথাও গুলির আওয়াজ শোনা গেল। তার পরে অনেকক্ষণ ধরে কটাস কটাস করে দু'পক্ষ থেকেই যুদ্ধ। ঘুম পাড়ানি গানের মতো সেসব শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম মনে নেই।

"কাল রাত্তিরে তালিবান আর আল-কায়দার লোকেদের সঙ্গে আফগানি সৈনিকদের লড়াই হয়েছে। এক-আধটা মরেছে মনে হয়। বাকিরা সব পালিয়েছে।" সকাল সকাল সন্তোখ সিং-এর সংবাদ।

"তোমরা যদি আজ ফেরত যাবার কথা ভাবো, তা হলে বারোটার মধ্যে বেরিয়ে যেয়ো যাতে সন্ধের আগে কাবুল পৌঁছোতে পারো।"

সাতটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে এল সন্তোখ সিং। নিংরাহার বিশ্ববিদ্যালয় আর জালালাবাদের ঘায়েল এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে আমরা এবার পূর্বদিকে রওনা দিলাম। দু'ধারে দেখা গেল সবুজ ক্ষেত, তাতে গম, কপি, মুলো ইত্যাদির চাষ হচ্ছে। মাঝে মাঝে আম ও বেদানার গাছও দেখলাম। বেশ মনোরম দৃশ্য— অনেকটা আমাদের দেশের মতো কিন্তু এই সৌন্দর্যের আড়ালে অন্য গল্প আছে। সন্তোখ সিং-এর কথায় জানা গেল। এইসব ক্ষেত ও গাছগাছালির পেছনে আফিমের চাষ। সে বোঝাল আমাদের কীভাবে আফিম গাছের ফুলের গা থেকে রস বার করে শুকিয়ে আফিমের বড়ি তৈরি হয়। বলল, "তালিবানরা আফিম, চরস, গাঁজা সবকিছুরই চাষ করত। আফগানিস্তানে এসব খেতে দিত না কারুকে। সবকিছু চালান করত বিদেশে— তোজিকিস্তান আর উজবেকিস্তানের সীমানা পার করে। পাকিস্তান হয়ে করাচি দিয়েও এসব চালান হত। সারা পৃথিবীর ড্রাগস-এর আড়ত ছিল এইসব এলাকা, আর এইসব থেকেই তালিবানদের কাছে পয়সা আসত।"

একপাশে দেখলাম অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রায় হাজার খানেক তাঁবু। নোংরা ছেঁড়া কাপড়, বস্তা, প্লাস্টিক, কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি এসব তাঁবুতে যুদ্ধের রিফিউজিরা বাস করছে। এদের বাড়িঘর গৃহযুদ্ধে ভেঙে গেছে— ক্ষেতে তালিবানরা মাইন লাগিয়ে দিয়েছে, কুয়োতে বিষ ঢেলে দিয়েছে আর আঙুরের ঘন লতাগুলোকে তলা থেকে কেটে দিয়েছে। এরা অনেকেই পাকিস্তানে পালিয়ে গেছল, এখন সেখান থেকে ফিরে আসছে। এর পরে এরা কোথায় যাবে, কী করবে, কাল কী খাবে কিছুই জানা নেই। সেই তাবুর মেলার মধ্যে দেখলাম দু'-একটা রেডক্রসের পতাকা, আর এক-আধটা ইউনাইটেড নেশনস-এর নীল পতাকা।

আশেপাশের ক্ষেত শেষ হয়ে গেল, দু'দিকে দেখা দিল বালি আর পাথরের ছোটবড় পাহাড়। আমাদের গাড়ি তিরের বেগে এগোতে লাগল। যাচ্ছি তোরখাম— আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের সীমানা। এই সেই রাস্তা

যেখান থেকে লক্ষ লক্ষ আরব সৈনিক, মহম্মদ ঘোরি, মামুদ গজনি, বাবর, নাদির শাহ, আহমেদ শাহ আবদালি— সবাই ঘোড়ায় চড়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে থেকে আমি যেন ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটু পরেই খাইবার গিরিখাত আসবে, তারপরেই ঘোড়া ছুটিয়ে তারা নীচের দিকে গান্ধার উপত্যকায় ঢুকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে।

গাড়িটা গতি রোধ করতেই কল্পনা থমকে গেল। তোরখাম ছোট জায়গা। চারদিকে গাড়ি, বাস, আর অজস্র আফগানি— ছেলে বুড়ো মহিলা বাচ্চার ছড়াছড়ি। প্রত্যেকেই ছোটখাট জিনিসপত্র নিয়ে এদিকওদিক ঘোরাঘুরি করছে। আমরা চেক পোস্টে গাড়ি থেকে নামলাম। রাস্তার মাঝখানে একটা লোহার দরজা, তাতে সবুজ রঙের বিশাল বোর্ডে লেখা রয়েছে—

'Welcome to Pakistan. Keep to the left.'

পিলপিল করে আফগানির ভিড় ঢুকে আসছে দরজা দিয়ে, তাদের সামলাচ্ছে কালো সালোয়ার পরা দু'জন আফগানি রেঞ্জার। এরা হচ্ছে আমাদের দেশের বি এস এফ-এর সমতুল্য। আজও নাকি প্রায় কুড়ি লক্ষ আফগানি যুদ্ধের ভয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে বসে আছে। এরা সব অবস্থা বুঝে আস্তে আস্তে দেশে ফেরা আরম্ভ করেছে। বেশির ভাগই সর্বস্বান্ত। সব হারিয়ে শূন্য থেকে আবার জীবন শুরু করবে।

আমরা যখন এদিক-সেদিক দেখছি তখন দু'জন বন্দুকধারী আফগানি আমাদের পাকড়াও করল। "তোমরা কে? এখানে কেন এসেছ?" "আমরা কাবুল থেকে আসছি। জালালাবাদ এসেছিলাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে। এসব জায়গায় দেখছি যদি এখানে কোনও মেডিকেল ক্যাম্প করা যায়।"

"তোমরা তো ভারতীয়? পাকিস্তান সীমানার এত কাছে, এটা কি ক্যাম্প করার জায়গা নাকি বেড়াবার জায়গা? তোমরা এসো আমাদের সঙ্গে।" বলে আমাদের সবাইকে ধরে তাদের বড়সায়েবের কাছে নিয়ে গেল। বড়সায়েব নানাধরনের প্রশ্নটশ্ন করে শেষে বলল, "আমরা আফগানি কাস্টমস পুলিশ। তোমরা ভারতীয়, পাকিস্তানিরা তোমাদের ভাল চোখে দেখে না। তাই তোমাদের নিরাপত্তার জন্যেই এসব করা হচ্ছে। তোমরা আমাদের অতিথি, তোমাদের দেখাশুনো করা আমাদের কর্তব্য। অবশ্য এখন যদি চাও তা হলে গেট পেরিয়ে পাকিস্তানে দুটো পা ফেলে আসতে পারো। আমাদের লোক সঙ্গে যাবে।"

পাকিস্তানে দু'পা রাখার ইচ্ছা অবশ্য হল না আমাদের। অফিসারদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সীমানা ডুরান্ড লাইন ছেড়ে আমরা জালালাবাদ ফিরে গেলাম।

আমরা গেলাম নিংরাহার প্রদেশের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে। এঁর নাম হাজি আবদুল কাদির, ইনিই আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করবেন। বিরাট বড় লোহার গেটওয়ালা বাড়ি, তার সামনে ভিড়, আর একগাদা সৈনিক। ভারতীয় দূতাবাস থেকে ডাক্তার এসেছে শুনে একজন সৈনিক ভেতরে খবর দিল। তিন মিনিটের মধ্যে সে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। একতলায় জুতো খুলে আমরা দোতলায় একটা হলঘরে এসে বসলাম। কারুকার্য করা কাঠের সোফাসেট, ঝকঝকে দেওয়াল, মেঝেতে কুড়ি ফুট লম্বা উলের কার্পেট, ঘরের কোনায় একটা সোনি টিভি। ঘরে আরও দশ-বারোজন লোক বসে আছে। সবাই সালোয়ার পরা লম্বা চওড়া পাঠান। জিনস পরা রোগাপ্যাটকা ভারতীয় দেখে তাদের মধ্যে একটা অস্বস্তির আলোড়ন পড়ে গেল। নিজেদের মধ্যে কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়ে চারদিকে পিনড্রপ সাইলেন্স।

একজন আধবুড়ো ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। সবাই উঠে দাঁড়াতেই বুঝলাম ইনিই হচ্ছেন গর্ভনর হাজি আবদুল কাদির। আমাদের দেখে হাসিমুখে গল্প আরম্ভ করলেন। সময় নিয়ে মেপে মেপে কথা বলছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল বেশ ঝানু পলিটিসিয়ান। কীভাবে কোন লোকের সঙ্গে কী কথা বলতে হয় ভালভাবে জানেন। "India is like a book. The more I read about it, the more fascinated I become."

বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা হালকা হাসি হাসলেন। আমরা সবাই বিগলিত হয়ে পড়লাম। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যাপারে কথাটথা বলে পনেরো মিনিটের মধ্যে গভর্নরের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে, পেস্তা-বাদাম-কিসমিস-খেজুর আর চা খেয়ে বাইরে এলাম আমরা। মি. রঞ্জিত বললেন, "ইনি এখন জার্মানি থেকে এসেছেন। তালিবানরা যখন জালালাবাদের কাছে, তখন ইনি এককোটি ডলার নিয়ে এখান থেকে পেশওয়ার পালিয়ে যান। জালালাবাদে বিশেষ লড়াই হয়নি। এঁর কয়েকজন চ্যালাচামুণ্ডা মারা পড়েছিল। জালালাবাদ থেকেই তালিবানরা আক্রমণ করে কাবুল ও মাসুদের ওপর। এখন যুদ্ধ শেষ হওয়াতে ইনি অবস্থা বুঝে জার্মানি থেকে ফিরে এসে এখানকার গভর্নর হয়ে

পড়েছেন। ভেতরে ভেতরে তালিবানদের সঙ্গে সাঁট থাকলেও থাকতে পারে।"

জটিল ব্যাপার। আমরা গাড়িতে বসতেই ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "তোমরা আবদুল কাদিরের সঙ্গে দেখা করে এলে? তোমরা তো ভীষণ ওজনদার লোক দেখছি। ছবি তুলেছ তো?"

"কেন, ছবি তুলতে যাব কেন?"

"এ কী? তোমরা জানো না? হাজি কাদির তো কারজাই সরকারে আফগানিস্তানের উপরাষ্ট্রপতি হবেন।"

"সে কী রে? আগে বলবি তো।"

আমরা কাবুলের দিকে রওনা হলাম। আবার সেই ভাঙা রাস্তা, সেই পাহাড়।

ক্যাম্প

শুধু ঘোরা আর ঘোরা। মনে হচ্ছে যেন ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে আফগানিস্তানে এসেছি। তবে আমাদের কাজের সময়েও অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। রোজই পলিক্লিনিক যাই, সকাল থেকে বেলা তিনটে অবধি প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এক একজন ডাক্তার দু'শো-তিনশো করে রোগী দেখি। তারপর তাদের বোঝানো, ভিড় সামলানো, আর দূতাবাসে গিয়ে ওষুধপত্রের দাবি করা, সার্জারির অপারেশন থিয়েটার খোঁজা ইত্যাদি করে আমাদের রোজকার দিন ব্যস্তভাবেই কাটে। মাঝেসাঝে আমরা কয়েকজন ডাক্তার মিনিবাসে চেপে দু'-তিন বস্তা ওষুধ আর সিরাপ নিয়ে কাবুলের কোনও এক গরিব এলাকায় গিয়ে মেডিকেল ক্যাম্প খুলে বসি।

মেডিকেল ক্যাম্পের ব্যবস্থা দূতাবাস থেকে সরকারের মাধ্যমেই করা হয়। বেশির ভাগ সময়েই কোনও এক মাদ্রাসায় তিন-চারটে করে ক্যাম্প করা হয়। আগে থেকে রেডিয়োতে খবর দিয়ে, পোস্টার বিতরণ করে লোকেদের জানানো হয়। ক্যাম্পগুলো বেশ জনপ্রিয়। আশপাশের লোকেরা ভিড় করে সেখানে এসে চিকিৎসা করিয়ে ওষুধ নিয়ে যায়। অনেকেই আমাদের জন্যে মেওয়া, টফি এইসব নিয়ে আসে। সবার মুখে একটাই বুলি— হিন্দুস্থানিদের মতো লোক হয় না। এরাও এসেছে আর তালিবানরাও গেছে। এবার আমাদের সুখের জীবন ফিরে আসবে। তবে ক্যাম্পে একটাই অসুবিধে— বেলা বারোটা নাগাদ যখন বস্তাভরা ওষুধপত্র ফুরিয়ে যায়, তখুনি ক্যাম্প বন্ধ। বাকিরা ব্যাজার মুখ করে বাড়ি চলে যায় বাধ্য হয়ে।

দূতাবাস থেকে আদেশ এল— এবারে হাজারা প্রধান এলাকা— কার্তে-সে-আলাউদ্দিনের বস্তিতে ক্যাম্প লাগাতে হবে। আমাদের ড্রাইভার তৈরালা এলাকা শুনেই চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করল। "ওরা ভীষণ দুষ্টু। ওখানে কেউ ক্যাম্প করে? পুরো আফগানিস্তানের লোকেরা ওদের ঘেন্না করে।" এই

বলে সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক হাজারা মেয়ের মাথাটা মিনিবাসের পাশের আয়নাটা দিয়ে ঠুকে দিল।

বস্তিতে গিয়ে দেখলাম ক্যাম্পের কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি। একটা মৌলবীজাতীয় লোক এসে বলল, "আজ তো এখানে কোনও ব্যবস্থা নেই, বসবার জন্যে চেয়ারও নেই। তোমরা বরং কাল এসো।"

"তোমাদের দশদিন আগে খবর দেওয়া হয়েছিল, এই তোমাদের ব্যবস্থা? তোমাদের নিজেদের যদি এইরকম গরজ থাকে, তা হলে তো হয়েছে। কাল নয়। আমরা তা হলে এখানে আসবই না। আমরা চললাম।"

মৌলবী ঘাবড়ে গেল। বোসো, বোসো বলে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি আরম্ভ করল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মসজিদের মাইক দিয়ে খবর পাঠানো হল, "হিন্দুস্থানি ডাক্তাররা এসেছে— যে যেদিকে আছ রোগের ওষুধ নিতে চলে এসো।" মনে হল যেন কাঙালি ভোজন শুরু হতে চলেছে। বাইরের কয়েকটা দোকান থেকে তিন-চারটে চেয়ার উঠিয়ে মাদ্রাসার ভেতরে রাখা হল। ঘরগুলোতে নোংরা, ছেঁড়া শতরঞ্চি পেতে দেওয়া হল। ওষুধের কাউন্টার করার জন্যে ঘর পাওয়া গেল না, তাই মিনিবাসের মধ্যে তৈরালা আর একজন কম্পাউন্ডার ডিস্পেনসারি খুলে বসল। আমি ও ডা. বালা একটা ঘরে বসলাম মাঝখানে একটা টেবিল রেখে। বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে ডা. নাথ বসে পড়ল।

রোগীরা আসতে লাগল। একটি দুটি করে আরম্ভ করে আধঘণ্টার মধ্যে তারা পিলপিল করে মাদ্রাসার সামনে ঠেলাঠেলি শুরু করল। আমাদের রোগী দেখার গতি টয় ট্রেনের মতো শুরু হয়ে একেবারে জাপানি বুলেট ট্রেনের মতো হয়ে পড়ল। ভিড় সামলাবার জন্যে কোনও লোক বা সেপাইয়ের ব্যবস্থা নেই। বেশির ভাগই তেরিয়া মেজাজের বোরখা পরা হাজারা মহিলা। এ ছাড়া কিছু বুড়োবুড়ি রোগী আর এক-আধটা ছেলেছোকরা। একটা আধবুড়ো, গাছের শুকনো ডাল নিয়ে এদিকওদিক একে-তাকে তাড়িয়ে ভিড় সামলাতে চেষ্টা করছিল, হঠাৎ দেখলাম সে দড়াম করে উলটে আমাদের কোলে বসে আছে। বোরখা পরা মহিলারা তাকে মস্ত ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছে।

রোগী দেখা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ল। ভিড় এখন সম্পূর্ণ বেসামাল। মাঝেসাঝে আমার চেয়ারে দু'জন রোগী বসে পড়ে আর টেবিলে দুটো বাচ্চা শুয়ে পড়ে। আমরা, 'সবুর করো, সকলকেই দেখা হবে' বলে ব্যর্থ

চিৎকার-চেঁচামেচি চালিয়ে যাই, সেসব অবশ্য কারুর কানে যায় না। শোরগোল ক্রমশই বাড়তে থাকে।

একসময় মনে হল এবার দম বন্ধ হয়ে যাবে। চাপা ঘরের মধ্যে প্রায় দু'শোজন রোগী। আলো আসার জানলাটা বন্ধ আর দরজা ভরতি জনতা। তারই মাঝখানে ব্ল্যাক হোলের মতো প্রাণপণে রোগী দেখে চলেছি আমরা। এক আধটা রোগী বেশ অন্য ধরনের। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, 'চি তকলিফ দোরে শুমো' অর্থাৎ কী তোমার অসুবিধে, তখন সে বোরখা তুলে আমার মুখের ওপরে ঘড়ঘড়ে গলায় কেশে বুঝিয়ে দিল যে তার কাশি হয়েছে।

ভিড় এবার একেবারে জংলির মতো হয়ে পড়ল। চেঁচামেচি থেকে রাগারাগি, রাগারাগি থেকে ঝগড়াঝাঁটি আরম্ভ হল। একটা চ্যাংড়ামতো ছেলে তার ভাইকে আমাদের টেবিলে বসিয়ে বলল, "এক্ষুনি এই রোগীকে দেখতে হবে।"

"একজনকে দেখছি, একটু সবুর করো তুমি।"

"না, এক্ষুনি দেখতেই হবে।" বলে সে ছুড়ে একটা এক্স-রে প্লেট আমার মুখের ওপর ফেলল। আমাদের তারজুমানের আঁতে প্রচণ্ড লাগল, চেঁচামেচি-হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। চ্যাংড়া বলে উঠল, 'You foreigners have always destroyed our country and are continuing to do so now. Your medical camps are not at all required here'— বলে একগাদা কী সব বলতে লাগল ফার্সিতে। তারজুমান পালটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, আমি তার হাত ধরে টেনে ডা. বালাকে নিয়ে ভিড় ঠেলে ঘরের বাইরে এলাম। ডা. নাথকে এক হাঁক দিয়ে মিনিবাসের দিকে দৌড়লাম— এখানে আর নয়।

তৈরালা ব্যাপারটা আগে থেকেই আঁচ করেছিল। ওষুধ বিতরণ বন্ধ করে, মিনিবাস চালু করে বসে ছিল। "আমি তো বলেইছিলাম এসব এলাকা সাংঘাতিক, এখানে ক্যাম্প করার মানেই হয় না।" বলে সে তিরের বেগে মিনিবাস ছুটিয়ে দিল, ভিড়ের স্রোত পেছন পেছন দৌড়ল ওষুধ পাবার জন্যে। কয়েকজনকে ছুড়ে ছুড়ে ওষুধ দেওয়া হল, "তোমাদের বড়কর্তাকে বোলো ওষুধ দিতে" বলে তৈরালা মিনিবাসটা বার করল বস্তি থেকে।

রোগীদের জন্যে খারাপ লাগছিল। তবে এসব এলাকায় এমন পরিস্থিতিতে এর চেয়ে বেশি আর কিছু করা যায় না। যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, আর যখন যেমন তখন তেমন।

উত্তর আফগানিস্তান

"এবার কোথায়?" খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম মি. রঞ্জিতকে। মুচকি হেসে বললেন, "উত্তরদিকটা দেখা হয়নি। যাবে নাকি?"

আমি আর ডা. বালা তো তৎক্ষণাৎ তৈরি। উত্তরদিকের অবস্থা একটু অন্যরকম। তাই মিনিস্ট্রি অফ ইনটিরিয়ার থেকে চিঠি নিয়ে যেতে হবে। দূতাবাস থেকে চিঠিপত্র নিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম মিনিস্ট্রিতে। এক মিলিটারির লোককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঢুকলাম। সেই ফাঁকে হঠাৎ এক দাড়িওয়ালা লোক এসে নিজের পরিচয় দিল। তার নাম নাজির। সে এককালে ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করত। আমাদের যাত্রার কথা শুনে বলল, "আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।" বলেই কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

আমরা ইতিমধ্যে মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে গিয়ে দোতলার একটা ঘরে বসলাম। দূরে দেওয়ালে আহমেদ শাহ মাসুদের একটা ছবি। বড়সাহেব এলেন। তাঁকে বোঝান হল আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কেন্দ্রগুলি দেখতে চাই এবং সেখানে আরও কিছু হাসপাতাল গড়তে চাই। তিনি বিগলিত। দুটো চিঠি লিখে দিলেন, আর মেওয়া ও চা খাওয়ালেন।

নাজির হঠাৎ পেছনের দরজা দিয়ে উদয় হল। এসেই বড়সাহেবের কানে কীসব বলল। বড়সাহেব হুঁ-হাঁ করে আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন। কী ব্যাপার বোঝা গেল না, তবে নাজির যে অনেককেই চেনে আর বেশ কাজের লোক সেটা বোঝা গেল।

আমাদের সামনে আফগানিস্তানের বড় একটা ম্যাপ। তাতে সব দেশের সীমা যে চিহ্নে আঁকা রয়েছে, পাকিস্তানের সীমানায় সে চিহ্ন নেই। কারণটা নাজিরকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "পাকিস্তানের সঙ্গে ডুরান্ড লাইনের সীমানাটা আমরা মানি না। ওটা সত্তর বছর আগে কিছু পস্তুন নেতা ইংরেজদের সঙ্গে সাটগাট করে করেছিল যাতে ইংরেজরা

আফগানিস্তান আক্রমণ না করে। ওটা ছিল পঞ্চাশ বছরের জন্যে। ওটা এখন পাকা নয়।"

" তাহলে তোমাদের সীমানাটা কোথায়?"

"আমাদের পূর্বদিকের সীমানাটা সিন্ধুনদী অবধি। ওখানকার বেশির ভাগ লোকই পস্তুন বা পাঠান। এইসব এলাকা এখন পাকিস্তানের মধ্যে, বেলুচিস্তান আর ফ্রন্টিয়ার এলাকা। এগুলোকে আমরা পস্তুনিস্তান বলি। পেশাওয়ারে তাই দেখবে বেশির ভাগই পাঠানরা থাকে এবং তারাই সব ব্যবস্থাগুলো দেখে।"

"তাহলে তোমরা সেগুলো পাকিস্তানের কাছ থেকে নিয়ে নাও।"

নাজির একটু হেসে বলল, "ইনশাল্লাহ! একদিন তা হবেই। এখন তো আমাদের নিজেদের কোনও ঠিকানা নেই। বেশির ভাগ জিনিসই পাকিস্তান থেকে আসে। তবে পস্তুনিস্তান আমরা নেবই।"

আজব ব্যাপার। খাবার-শোবার জায়গা নেই, বলে কিনা দখল করবে। স্বপ্ন দেখারও কোনও সীমা নেই। নাজিরের স্বপ্নভঙ্গ করে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের সঙ্গে যাবে? উত্তর আফগানিস্তানে?"

সে এককথায় রাজি। বলল, "হ্যাঁ, ওখানে অনেককেই চিনি। সকলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।"

সকাল ছ'টায় ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আমরা টয়োটা করোলা ট্যাক্সি করে কাবুল ছাড়লাম। সঙ্গে মি. রঞ্জিত, ডা. বালা, নাজির আর ড্রাইভার মোহিবুদ্দিন। রাস্তার জন্যে কিছু নান, জ্যাম, বিস্কুট আর সেদ্ধ ডিম নেওয়া হল। ডিমটায় আমার বিশেষ রায় ছিল না— যাত্রা আবার অযাত্রা না হয়ে যায়। যাক, সে পরে দেখা যাবে।

কাবুলে তখন ভোর হব-হব করছে। চাঁচাছোলা পাহাড়ের পাশ দিয়ে, দু'ধারে মাইনফিল্ড ভেদ করে আমাদের ট্যাক্সি তিরের বেগে চলেছে। হিটারে গরম হাওয়া আর টেপে হিন্দি সিনেমার গান। ঘণ্টাখানেক যাবার পরে ডিমের অলক্ষণ দেখা দিল। গাড়িতে গণ্ডগোল। ড্রাইভার মোহিব আমাদের গাড়িতে বসিয়ে, চালু গাড়ি না থামিয়েই গাড়িটাকে জ্যাকে তুলে চাকা খুলে ফেলল। আধঘণ্টা পরে যখন আমরা নামলাম তখন দেখি সে বাঁদিকের চাকা, ব্রেক ড্রাম, অ্যাক্সেল সমস্ত খুলে রাস্তায় ছড়িয়ে বসে আছে। তার মতে চাকার

কোনও একটা পার্ট বদলাতে হবে। একটা ট্যাক্সি থামিয়ে সে উঠে পড়ল। বলল, "এটা পেছনের গ্রামে পাওয়া যাবে, এক্ষুনি আসছি।"

আমরা বোকার মতন মাইনফিল্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে লাগলাম। দশটা নাগাদ কাবুল থেকে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। তার ড্রাইভার বলল, "মোহিব এক্ষুনি আসবে। সে কাবুল থেকে গাড়ির পার্টস কিনছে।"

তাকে যে কাবুল যেতে হবে সেটা আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আধঘণ্টা পরে সে ফিরে এসে চাকাতে পার্টস লাগিয়ে গাড়ি চালু করল, গাড়ি এগোল না। মোহিব তখন আর্কিমেডিসের মতো বিরাট এক চিৎকার দিয়ে তিন ফুট লাফিয়ে উঠল, "ই খুব অস্ত্" বলে জ্যাক লাগিয়ে ডানদিকের চাকাটা খুলে বসল। এত কাণ্ড করে সে বুঝতে পেরেছে কোন চাকায় গণ্ডগোল। যাই হোক সাড়ে এগারোটা নাগাদ ডান চাকা সারিয়ে আমরা আবার রওনা দিলাম। ডিম যে অযাত্রা সেটা অক্ষরে অক্ষরে বোঝা গেল।

জাবুলসারাজ পার হয়ে আমরা সালাঙের রাস্তা ধরলাম। হিন্দুকুশ পাহাড়ের এই সালাং টানেল পেরিয়ে আমরা যাব মাজার-এ-শরিফ। সেখানে একটা হাসপাতালে ভারত সরকারের আরও কয়েকজন ডাক্তার কাজ করছে। তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে, ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতির লেনদেন আর দরকার বুঝে আমরা ফিরব। সালাং আসার রাস্তায় বরফ দেখা দিল, গাড়িতে যখন স্নো-চেন লাগান হচ্ছে তখন নাজির নেমে আমাদের দেখাবার চেষ্টা করল সে বরফ কত বোঝে। বেশিদূর যেতে হল না তাকে— শূন্যে উড়ে গিয়ে শক্ত বরফের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। রাস্তার পুরনো জমা বরফ যে কী সাংঘাতিক মসৃণ সেটা ও ধারণা করতে পারেনি।

বরফের মধ্যে জ্যাকে তুলে যখন চাকা বদলানো হচ্ছে তখন হঠাৎ গাড়িটা পেছন দিকে গড়িয়ে গেল। আমরা গাড়ি খামচে ধরে চাকা পালটে আড়াইটে নাগাদ কোনওমতে সালাং-টানেলে এলাম। ইতিমধ্যে ভাঙা টানেলের দু'পাশ থেকে গাড়ি এসে টানেলের মধ্যে জ্যাম করে বসে আছে। আমরা তাড়াতাড়ি নান, জ্যাম আর ডিমগুলো খেয়ে ফেললাম। ডিমটা পাচার হল; আশা করি আর গণ্ডগোল হবে না।

তেরো হাজার ফুটের হিন্দুকুশ পাহাড়ের মধ্যে দু'হাজার সাতশো মিটার লম্বা সালাং-টানেল ইদানীংকালে খোলা হয়েছে। ঢোকবার মুখটায় রাস্তাটা বোমা মেরে ধ্বংস করা হয়েছিল, সেটা রুশিরা সারিয়েছে। টানেলে কোনও

আলো নেই, বাতাসের জন্যে একজস্ট ফ্যানগুলো ভেঙে এদিকওদিক পড়ে আছে। ওপরের ছাত ভেঙে ভেঙে পড়ছে। গাড়ির কাচ তুলে দশ মিনিটে আমরা টানেলটা পার হলাম। হিন্দুকুশ পাহাড় শুনে যেরকম একটা ভয়াবহ মারাত্মক চেহারা কল্পনা করা হয়, সেরকম ঠিক নয়। ওপরের এলাকায় গাছপালা নেই, শুধু পাথর ও দু'তিন ফুট বরফ। অবশ্য আজকাল বরফ কম পড়ে। এমনিতে এসব জায়গায় সাত-আট ফুট বরফ থাকে। এই পাহাড়েরই একপাশে পাঞ্জশের উপত্যকা আর হিন্দুকুশের ঠিক মাঝখানে বামিয়ান উপত্যকা। উত্তরে কুন্দুজ, মাজার-এ-শরিফ আর তালুকানের মতো শহর। দক্ষিণে কাবুল, গজনি, কান্দাহার।

সালাং থেকে নামতে লাগলাম। আবার সেই লাল ত্রিকোণ আর মাইনফিল্ডের বোর্ড দেখা দিল। মোহিবের সেইখানেই চাকা থেকে স্নো-চেন খোলার ভীষণ প্রয়োজন হল। আমরা কাঁটা হয়ে গাড়ির ভেতরে বসে রইলাম। আশেপাশের ট্যাক্সিওয়ালাদের মাইনফিল্ড নিয়ে কোনও বিকার নেই। একজন ছোকরা গাড়ি থামিয়ে মাইনফিল্ডের পাথরের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। আমরা ভাবছি এই বোধহয় ফাটল—এইবার, এইবার! কিছুই হল না। লোকটা নির্বিকার চিত্তে বাথরুম-টাথরুম সেরে আবার লাফাতে লাফাতে চলে এল। অ্যালুমিনিয়ামের ছাতওয়ালা সরাইখানায় চা খেতে দাঁড়ান হল। হিন্দুকুশের মাঝখানে বরফের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে খেতে আমরা সরাইখানার বুখারি কার্পেটওয়ালা গরম ঘরে ঢুকলাম। সন্ধে তখন হব-হব করছে। লণ্ঠনের টিমটিমে আলোতে হাত পা ছড়িয়ে আফগানি চায়ের চুমুকটা মন্দ লাগল না সারাদিনের ক্লান্তির পরে। নানখাটাই গোছের বিস্কুটও পড়ল পেটে। তাজা হয়ে যখন পয়সাটয়সা দেবার পালা এল তখন ভীষণ জোরে চিৎকার চ্যাঁচামেচি আরম্ভ হয়ে গেল। দোকানদার কিছুতেই পয়সা নেবে না।— "হিন্দুস্থানি দোস্ত, মেহমানি-এ-খারিজ" ইত্যাদি বলে সে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে হাত-পা-দাড়ি নাড়ালে লাগল। তাকে অনেক বোঝানো হল— ঘোড়া যদি ঘাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাহলে অনাহারে মরবে। কিন্তু আফগানি জেদ চাট্টিখানি কথা নয়। ইংরেজ রুশ কেউই এঁদের বাগে আনতে পারেনি, আমরা কোন ছার। তার ওপর হিন্দুস্থানির ওপর অগাধ ভালবাসা। আমরা ব্যর্থ হয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

হিন্দুকুশ থেকে নেমে পুল-এ-কুমরি বলে একটা জায়গায় এলাম। ছ'টা

বাজছে, সন্ধে হয়ে গেছে, আকাশ মেঘলা। এখান থেকে মাজার প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। মোহিব আমাদের ভজাতে লাগল, "আজ এখানেই থাকা যাক। কাল ভোরে আমরা বেরিয়ে যাব।" নাজিরও একটু কিন্তু কিন্তু করে সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তাইই ভাল। রাস্তা সামনে ঠিকই আছে, তবে সামাংগানের আশেপাশে একটু খারাপ।"

"খারাপ মানে? কতটা রাস্তা খারাপ?"

"না, রাস্তা খারাপ নয়। তবে ওখানে কিছু খারাপ লোক থাকে .... মানে.... আর কি.... ইয়ে ... মানে অনেক গন্ধা আদমি..." নাজির একটা ঢোক গিলল। ইতিমধ্যে মোহিব আরও দশবারোজনকে তাদের রায় জিজ্ঞেস করে ফেলেছে। এবং সবাই একমত। আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। মনে হচ্ছে গাড়ি থামিয়ে লুঠপাট করার লোক থাকতে পারে রাস্তায়। অসম্ভব কিছুই নয়, এখানে তো যে কেউ এ-কে ৪৭ রাখতে পারে। আজকাল তো পঞ্চাশ ডলারেই পাওয়া যাচ্ছে।

একটা পুলিশ অবশ্য বলল, "যেতে পারো।"

আমাদের তখন গোঁ চাপল। আজ মাজার-এ-শরিফ যেতেই হবে। যা থাকে কপালে। মোহিবকে বকুনি দেওয়া হল, "গাড়ি তিরের বেগে চালাও। যদি রাস্তায় কেউ দাঁড় করায়, তাহলে একপাশে এসে আবার তৎক্ষণাৎ স্পিড দেবে।"

মোহিব গাঁইগুঁই করে পুল-এ-কুমরি ছাড়ল। পথে দেখলাম নাজিরের মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আমরা হিন্দুস্থানিরা নির্বিকার।

গাড়ি একশো কিলোমিটার স্পিডে ছুটে চলেছে। ছিটে ছিটে বরফ-ঢাকা মরুভূমির মতো জমি। হিন্দুকুশ পাহাড়টা দূরে সরে গেল, আরও ছোট হয়ে গোলগোল ঢিবিঢিবি হয়ে গেল। বহুদূর অবধি কোনও ক্ষেত, বাড়ি, মানুষ, গাছপালার লক্ষণ নেই। কালচে নীল আকাশের অন্ধকারেও চারদিকে যেন একটা হালকা আলো দেখা যাচ্ছিল। মনে হয় বরফের সাদাটে ভাব থেকে আসা। চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম এক বাঙালি ভদ্রলোক সম্পূর্ণ একলা একটি গাড়িতে চেপে এই রাস্তা দিয়ে পশ্চিমদিকের দেশে রওনা দিয়েছেন। মনে আশা আর বুকে দোর্দণ্ড সাহস। তাঁর উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করা। আজ থেকে ষাট বছর আগে এসব এলাকায় হয়তো এর থেকেও খারাপ পরিস্থিতি ছিল। দেশভক্তির কী দারুণ উদাহরণ!

আমরা ইতিমধ্যে ব্যাগ থেকে পাঁচশো ডলার বার করে মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে পায়ের চেটোর তলায় জুতোর সোলের ওপর রেখে দিয়েছি। তিরিশ লক্ষ আফগানি ভাগ ভাগ করে সিটকভারের তলায় আর টেপরেকর্ডারের নীচে অ্যাশট্রের খাপের তলায় পুরে দেওয়া হয়েছে। ক্যামেরার ব্যাগটা নিয়ে কী করব তাই ভাবছি। তখন মি. রঞ্জিত বললেন, "ওটা কাছেই রাখো, যদি ডাকাতরা ওটা হাত করে প্রাণে না মারে আমাদের— তাও ভাল।" এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ। যত দোষ আমার এত সাধের ক্যানন ক্যামেরাটাই করেছে। খামচে সেটাকে ধরে বসে রইলাম।

সাতটা নাগাদ আমরা সামাংগান পৌঁছলাম। একটা পুলিশের গেটে এসে গাড়িটা দাঁড়াল। "ডাক্তার-এ-হিন্দ, মেহমানে খারিজ অস্ত্।"

"খো, খো, বিরো।" আমাদের গাড়ি এগিয়ে গিয়ে তিনটে টয়োটা ভ্যান, আর দুটো ট্যাক্সির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পুলিশগুলো সব গাড়িগুলোকে একজোট করে নম্বরটম্বর লিখে একটা কনভয় তৈরি করে ছাড়ল।

আমাদের গাড়ি দু'নম্বর স্থানে রইল। মোহিব ইতিমধ্যে গাড়ির মাথায় লাগানো দুটো বিশাল বিশাল হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার মতে, এগুলো জ্বালালে ডাকাতরা বুঝবে এটা সরকারের গাড়ি, আর সেই বুঝে আক্রমণ করবে না। ওদিকে গাড়ির রংটা যে একেবারে মার্কামারা ট্যাক্সির হলদে সেটা ও ভুলে গেছে। অবশ্য ডাকাতরা রং কানাও হতে পারে। আধঘণ্টার পরে নাজির ফিসফিস করে বলল, "এই সেই জায়গা।" গাড়ি তখন একটা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কনভয়ের সব গাড়িগুলো বেপরোয়াভাবে স্পিড নিল। আমাদের গাড়ির স্পিড দেখাল ঘণ্টায় একশো তিরিশ কিলোমিটার।

হঠাৎ মোহিব হেঁড়ে গলায় ফিসফিস করে বলে উঠল, "ডা—কু! ডা—কু!" ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে আবছা আলোয় দেখলাম, একটা ছোট টিলার ওপর বসে রয়েছে দুটো লোক। তাদের মাথা আর মুখগুলো কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা। দু'জনকার হাতেই এ-কে ৪৭ রাইফেল। তাদের চোখ গাড়িগুলোর ওপর। যেন কয়েকটা নেকড়ে, একটা হরিণছানার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের গাড়ি একশো চল্লিশ কিলোমিটার স্পিড ধরল। এই মুহূর্তে যদি কোনও গাড়ি খারাপ হয়, চাকা ফাটে, তাহলে আর দেখতে হবে না। ডাকাতগুলো যে টিলায় বসে হাওয়া খাচ্ছিল না সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল।

তবে অতগুলো গাড়ি দেখে ওরা বিশেষ নড়নচড়ন করল না। আমাদের কনভয় এগিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে দেখি, আর একটা টিলায় আরও দু'জন। সেই একই পোশাক, আর হাতে এ-কে ৪৭।

ফাঁড়া কাটল। দূরে মাজার-এ-শরিফের আলো দেখা যাচ্ছে। ন'টা নাগাদ যখন আমরা শহরে ঢুকলাম তখন রাস্তায়, দোকানে একটাও লোক নেই। অন্ধকারের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে আমরা সাড়ে ন'টা নাগাদ সরকারি হাসপাতালে এলাম। Indian doctor, Indian doctor করতে করতে একে-তাকে জিজ্ঞেস করে করে অবশেষে আমরা আরও তিনজন ভারতীয় ডাক্তারকে খুঁজে বার করলাম। তারপরে টিমটিমে আলোয় আলাপ-সাক্ষাৎ করে রুশি ভদকা আর নান আর শুকনো কাবাব খেয়ে বারোটা নাগাদ ঘুম।

মাজার-এ-শরিফের হাসপাতালে তিনজন ভারতীয় ডাক্তার— ডা. সঞ্জয়, ডা. প্রকাশ আর ডা. মোহিতে। এরা একজন ফিজিশিয়ান বাকি দু'জন সার্জেন-অ্যানাস্থেটিস্ট। এ ছাড়া তিনজন কম্পাউন্ডার। এরা আমাদের পরে পরে এখানে এসেছে এবং হাসপাতালের একটা ও.টি.-তে ভালভাবে কাজকর্ম করছে; প্রায়শই বড় বড় অপারেশন করে। জিনিসপত্র আছে, এদের জিনিসপত্র উজবেকিস্তানের তাসকেন্ত থেকে ভারতীয় দূতাবাস পাঠায়। মোটমাট এদের কাজকর্মের অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল।

মাজার-এ-শরিফের হর্তাকর্তা হচ্ছে আবদুল রশিদ দোস্তম। ইনি একজন উজবেক, এককালে আহমেদ শাহ মাসুদের সঙ্গে রুশি এবং পরে তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। পরে অবশ্য মাসুদের সঙ্গে ছিলেন। তালিবানদের সময়ে দোস্তম তুর্কি পালিয়ে গেছলেন। পরে আমেরিকান হামলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবস্থা বুঝে উত্তর দিক থেকে যুদ্ধ শুরু করেন তালিবানদের বিরুদ্ধে। লম্বাচওড়া ভয়ংকর দেখতে এই উজবেক আজ সহরক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। অবশ্য তিনি কারুরই বাগে আসার লোক নন। মাজার-এ-শরিফে তাঁর নিজস্ব রাজত্ব চলে, এমনকী তাঁর নিজের আফগানি টাকাও চলে। সেটা কাবুলের আফগানির অর্ধেক দাম। দোস্তমের হাসি শুনলে নাকি লোকেদের হৃৎপিণ্ড চমকে যায়। তার এক সৈনিক একবার চুরি করাতে দোস্তম তাকে ট্যাঙ্কের চাকার সঙ্গে বেঁধে ট্যাঙ্ক চালাতে বলেছিলেন। সৈনিকের দেহ যখন টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন

দোস্তম নাকি বিরাট উল্লাসে হাসছিলেন। এই দোস্তমের রাজত্বে আমরা এখন এসেছি।

নাজির এল। মোহিব হাওয়া। নাজির খবর দিল রাত্তিরে মোহিব নাকি তার বোনের বাড়ি খুঁজতে গেছল। রাস্তায় এক পুলিশ বন্দুক দেখিয়ে তার গাড়িটা কেড়ে নিচ্ছিল; শেষে অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গাড়ির স্টেপনিতে এসে রফা হল। পুলিশ বন্দুক দেখিয়ে স্টেপনি নিয়ে চলে গেল। এটা দোস্তমের দেশ, এখানকার কানুন আলাদা। আমরা তো হতবাক।

আফগানিস্তানে যে শান্তি ফিরে আসতে অনেক সময় লাগবে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এখানে— "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।" মনে হল যেন পুরনো পশ্চিম আমেরিকার কোনও কাউবয় সিনেমার গল্প শুনছি। ডা. প্রকাশ বললেন, "এখানে একজন মুজাহিদ্দিন আছে যে এককালে মাসুদের খাস লোক ছিল। তার নাম উস্তাদ আটা। এর সঙ্গে দোস্তমের বনে না, তবে হাসিমুখে দেখা সাক্ষাত করতে হয়। উস্তাদ আটা শুনেছি তার নিজস্ব পুলিশ এবং বন্দুক-গোলাগুলি যোগাড় করছে। আজকাল যখন আফগানিস্তানে সবাই বন্দুক ফেলে দিচ্ছে, তখন এই লোকটা কী মতলব করছে কে জানে। হয়তো দোস্তমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাবে।" চিন্তার বিষয়। তবে আমাদের চিন্তা এখন মোহিবের ট্যাক্সি আর হাসপাতালের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা— এই।

বেলার দিকে আমরা হাসপাতাল দেখে, মিটিং ইত্যাদি করে অন্য একটা ট্যাক্সি ধরে মাজার-এ-শরিফের মাজার দেখতে গেলাম শহরের মাঝখানে। গলি, বাজার, পেরিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে ময়ুরকণ্ঠী নীল পাথরে তৈরি হজরত আলির কবর। ইনি ইসলাম ধর্মের চতুর্থ কালিফ। হজরত মহম্মদের পরে বোধহয় এঁরই নাম। কথিত আছে যে তাঁর মৃত্যুর পরে যখন তাঁকে কবর দেওয়ার কথা হল, তখন নাকি তাঁর শরীরটা একটা সাদা উটের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। উটটা মক্কা থেকে হাঁটতে হাঁটতে এই জায়গায় এসে থেমেছিল।

চারদিকে বাগান আর হাঁটবার রাস্তা। তার মাঝখানে ময়ুরকণ্ঠী নীল রঙের লাজোয়ার পাথরের তৈরি মাজার। একটা ছোট মতন বুলন্দ দরওয়াজা গোছের গেট দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরের দেওয়ালে অজস্র কারুকার্য— সবই প্রায় লাজোয়ারের; অনেক জায়গায় তাজমহলের মতো পাথর বসানো কাজ। মোটমাট এই রুক্ষ মরুভূমিতে একটা দেখবার মতো

জিনিস। আফগানিস্তানে প্রথমবার একজন আমাদের রাস্তা আটকে দাঁড়াল— অবশ্য ভীষণ কিন্তু-কিন্তু করে।

"আপনারা দোস্ত, আপনারা হিন্দুস্থানি মেহমান, কিন্তু, মাপ করুন, আপনারা আলাদা মজহবের; আপনারা ভেতরে যেতে পারবেন না কবরের মধ্যে।"

দূর থেকে দেখলাম লোকেরা অন্ধকারে মোমবাতি লাগিয়ে নমাজ পড়ছে। অনেকগুলো গম্বুজ আলাদা আলাদা মাপের, তার আশেপাশে কয়েকটা মিনার। তাজমহলের মতো সমান সমান নয়, তবে পুরো কারুকাজটাতেই একটা সমান ভাব আছে। একপাশে একটা মিউজিয়াম। তাতে অনেক পুরনো জিনিস রাখা। মনে হল সেখানে হজরত আলির অনেক জিনিসপত্র আছে, তবে সেসব বোঝাবার কোনও লোক বা লেখা নেই।

ডা. প্রকাশ বললেন, "তোমাদের হাতে সময় কম, না হলে আর একটা জায়গায় যেতে পারতে। এখান থেকে ঘণ্টা দুয়েক লাগে যেতে। জায়গাটা বাখ অঞ্চল (Balkh)। সেইখানে আলেকজান্ডারের তৈরি একটা শহর ছিল। হয়তো ওইদিকে কোনও অঞ্চলে তাঁর বিয়েও হয়েছিল। বাখ অঞ্চলেই জরথুষ্ট্র প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। পরে এসব জায়গায় ব্যাকট্রিয়ান সাম্রাজ্যের একটা শহর গড়ে উঠেছিল। এককালে এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল। মনে হয় হাজার দেড়েক বছরের পুরনো। বৌদ্ধ ধর্মটর্ম পড়াত বোধহয়। এখন অবশ্য চারদিকে ফাঁকা মাঠ আর এক-আধটা ধ্বংসাবশেষ আছে। তবে ওখানকার উলের কার্পেট খুব বিখ্যাত।"

বাজারে গিয়ে কার্পেট দেখলাম। পারস্য কার্পেটের মতো নয়, তবে চোখ ধাঁধানো মিহি কাজ। দামটাম যদিও মিহি নয়। শুরুই হল পাঁচশো ডলার দিয়ে। দরদামের কোনও বালাই নেই। আমরা সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে চলে এলাম উস্তাদ আটার কাছে।

উস্তাদ আটার বাড়ির সামনে বেশ ভিড়। নাজির আবার তার কেরামতি দেখাল। ফস করে নেমে গিয়ে, এখানে-সেখানে কথা বলে দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। সবাইকার গায়ে হাত দিয়ে নিরাপত্তার যাচাই চলছিল। হিন্দুস্থানিদের সেসব মাফ। উস্তাদ আটার অফিসে টেলিফোন, কর্ডলেস, মোবাইল ইত্যাদি সব রয়েছে। দেওয়ালে মাসুদের বিশাল বড় ছবি— ঘরের চারদিকে বন্দুকধারী সৈনিক। উস্তাদ আটা আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

পাঠান স্যুট আর জ্যাকেট পরা সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ফর্সা পাঠানের হাতটা আমাদের হাত কামড়ে ধরল। বিরাট লম্বা দাড়ি আর টানটান চেহারা। একদম সিনেমার পাঠানদের মতো। দেখেই বোঝা যায় বড় ধরনের যোদ্ধা। উস্তাদ আটার সঙ্গে মাজারের পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা চলল। এখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার নিরাপত্তা আর রোগীটোগির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তারজুমানের মাধ্যমে আশ্বাস দিলেন ভারতীয়দের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা ওঁরা করে দেবেন। আশেপাশের লোকেরা অবাক হয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনল। উস্তাদ আটাকে বোধহয় তারা এতটা অমায়িক কখনওই দেখেনি।

আমাদের এবার মাজার ছাড়তে হবে। ওদিকে মোহিবের দেখা নেই। সে নাকি মাঝে এসে তার মুখ দেখিয়ে কোথায় গায়েব হয়ে গেছে। আমরা প্রচণ্ড রেগে ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে অন্য ট্যাক্সি করে মাজার-এ-শরিফ ছাড়লাম। রাস্তায় দেখলাম কিলা-এ-জঙ্গি। এটা এখানকার একটা পুরনো কেল্লা; মনে হয় চার-পাঁচশো বছর আগের। বিশাল মোটা মাটির দেওয়ালের কেল্লা এবং তার ছাদের ওপরে ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা আপাতত একটা মিলিটারির গ্যারিসন হয়েছে। এই সেই কেল্লা যেখানে তালিবান আর আল-কায়দারা আমেরিকার বন্দি থাকাকালীন বিদ্রোহ করেছিল। পরে দু'-তিনজন আমেরিকান সৈনিক মারা গেছল এবং তারপরে আমেরিকানরা ঠাণ্ডা মাথায় বন্দিদের ওপরে গোলাগুলি চালিয়ে তিন-চারশো তালিবান আর আল-কায়দাকে মেরেছিল। দু'-এক জায়গায় দেখলাম ধ্বসে-যাওয়া দেওয়াল— মনে হয় আমেরিকার বোমার দরুন।

মাজার ছাড়ার আগে হাসপাতালে দেখা করে বলে দেওয়া হল মোহিবকে যেন আমাদের পেছন পেছন কুন্দুজ আসতে না বলা হয়। আমরা খেয়েদেয়ে রওনা হলাম। মি. রঞ্জিত বললেন, "দেখো, মোহিব নিশ্চয়ই কুন্দুজ যাবার রাস্তায় পুলিশের গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

আর হলও তাই। আমাদের দেখে ভীষণভাবে হাত-পা নাড়তে লাগল। পুলিশ দিয়ে গাড়ি থামাল। শুরু হল দুই ট্যাক্সি ড্রাইভারের ঝগড়া। এদের ঝগড়া বাঙালিদের মতোই— চিৎকার-চ্যাঁচামেচি হয় না, কারণ দু'পক্ষেরই গলার আওয়াজ গম্ভীর। তবে মুখের অভিব্যক্তি নানান রকমের হয়, দাড়ি নড়ে ওঠে আর গাড়ির ওপর বড় চাপড় মারে। মাঝেমাঝে থুতুর বর্ষণ তো আছেই। পুলিশটা নাজেহাল, একবার একে সামলাচ্ছে একবার তাকে। আমরা তখন

গাড়ি থেকে নামলাম। আমাকে দেখে মোহিব "হো ডাক্তার সাব" বলে 'আমায় বাঁচাও' গোছের কীসব ভাবভঙ্গি করে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার চাউনি দেখে আবার সুড়সুড় করে নিজের যায়গায় চলে গেল। ঝগড়া যখন হাতাহাতিতে গড়াল তখন হাঁইমাই করে থামান হল। বিচার হল— মোহিব দু'লাখ আফগানি জরিমানা দেবে নতুন ড্রাইভারকে। নতুন ড্রাইভার ভীষণ খুশি। দশবারো কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে দু' লাখ আফগানি মানে আড়াইশো টাকা মন্দ নয়। আমাদের অনেকবার "তশ্যখ্ খুর তশ্যখ্ খুর" বলে ধন্যবাদ জানাল। চুমু খেতে আসছিল। তার মুখটা বাঁচাতে গিয়ে আমার নাকটা গেল ঠুকে তার শক্ত চোয়ালে। ভজকট ব্যাপার।

সেই পুরনো রাস্তা। দু'দিকে ফাঁকা জমি। এখান থেকে পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার বাঁদিকে তোজিকিস্তান আর উজবেকিস্তানের সীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে আমুদরিয়া। ডাকাতদের জায়গাটা দেখলাম। আশেপাশে ছোটখাট পাথুরে পাহাড়, আর দূর দূর অবধি জীবনের কোনও লক্ষণ নেই। বেশ একটা চম্বল-চম্বল ভাব। পুল-এ-কুমরি পৌঁছলাম সাড়ে পাঁচটায়। সন্ধে নাগাদ আমরা এসে পৌঁছলাম বাগলান। নির্জন ছোট শহর, একটা আলো বা কুকুর-বেড়ালও নেই। মনে হয় যুদ্ধের জন্যে সারা শহরের লোকরা কোথাও পালিয়ে গেছে। রাস্তাটা খারাপ হয়ে গেল। চারদিকে ধুলোবালির মধ্যে দিয়ে আমরা ঘটাং ঘটাং করতে করতে আফগানিস্তানের জনশূন্য প্রাণশূন্য এলাকার মধ্যে দিয়ে যেতে লাগলাম। দূরদূরান্ত অবধি কোনও লোকালয় নেই, দোকান নেই, পেট্রোলপাম্প নেই। তারই মধ্যে আমাদের গাড়ির চাকা ফেটে গেল। সবাই নির্বিকার, মোহিব যথারীতি গাড়ির স্টার্ট না থামিয়ে হিটার চালিয়ে গাড়ির চাকা পালটাল; আমরা শূন্যে-তোলা জ্যাকে-ওঠা বাঁকা গাড়িতে তেরচা হয়ে বসে রইলাম। আর একবার চাকা ফাটলে কী হবে জানা নেই, কারণ স্টেপনি একটাই। সাড়ে আটটা নাগাদ সরু সরু গলিওয়ালা মাটির দেওয়ালওয়ালা শহর কুন্দুজ পৌঁছলাম। এটা এককালে মাসুদের একটা গড় ছিল। তালিবানদের ভালরকম নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল মাসুদ। এসব এলাকায় তালিবানদের রাজত্ব ছিল না।

নাজির আবার কাজে লেগে পড়ল। দু'একটা সৈনিকের সঙ্গে কথাটথা বলে জানাল এখানকার কমান্ডারকে ও চেনে। এখানে সরকার বলে কিছু নেই, ওই কমান্ডারই যথাসর্বস্ব।

কমান্ডারের মাটির দোতলা অতিথিভবনে পৌঁছলাম। আলোর কোনও বালাই নেই, টিমটিমে লণ্ঠন নিয়ে সৈনিকরা গেট খুলে দিল। ঘরে উলের কার্পেট পাতা, তারই একপাশে তিন ইঞ্চি উঁচু গদি আপাতত বসবার জন্যে। তারপর সেখানেই শোবার ব্যবস্থা। একধারে একটা হাত ধোবার জায়গা, অন্যধারে একটা বিশাল বুখারিতে চা ফুটছে। কয়েকটা ছোট বাল্‌ব জেনারেটারের লাইন দিয়ে ঘরে ঘরে জ্বলছে।

ঘরে এসে ঢুকল জ্যাকেট পরা দাড়িওয়ালা পাঠান চেহারার একজন লোক। মুখটা উস্তাদ আটার মতো তবে একটু গোবেচারা। এর মাথায় রয়েছে তাজিকদের টুপি 'পাখোল'। তবলার বিঁড়ের মতো দেখতে একটা কাপড়ের রিং, তার ওপরে একটা গোল বারান্দা গোছের ব্যাপার । পুরো টুপিটাই গরমকাপড় দিয়ে তৈরি। মাসুদ এই টুপি পরে লড়াই করত। গোবেচারা লোকটাই এখানকার কমান্ডার। নাম গুলাম মহম্মদ খান। বয়েস হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, যার মধ্যে বাইশ বছর সে যুদ্ধ করেছে। আজ সে কুন্দুজের হর্তাকর্তা। গুলাম মহম্মদ হিন্দি জানে না। আধঘণ্টা ধরে নাজিরের মাধ্যমে বোঝালেন যে যুদ্ধের পরে আমরাই হচ্ছি প্রথম বিদেশি— এই অঞ্চলে হিন্দুস্থানিদের ভাল করে আপ্যায়ন করতে পারছে না বলে সে ভীষণ দুঃখিত। আশেপাশে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। খাবারও কিছু নেই। আমরা যখন এর ওর দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি তখন দু'জন সৈনিক ঘরে ঢুকল। খবরের কাগজ থেকে বেরল গরম নান, আর প্রায় চল্লিশখানা শিক— একএকটার পাঁচ-ছ' টুকরো মাংস। গুলাম মহম্মদ আমাদের আর ভারতবর্ষের গুণগান গেয়ে চলল আর আমরা নান দিয়ে শিককাবাব খেতে লাগলাম— সঙ্গে আফগানি চা। আধঘণ্টাটাক পরে দেখলাম ডা. বালা আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

"কী হল? কী হয়েছে?"

"করেছিস কী। একবার তাকিয়ে দ্যাখ।"

আমি দস্তরখানে আমার দিকটা দেখলাম। সামনে পড়ে আছে পনেরো খানা শিক, মানে প্রায় পঁচাত্তর টুকরো মাংস খেয়ে ফেলেছি। সব্বনাশ! অন্ধকারে খিদেতে কোনও মাত্রাই থাকেনি। এবার রাথরুমের চাপটা না এলেই হয়।

এগারোটা বাজল। গুলাম মহম্মদ বেচারা মুখ করে আমতা-আমতা করে

বসেই রইল। একপেট খেয়ে ঘুমে ঢুলে আমরা এর ওর ঘাড়ে পড়তে লাগলাম। গুলাম মহম্মদের পাশে বসে আছে তার পনেরো বছরের ছেলে হাবিবুল্লা। জন্মে অবধি সে তার বাবাকে মেশিনগান আর রকেটলঞ্চার নিয়ে লড়তেই দেখেছে। যখন জিজ্ঞেস করলাম বড় হয়ে কী করবে, তখন লজ্জিত হয়ে সে একটু হাসল।

"ওয়ালিদের সামনে ও লজ্জা পেয়ে গেছে। আমার সামনে বেশি কথা বলে না ও।" গুলাম মহম্মদের মন্তব্য।

সাড়ে এগারোটার সময় গুলাম মহম্মদ তার ছেলেকে আদেশ দিয়ে গেল— মেহমান-এ-খারিজদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়। আমি যখন শুতে যাচ্ছি তখন হাবিবুল্লা উঠে দাঁড়াল। লাল লাল গোল গালওয়ালা বাচ্চা ছেলেটা আমায় ইশারা করে শুয়ে পড়তে বলল। আমার হাত থেকে কম্বলটা নিয়ে টেনে সোজা করে পরিষ্কার করে বিছিয়ে দিল গায়ে, বিছানার চাদরটা গুঁজে দিল। মি. রঞ্জিত আর ডা. বালা সেসব দেখে তাড়াতাড়ি করে কম্বলে ঢুকে পড়ল। হাবিবুল্লার সে সব পছন্দ হল না। আবার কম্বল পাটপাট করে সে বিছানায় গুঁজে দিল। ঘুমাবার আগে দেখতে পেলাম হাবিবুল্লা লণ্ঠনের আলোটা কম করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওয়ালিদের হুকুম অমান্য করা কি চাট্টিখানি কথা!

সকালে উঠে গরমজলে হাতমুখ ধুয়ে সবচেয়ে মুশকিল কাজ। ঘরের বাইরে একটা বাথরুম গোছের জিনিস যার দরজাটা হাওয়া দিলে খুলে যায়। জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। কুয়ো পায়খানা আর খাটা পায়খানার একটা মিশ্রণ। বাথরুমের কাজের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ এক সৈনিক ভেতরে ঢুকে এল। আমি মরিয়া হয়ে "মেহমান, হিন্দুস্থানি দোস্ত" বলাতে আফগানি সৈনিক চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল।

গুলাম মহম্মদের সঙ্গে হাসপাতাল উন্নয়নের কথা হল। মনে হল এখানে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই নেই। ভাঙা একটা হাসপাতাল এককালে ছিল। ওষুধবিষুধেরও প্রচণ্ড আকাল।

মোহিবের চাকা সারানো হল। কুন্দুজের বাজারে বেশ ভিড়। ছোটবড় দোকান, লাউডস্পিকারে হিন্দি গান বাজছে। ঠাণ্ডার মধ্যে রাস্তায় ছেলেরা ফুটবল খেলছে। মাটির বাড়ির ছাত থেকে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। মাসতিনেক আগে

এসব দৃশ্য এখানে অকল্পনীয় ছিল। গুলাম মহম্মদকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা কুন্দুজ ছাড়লাম।

বাগলানের আগে দেখলাম একটা বিরাট বড় রিফিউজি ক্যাম্প। প্রায় দশ হাজার লোক সেখানে বাস করছে— জালালাবাদের কাছে যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনই। সেই একই ছেঁড়া তাবু—অসহায় লোকজন, নোংরা রুগ্‌ন বাচ্ছারা আর মাঝেমাঝে দু-'একটা রেডক্রসের পতাকা। তবে এইসব অঞ্চলে ঠাণ্ডা অনেক বেশি কাজেই মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি।

বাগলানে আজ বেশ ভিড়। কাল রাতে যে জায়গাটা জনমানবশূন্য লাগছিল আজ সেটা একটা রমরমে বাজার। সেসব পার করে আমরা পুল-এ-কুমরিতে নান, মাংস খেলাম। মোহিব হঠাৎ দু'হাত দিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিল গপাগপ। হিন্দুকুশে ওঠার সময় গাড়ি থামিয়ে মাইনফিল্ডের মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে একতাল বরফ তুলে এনে সেটা চিবোতে চিবোতে সে গাড়ি চালাল। তার নাকি জল তেষ্টা পাচ্ছিল। তার কাণ্ড দেখে নাজিরও হাঁ।

হিন্দিতে বলল, "ও পাগল।"

মোহিব হিন্দি বুঝতে পেরে বলল, "পাগল! হুঁ!! তুই পাগল।" বলেই নারদ নারদ করে 'দুই' আফগানিতে হিন্দুকুশ পাহাড়ের মাঝখানে ফাটাফাটি ঝগড়া লাগিয়ে দিল। তাদের ঠাণ্ডা করে আমরা সন্ধে নাগাদ কাবুল পৌঁছলাম।

নেশা

কাবুলে এক ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে আলাপ হল, নাম খালিদ। থাকে কাবুলের কাছে ময়দান-এ-শরিফ। বয়েস কুড়ি-বাইশ হবে, তবে দেখতে একটু বুড়োটে মতো। পরনে ময়লা সালোয়ার সোয়েটার আর জ্যাকেট, গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। এককালে ট্রাক চালাত। ট্যাক্সি চালাচ্ছে ইদানীং। হাত এখনও সড়গড় হয়নি, দু'বার ধাক্কাও মেরেছে। একবার আমি সামনে বসেছিলাম, এক সেকেন্ড দেরি হলে একটা বিশাল ট্রাক ডানদিকের দরজাটা ভেঙে দিয়ে আমার পা গুঁড়িয়ে দিত।

খালিদের জ্ঞান খুব সীমিত। তার মতে পস্তুন বা পাঠানরাই হচ্ছে আফগানি, বাকি সবাই, অর্থাৎ তাজিক হাজারা উজবেকি ইত্যাদি কেউই আফগানি নয়। সে জানে যে তেইশ বছর আগে আফগানিস্তানে আমেরিকানরা আক্রমণ করেছিল, এবং তারপর থেকে সেই যুদ্ধ এখনও চলছে। ইদানীং যে আমেরিকানরা আবার এসেছে সে তার খবর রাখে না। শুধু এটাই জানে যে সাদা চামড়ার কিছু লোক আবার ফিরে এসেছে! সাদা চামড়া মানেই আমেরিকান!

খালিদ বলল, "এখানে যুদ্ধ হচ্ছে টাকা-পয়সার জন্যে। তালিবানদের সময়ে সে সব ভাবনা ছিল না। তাদের টাকা আসত চরস, আফিম, হেরোয়িন বিক্রি করে। ওতে অনেক টাকা হয়। আমাদের বাড়িতে ঢের মাল আছে এখনও।"

"আছে মানে? সে তো খুব ভয়ানক। যদি পুলিশ ধরে?"

"পুলিশ কেন ধরবে? তারা তো সব জানে। গত কয়েক বছর ধরে তাদের সাহায্য নিয়েই তো সব পাচার হত। এখান থেকে মাল যেত তোজিকিস্তান উজবেকিস্তান। আমুদরিয়া পেরিয়ে এসব জিনিস বিদেশে চালান যেত। হেরোয়িন তৈরি হত পাকিস্তানে, পেশওয়ারের কাছে। ওখান থেকে করাচি

হয়ে পশ্চিমে চলে যেত। বাইরে চরস-আফিমের ভাল দাম পাওয়া যায়। এখানে অবশ্য আমরা মোটামুটি দামে বিক্রি করি।"

"কত দামে বিক্রি করো?"

আশি থেকে একশো লাখ আফগানি— পনেরো কিলো চরসের জন্যে। আমেরিকাতে অবশ্য এসবের দাম চারডবল। আফিমের দাম একটু বেশি। এক কিলোর দাম দেড়শো লাখ আফগানি। তবে সেটা খুব ভাল ধরনের আফিম। তোমাদের চাই নাকি? খাবে?"

আমরা আঁতকে উঠলাম। হিসেব করলাম এক কিলোর দাম প্রায় পাঁচশো ডলার, মানে পঁচিশ হাজার টাকা। সেটা কি খুব সস্তা নাকি ঠিক দাম— বুঝতে পারলাম না। এসব বাজারের সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই। খালিদ যতই জ্ঞানহীন হোক না কেন, চরস-আফিমের বাজার সম্বন্ধে বেশ পোক্ত। মাল যে পশ্চিমে, আমেরিকায় পাচার হয়, সে খবরও রাখে।

"এখন তো সরকার বদলে গেছে। পুলিশও ভাল হয়েছে। এবার তো চরস-আফিম পাচার বন্ধ হবে।"

"না, না, তা কেন হবে। আমার বাড়িতেই তো বস্তা বস্তা চরসের গাছের বড়ি রয়েছে। তার থেকে চরস তৈরি করে সব পাচার হবে তোজিকিস্তান দিয়ে। আর তোমায় কে বলেছে পুলিশ খুব ভাল হয়ে গেছে? এসব তো তালিবানদের সময়কারই পুলিশ। দাড়িটাড়ি কামিয়ে অন্য পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। এ পুলিশ আগের থেকে আরও নরম হয়ে গেছে। আগে কেউ চুরি করলে তালিবান পুলিশ তাকে ধরে বিচার করে হাত কেটে ফেলত। এখন সে ভয়টাও নেই। তাই এখন যে যা পারে, চুরি করে। এই তো সেদিন যখন রাত্তিরবেলা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি তখনও কয়েকটা লোক আমার জ্যাকেট, লাইসেন্স এমনকী গেঞ্জি পর্যন্ত চুরি করে নিল। যা টাকা ছিল সব তো নিলই। যখন বললাম লাইসেন্স নিয়ে তোমরা কী করবে, তখন আমার নাকে একটা ঘুষি মারল। এই দ্যাখো। ভাগ্যিস গাড়িটা নেয়নি। তা হলে রাতারাতি গাড়ি চলে যেত পেশওয়ার। সেখান থেকে সব পার্টস খুলে বিক্রি হয়ে যেত। খুঁজেই পাওয়া যেত না গাড়ি।"

খালিদের গল্প শুনে বুঝতে পারলাম এখানকার অবস্থা বেশ জটিল। যেখানে এত লোক চরস-আফিম বিক্রি করে, তাদের রোজকার খাবার জোগাড় করে তারা কি রাতারাতি সে সব বন্ধ করতে পারবে? তা হলে তারা

খাবেই বা কী? সরকার কি তাদের জন্যে জমিজমা, জলের ব্যবস্থা করবে, অন্য ধরণের চাষ করার জন্য?

হোলি আসছে। কীভাবে সেটা পালন করা হবে বোঝা যাচ্ছিল না। এখানে হোলির নামগন্ধ নেই তবে শুক্রবারে পড়েছে বলে হাসপাতাল ছুটি। কর্তার সিংকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল কিছু মিষ্টি আর প্যাঁড়া জোগাড় হতে পারে— রঙের জন্যে সিঁদুর আর রান্নার হলদে রং পাওয়া যায়। তাইই সই। কার যেন মাথায় এল, "আফগানিস্তানে রয়েছি, সারা পৃথিবীতে যে দেশের নামডাক সেখানে বসে সেখানকার জিনিস চেখে দেখব না?" কর্তার সিংকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করা হল:

"কিছু ভাঙ পাওয়া যাবে কি?"

"হ্যাঁ পাওয়া যাবে বই কি। আমি চারটে লাড্ডু এনে দেব, সেগুলো ভেঙে তোমরা শরবৎ তৈরি করে নিও।"

হোলির দিন সকালে সিঁদুর দিয়ে রং খেলে আমরা কাজে লেগে পড়লাম। একটা বিরাট ডেকচিতে প্রথম পড়ল দুধ, তারপর জল, চিনি, বাদামগুঁড়ো, মৌরি, মরিচ, এলাচ, লবঙ্গ। চারটে ভাঙের ভেজাভেজা সবুজ রঙের লাড্ডু— মনে হয় পাতা গোছের কিছু একটা জিনিস গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেওয়া হল।

দশটা থেকে শরবৎ খাওয়া শুরু। মেওয়া মশলাপাতি ভালই পড়েছিল বলে বেশ সুস্বাদু হয়েছিল। সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে দু'তিন গেলাস পেটে চলে গেল। আমাদের মধ্যে কয়েকজন অতিরিক্ত চালাক। তারা ভাঙের শরবতের ধারেকাছে ঘেঁষছে না, শুধু দূরে বসে মিছিমিছি হাসি তামাসা করছে আর বসে আছে কখন আমরা ভাঙের কেরামতি দেখাব। সাড়ে বারোটা নাগাদ যখন খাবার দেওয়া হয়েছে তখন অনেকেই চার-পাঁচ গেলাস সাবাড় করে দিয়েছে। উঠে হাঁটতে গিয়ে মনে হল যেন অনেকক্ষণ সময় লাগছে উঠতে। কেউ যেন আমার হয়ে হেঁটে দিচ্ছে। ওদিকে টিভি-তে কেন যে একই গান কতক্ষণ ধরে একঘেয়ে বেজে যাচ্ছে সেটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। লোকজনরা এত আস্তে আস্তে হাঁটাচলাই বা করছে কেন?

খাবার টেবিলে বসলাম। একগাদা বাটি আর থালা দেখে মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল। সবাই বাটিগুলো এখান ওখান করছে আর সেগুলো গোলগোল

ঘুরে থালার আশেপাশে চক্কর মারছে। হাতে করে খেতে গিয়ে মনে হল কেউ যেন আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে; হাতটা দেখলাম কানের দিকে এগোচ্ছে। আচমকা সেটা মুখে ঢুকে গেল। তারই মধ্যে আমার মনে হল টিভি-টা যেন কাছে এসে গেছে। ডানপাশে শুনলাম ডা. বালা একমনে গান গাইছে। সবাই এতক্ষণ ধরে এত কেন খাচ্ছে তাও বুঝলাম না। কোনওরকমে খাওয়া শেষ করে শুতে যাচ্ছি ওপরে। সিঁড়িগুলো হঠাৎ ভীষণ উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো হয়ে গেল।

সন্ধে নাগাদ ঘুমিয়ে-টুমিয়ে আমি ইহজগতে ফিরলাম। আফগানিস্তানের পরম সিদ্ধিলাভের অভিজ্ঞতাটা ভালই হল।

মাদার

আমাদের পলিক্লিনিকে নানা ধরনের রোগীর মধ্যে বেশির ভাগই মহিলা আর তাদের বাচ্চাকাচ্চা। একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা প্রায়ই ওষুধ নিতে আসতেন। বয়েস হবে সত্তর-পঁচাত্তর, কাঁচাপাকা চুল আর সারা মুখময় কোঁচ পড়ে গেছে। বোরখা সরিয়ে যখন আমাদের দেখে একগাল হাসতেন তখন বেশ ভাল লাগত। কাটাকাটা নাক-চোখ— এককালে খুবই সুন্দরী ছিলেন। একবর্ণও হিন্দি বা উর্দু জানেন না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে প্রাণভরে গল্প করেন। ডা. বালা এঁর প্রিয়পাত্র। হিন্দুস্থানি ডাক্তার ভীষণ ভাল, তাদের ওষুধ দারুণ আর ডা. বালা তাঁর ছেলে। ডা. বালা তাঁর সঙ্গে খুব গল্পসল্প করে একটি শর্তে তাঁর ছেলে হতে রাজি হয়েছিল— যদি তিনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেন। বুড়ি ভদ্রমহিলা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। গত চল্লিশ বছরের অভ্যাস ছাড়া তো ভীষণ মুশকিল এই বয়েসে। তবে ছেলের আদেশ মানতেই হবে। অনেকদিন পরে বুড়ি আবার পলিক্লিনিকে এলেন। একগাল হেসে বললেন, "সিগারেট ছেড়েছি"— বলে নিজের হাতদুটো আমাদের নাকের সামনে এনে প্রমাণ দিলেন। ডা. বালা আর আমি ভীষণ খুশি। এঁর নাম আমরা জানতাম না। জানবার চেষ্টাও করিনি। এঁকে আমরা 'মাদার' বলে ডাকতাম। বুড়ি সেটা শুনে চোখ পিটপিট করে কেঁদেই ফেললেন।

বকরীদের দিন মাদার আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন। সেদিন ড্রাইভার নেই, ট্যাকসি চলাচলও কম। মিনিবাসটা চালাবার চেষ্টা করলাম আমরা, হল না। ঠিক হল আজ আর যাওয়া হবে না। কাল দেখা যাবে।

পরের দিন ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সিতারা হোটেলের পেছনে একটা বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। দরজায় টোকা মারতে মাদারের নাতি এসে দরজা খুলল। সে আমাদের আগেও দেখেছে পলিক্লিনিকে; চিনতে পারল। তবে কী যে করবে আমাদের নিয়ে তা বুঝে উঠতে পারল না। এমন সময় ভেতর থেকে মাদার

বেরোলেন। হই হই করে এসে হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে ঘরে ঢোকালেন। চিৎকার করে সারা বাড়িকে জানান দিলেন আমার ছেলেরা এসে গেছে। ডা. বালাকে গাল টিপে গায়ে হাত বুলিয়ে চুমুটুমু খেয়ে একসা। ডা. বালা আনন্দে আদর খেতে লাগল। আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকে একেবারে দোতলায় চলে গেলাম। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে মাদার দরিভাষায় বকবক করতে লাগলেন, আমাদের দরির জ্ঞান সীমিত— তাঁর ভাষা বুঝে উঠতে পারলাম না। তারজুমান জাবাদের সাহায্য নিতে হল।—

"তোমরা সিগারেট ছাড়তে বললে, আমি তাই করলাম। গতকাল কত খাবার তৈরি করে আমি সারাদিন অপেক্ষা করলাম, তোমরা তো এলেই না।"

আমরা মিনিবাস আর ড্রাইভারের কথাটা বললাম। ইতিমধ্যে মাদারের নাতিরা তিন-চার প্লেট কমলালেবু, পেস্তা বাদাম কিসমিস আখরোট, কেক বিস্কুট যা পেরেছে সব নিয়ে এসে হাজির।

"এখন এইগুলোই পড়ে আছে। কাল এলে কাবুলি কাবাব, ফিরনি— এসব পেতে।"

"খাবার জন্যে তো আসা নয়। আসতে বলেছিলে তুমি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আসা।"

করুণ মুখে মাদার আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। মুখে বিশেষ কিছু বললেন না, তবে তাঁর ভেজা চোখ দেখে বোঝাই গেল তাঁর মনের অবস্থা কীরকম। খাবার পরে মাদার তাঁর বাড়ির লোকদের ছবির অ্যালবাম দেখালেন। ছেলে মেয়ে বউ জামাই নাতি নাতনি সবাইকার ছবি। কেউ এদেশে, কেউ বিদেশে। বললেন—

"এইসব অ্যালবাম আমরা আলমারিতে রাখি। কাউকে দেখাই না। এতে আমাদের বাড়ির জনানাদের ছবি আছে। তোমরা তো আমার ছেলে, তোমাদের দেখাতে কোনও দোষ নেই। তোমরা তো বাড়িরই লোক।"

রাস্তা অবধি ছাড়তে এলেন মাদার আমাদের। গেট পেরিয়ে রাস্তায় আসতেই ঢকাস করে হালকা নীল রং বোরখাটা নামিয়ে নিলেন। চোখ ছলছল, আমাদের গায়ে হাতটাত বুলিয়ে বিদায় জানালেন। "পলিক্লিনিকে যাব তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।"

মাদারের আচরণ নিয়ে অনেক আলোচনা হল। কেন এতটা স্নেহ আমাদের ওপর? তাঁর ছেলেরা তো তাঁর দেখাশুনো ভালই করে মনে হয়।

হয়তো গত তেইশ বছরের যুদ্ধে এরা এত বেশি যুদ্ধ আর ধ্বংস দেখেছে যে এদের মনের ভাবটা বদলে গেছে। এতকাল মেয়েদের একঘরে করে রাখার পর যদি কোনও বাইরের লোক এদের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলে, ভাল ব্যবহার করে, তা হলে হয়তো এদের মনটা ঘুরে যায়। এরা যে আবেগপ্রবণ জাত সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। আর হিন্দুস্থানিদের ওপরে দুর্বলতা তো সীমাহীন।

মাদার-টু

আমাদের বাড়ির সামনে আফগানিস্তানের রক্ষামন্ত্রীর বাড়ি। রক্ষামন্ত্রীর নাম মার্শাল ফাইম। একদল সৈন্য নিয়ে দুটো বাড়ি জুড়ে ফাইমের পরিবারের লোকেরা আমাদের সামনে থাকে। সেই বাড়ির একজন আধবুড়ি মোটামতন মহিলা প্রায়ই পলিক্লিনিকে আসতেন। সঙ্গে সবসময় আধডজন রোগী— মনে হয় তারা সব ফাইমের পরিবারের কেউ। তার মুখে সব সময় হিন্দুস্থানি ডাক্তারদের জন্যে প্রশংসা। রোগীদের চিকিৎসা করিয়ে, ওষুধপত্র নিয়ে, আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি— "জিন্দা বিশি"— "বেঁচে থাক"— বলে চলে যেতেন। এই বুড়ির সঙ্গে ফাইমের কী সম্পর্ক তা আমরা কোনওদিন জানলাম না। তবে মনে হয় তিনি ফাইমের কোনও কাকিমা কি পিসি হতে পারেন বা হয়তো তিনি ফাইমের ভাইয়ের বাড়ির হাউসকিপার। যাই হোক না কেন, ফাইমের পরিবারের একজন অপরিহার্য সদস্য যে তিনি— তা বেশ বোঝা যেত। তাঁর সঙ্গে সবসময় দু-তিনটে গার্ড আসত।

একবার তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন নিজের জন্যে ওষুধপত্র নিতে। ওষুধ নিয়ে "জিন্দা বিশি" বলে হঠাৎ কাঁদতে বসলেন।

"আমার কোনও ছেলে নেই। তোমরা আমার জন্যে এত করো, তোমরা একদম আমার ছেলের মতো। তবে তোমরা তো এখানে আজন্মকাল থাকবে না। যখন চলে যাবে তখন কী হবে?" "জিন্দা বিশি"— বলে তিনি বোরখা দিয়ে মুখ ঢেকে রাস্তা পেরিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেলেন।

ইনি আমাদের স্বঘোষিত নতুন মাদার। সেই একই পরিস্থিতি— তবে এঁর সত্যিকারেই কোনও ছেলেপিলে নেই। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পরে অচেনা লোকের কাছে একটু সহানুভূতি— ব্যস, এইটুকুই তাঁর চাহিদা। একজন মাদার তো ছিলেনই, তাই এঁর নাম আমরা রাখলাম মাদার-টু।

মাদার-টু আমাদের খোঁজখবর নিতেন পলিক্লিনিকে এসে। একদিন

জানলেন যে এখান থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা অসুবিধেজনক হয়ে পড়েছে। সেদিন সন্ধেবেলা দুটো গার্ড আমাদের বাড়িতে এল। এ-কে ৪৭ উঁচিয়ে আমাকে আর ডা. বালাকে বাইরে ডেকে আনল। অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রাডো গাড়িতে বসাল— ভেতরে দেখলাম মাদার-টু বসে আছেন। তাঁর কথায় গাড়ি চলল; এসে দাঁড়াল শহরের একপাশে মার্শাল ফাইমের ভাইয়ের এস. টি. ডি আর ফ্যাক্সের দোকানের সামনে। আমরা দু'জনেই আধঘণ্টা ধরে ভারতবর্ষে কথা বললাম। পয়সা দেবার সময় মাদার-টু আমাদের হ্যাঁচকা টেনে গাড়ির মধ্যে বসিয়ে দিলেন। মায়ের ভালবাসার কোনও দাম হয় না।

খাওয়াদাওয়া কী করছি সে সবও জিজ্ঞেস করতেন।

"দুধটুধ খাও তো?"

"দুধ? দুধ কোথায় পাব?"

সেদিন সন্ধে থেকে আমাদের বাড়ির সব সদস্যের জন্যে একটা বিরাট ডেকচিভরা দুধ আসতে আরম্ভ করে দিল। মি. রঞ্জিত তো হাঁ। মাদার-টু নির্বিকার। ছেলেদের দুধ দিচ্ছেন তাতে আর জবাবদিহির কি আছে।

আরোসি

মাদার-টু আমাদের একটা নিমন্ত্রণ দিলেন। "মারশেল ফাইমের বোনের বিয়ে। তোমাদের আসতেই হবে। না গেলে আমি খুব দুঃখ পাব।"

"কিন্তু আমরা তো ওখানে কাউকে চিনি না। আর তুমি তো বুর্খা পরে বাড়ির ভেতরে থাকবে।"

. "তোমাদের ব্যবস্থা আর দেখাশুনো করার জন্য লোক থাকবে। খবরাখবর আমি পাব।"

আফগানিস্তানের বিয়ে-থার ব্যাপারে আমাদের কোনও ধারণা নেই। কী করতে হয়, বরযাত্রীরা ঢোল বাজিয়ে আসে কিনা, মসজিদে গিয়ে কোরান পড়ে মৌলবীর সামনে বিয়ে হয় কিনা বা কী ধরনের উপহার দিতে হয় সে সব ব্যাপারে আমরা একেবারে আনাড়ি। বাড়ির চাকররা বলল তালিবানদের সময় যখন বিয়ে-থা হত তখন সেখানে শোরগোল করা, গান বাজানো এমনকী ঝলমলে কাপড়-জামা পরাও বারণ ছিল। সেসব পালন না করলে অনেকের শাস্তি হত। মাঝে মাঝে বিয়ে হচ্ছে নাকি বাড়িতে কেউ মারা গেছে সেটা বোঝা যেত না। এখন নাকি তালিবানদের বিসর্জনের পরে অনেকেই সাহস করে হই-হল্লা করে বিয়ে করছে।

শুক্রবারে পলিক্লিনিক বন্ধ। আমরা সব ডাক্তাররা দুটো ট্যাক্সি বোঝাই করে রওনা দিলাম কার্তে পারওয়ানের দিকে। রাস্তায় মুর্গ ফারোসির কাছে দাঁড়ানো হল। পাশের রাস্তাটার নাম গুল ফারোসি বা ফ্লাওয়ার স্ট্রিট। এখানে পনেরো-কুড়িটা ফুলের দোকান আছে। তবে ফুল সব কাগজ বা প্লাস্টিকের। বেশ রঙিন রাস্তা। উপহার দেওয়ার জন্য এর থেকে অবিতর্কিত জিনিস কিছু হতে পারে না। আমরা একটা বিরাট ফুলের তোড়া নিয়ে মারশাল ফাইমের বোনের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

বাড়ির বাইরে অনেক গাড়ি রয়েছে। বেশ কয়েকটা বন্দুকধারী ঘুরে

বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে গল্প করছে লম্বা-চওড়া দাড়িওয়ালা সালওয়ার আর কোট পরা একগাদা মাঝ-বয়স্ক লোক। বাড়িতে কোনও সাজগোজ, গানের আওয়াজ বা শোরগোল নেই। গেট দিয়ে ঢুকেই দেখলাম একটা বিশাল উনুনে মাংস ভাজা হচ্ছে। আর তার পাশেই দুটো লোক বসে অজস্র নান তৈরি করছে। নানের পর্বতের কাছেই একটা বড় মতো জুতোর পাহাড়। অতিথিরা সেখানে জুতো খুলে ঘরে ঢুকছে। আমরা একটু কিন্তু কিন্তু করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি হঠাৎ একটা লোক আমাদের ভেতরে আসতে বলল। আমরা ঘর দিয়ে ঢুকে দোতলায় গিয়ে একটা কার্পেট পাতা কামরায় গিয়ে বসলাম। আসে-পাশের ঘরগুলোয় লোকজন বসে আছে। এরা সবাই হালকা আওয়াজে গল্প করছে। দু-একটা বাচ্ছা এখান-ওখান দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মহিলা বা ছোট মেয়ে অনুপস্থিত। আমরা যেতেই সব ঘরগুলোতে একটা আলোড়ন পড়ে গেলো। বিদেশি বিশেষ করে হিন্দুস্থানি এসেছে জেনে ছেলে-বুড়ো সবাই আমাদের বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল। ছেলের বাবা নিজে এসে আমাদের ব্যবস্থাপনার তদারকি করে গেলেন। আমরাও ভীষণ কায়দায় "হেঃ হেঃ! ভাল তো? কী খবর?" ইত্যাদি বলতে বলতে আলাপ করলাম। তবে আমরা যে কোন পক্ষের সেটা বোধহয় উনি ঠাহর করতে পারলেন না।

আমাদের ঘরে অনেক লোক কার্পেটে বসে দস্তরখান বিছিয়ে পোলাও, নান, মাংস, স্যালাড, কমলালেবু আর পেপসি দিয়ে ভোজ করছিল। কেউ দাড়ি কামানো কোট পরা, কেউ বা দাড়িওয়ালা সালওয়ার ও পাখোল পরা। এক অপরের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলছিল না— হয়তো এরা তার পাশের লোকটাকে চেনেই না। আমরা ফুলের তোড়াটাকে পাশে রাখলাম— সেটা কাকে দেওয়া হবে আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। রেওয়াজ মতো সবাই একটা থালা থেকেই খায়। তবে আমরা বিদেশি বলে আমাদের দশ জনের জন্য পাঁচটা থালা এল। আমাদের জন্য পোলাও, নান, মাংস ছাড়া কোর্মাও এল। খাবার মাঝখানে ছেলের বাবা আবার আপ্যায়ন করতে এলেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে ফুলের তোড়াটা তার হাতে গুঁজে দিলাম। তিনি তো আহ্লাদে আটখানা।

এখানকার বিয়েকে "আরোসি" বলা হয়। দুই পরিবারের কথাবার্তা পাকা করে মৌলবীর অনুমতি নিয়ে বিয়ে ঠিক হয়। ছেলের বাড়ির লোকেরা সব

খরচাপাতি খাওয়া-দাওয়ার পয়সা দেয়। উপরন্তু তাকে কিছু নগদ টাকা "মেহের"— দিতে হয়। সাধারণ লোকেরা ষাট-সত্তর লাখ আফগানি "মেহের" দেয়। হিসেবে প্রায় হাজার দশেক টাকা। বড়লোকেরা অনেক বেশি "মেহের" দেয়। রেওয়াজটা অনেকটা মেয়েটাকে কিনে নেবার মতো। যাদের পয়সা আছে তারা বেশি "মেহের" দেয় আর তিন-চারটে "আরোসি" করে। এবং যাদের পয়সা নেই তাদের আর বিয়ে হয় না। বিয়ের পরে বউয়ের যদি কোনও দোষ পাওয়া যায় তা হলে মৌলবীর বোঝাপড়ায় তালাকের ব্যবস্থা হয়। সেক্ষেত্রে "মেহের"-এর টাকা ফেরত দিতে হয়। যদি তার বর মারা যায় তা হলে সাধারণভাবে তার দেওর বা ভাসুরের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়। তার বাচ্ছারা তখন কাকা বা জ্যাঠাকেই বাবা বলে মেনে নেয়। মেয়েরা নিজের মর্জি মতো বিয়ে করতে পারে না।

আমরা নীচে এসে একটা খোলা জায়গায় বসলাম। একবার ভাবলাম 'মাদার-টু'র সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু তিনি তো অন্দরমহলে। সেখানে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে এরা গলা কেটে ফেলবে। খোলা জায়গাটায় একরাশ লোকের জটলা। টেপ ও স্পিকার রয়েছে আর দড়ি ভাষায় দাদরা তালে গান হচ্ছে। একটা বয়স্ক লোক "ট্যামবোরিন" জাতীয় একটা বাজনা নিয়ে হেলেদুলে তাল দিচ্ছে। ভিড়ের একপাশে একটা গোবেচারা মতো কাঁদ-কাঁদ মুখ করা কোট পরা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। এমনকী বাচ্ছারাও তাকে ঠেলে দিচ্ছে। এই হচ্ছে বর!! যার "আরোসি" হচ্ছে।

ডা. বালা বলল, "বেচারার মেহের দিয়ে অবস্থা ফাঁক হয়েছে তার ওপর রক্ষামন্ত্রীর ভাগ্নীর সঙ্গে বিয়ে!!"

আমাদের দেখে লোকেরা মহা উল্লাসে হইহই করে তাল দিয়ে গান গাইতে লাগল। বিয়ে-বাড়ি জমে উঠল। তালিবানরা গেছে, বিয়েতে হিন্দুস্থানিরা এসেছে এর থেকে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। মার্শাল ফাইমের একজন খাস লোক এসে আফগানির তোড়ার বর্ষণ শুরু করল। চারদিকে টাকা ছড়িয়ে পড়ল। বাচ্চা বুড়ো সবাই হুড়োহুড়ি করে টাকা তুলতে ব্যস্ত। এক দাড়িওয়ালা আধবুড়ো হাত তুলে নাচতে নাচতে বেসামাল হয়ে জোয়ানদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেকের উল্লাসের পরে আমরা আফগানি 'আরোসি'র ঘটনাস্থল

থেকে বিদায় নিলাম। "আশাকরি ভাল করে খেয়েছেন, যদি কোনও গাফিলতি হয়ে থাকে তা হলে ক্ষমা চাইছি" ইত্যাদি সবরকমই বলা হল আমাদের। আমরাও ঘাড় নেড়ে— "না না সেকি কথা!" বলে জবাব দিলাম। সবই ভারতীয় কায়দায়, তফাৎটা শুধু এই— মাথা নত করে ক্ষমা চাইছিলেন ছেলের বাবা!!

মেয়ের বাবার টিকিটাও কোথাও দেখা গেল না।

গণ্ডগোল

একদিন বিকেলবেলা যখন আমরা চা খাচ্ছি হঠাৎ আমাদের বাড়িওয়ালা গার্দেজি দড়াম্ করে দরজা খুলে ঢুকল। ধপাস্ করে একটা চেয়ারে বসে বলল, "তোমরা চা খাচ্ছ! এদিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তোমাদের চিন্তাই নেই।" ভাঙা দরি ও উর্দুতে বলল তবে লড়াই ও যুদ্ধ কথাটা আমরা বুঝতে পারলাম।

"যুদ্ধ কোথায়? কার সঙ্গে?" তারজুমান— হাবিবউল্লাকে ডেকে আনা হল।

গার্দেজি বলল, "আমাদের যেখানে বাড়ি 'গার্দেজ', সেখানে প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। ওসব অঞ্চলে অনেক পাস্তুন আছে। তবে গার্দেজে বেশির ভাগ লোকই তাজিক। গার্দেজের যে গভর্নর— পাচা খান, সে একজন পাস্তুন, সে কিন্তু আদৌ গার্দেজের লোক নয়। মার্শাল ফাইম তাকে গার্দেজে বসিয়েছে। গার্দেজের একজন তাজিক কমান্ডার লোকজন জোগাড় করে গভর্নরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। সে এখন গভর্নর হতে চায়। ব্যস— ফাটাফাটি লেগে গেছে। গোলাগুলি তো চলছেই, রকেটও চলছে। চল্লিশজন মতো মারা গেছে। বেশির ভাগই পাচা খানের লোক। পাঁচ-ছ'জন গার্দেজের লোক।"

আমরা তো হাঁ। এ আবার কি উটকো বিপদ।

"পুলিশ মিলিটারি কিছু করছে না?"

গার্দেজি অট্টহাসি দিয়ে প্রায় মাটিতেই পড়ে গেল— "কীসের পুলিশ? কোথাকার মিলিটারি? কোন জগতে আছ তোমরা? আমাদের অঞ্চলে যার বন্দুক আছে সেই সব— সেই পুলিশ সেই মিলিটারি।"

গার্দেজির কথা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না। নিজে তো কাবুলে বসে আছে। মনে হয় কোনও খুচখাচ ঝগড়াঝাটি হয়েছে, এক-দুটো

লোক ঘুষোঘুষি করেছে। সেই খবরটাই তিল থেকে তাল হয়ে গার্দেজির কানে পৌঁছেছে। এরকম কি হয় নাকি? গভর্নরের জাতি পছন্দ হল না। তাই বন্দুক তুলে গোলাগুলি শুরু করে দিলাম। অবশ্য বলাও যায় না। আফগানিস্তানের ইতিহাসে এরকম তো অনেকবার হয়েছে।

পরের দিন 'বি-বি-সি'-তে খবর পেলাম। গার্দেজে দুটো বিপরীত দলের মধ্যে লড়াই লেগেছে। কুড়িজন মৃত, সেরকম সংখ্যাই আহত। অবস্থা খুব খারাপ। আমেরিকান সৈনিকরা সেখানে পৌঁছেছে।

গার্দেজির খবর তা হলে ঠিক। তার আর কোনও উচ্চবাচ্চ নেই। লোকটা কি তড়িঘড়ি করে গার্দেজ চলে গেল? মারা পড়বে তো!

আফগানিস্তানের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। একটা আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি আমরা সবাই। দড়াম করে যে কোনও সময় ফাটতে পারে।

সংকটে

এখানকার অবস্থা যে মোটেই ভাল নয় সেটা একদিন বোঝা গেল।

আফগানিস্তানের সিভিল এভিয়েশান মন্ত্রী— আবদুর রহমানকে কেউ বা কারা হত্যা করেছে। আর ঘটনাটা ঘটেছে একেবারে কাবুল এয়ারপোর্টের ভেতরে। মন্ত্রী নাকি প্লেনে চেপে ভারতবর্ষ যাচ্ছিলেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। একদল হাজি চার-পাঁচ দিন ধরে মক্কা যাবার প্লেনের জন্য অপেক্ষা করে করে ধৈর্য হারিয়ে খাপ্পা হয়ে মন্ত্রীর প্লেনে ঢুকে তাঁকে মেরেছে। এয়ারপোর্টের গার্ডরা তাদের আটকাতে পারেনি।

গল্পটা একেবারে হজম হল না। হাজিরা মোটামুটি বয়স্ক লোক হয় আর তীর্থ করতে গিয়ে এরকম কাণ্ড করবে বলে মনে হয় না। আসল গল্পটা আমরা দু'দিন পরে ফিসফিস করে এর-তার মুখে শুনতে পেলাম।

আবদুর রহমান এককালে মাসুদের সঙ্গে মিলে তালিবান ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এখানে নতুন সরকার গঠনের সময় সে হমিদ কারজাইয়ের দলে যোগ দেয়। যখন সে প্লেনে বসেছিল তখন নাকি একদল লোক তার প্লেন আটকে ছিল। ঘণ্টা দেড়েক ধরে সে প্লেনে বন্দি ছিল এবং তখন আক্রমণকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিল। তারা ওঁকে মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দিতে বলছিল। আবদুর রহমান তাতে রাজি হয়েছিল কিনা জানা নেই তবে ঘণ্টা দেড়েক পরে তাকে ছুরি মেরে হত্যা করে প্লেন থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তারা যে হাজি নয় সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকেই বলল এতে পুরনো তালিবানের লোক বা পাকিস্তানের হাত থাকতে পারে।

আশ্চর্য ব্যাপার! দেশের একজন মন্ত্রীকে এতক্ষণ ধরে আটকে রাখা হল আর তারপর তাকে মারা হল কাবুল শহরের মধ্যে অথচ পুলিশ, মিলিটারি বা সরকারের কোনও লোক তাকে বাঁচাতে এল না। বিদেশি আমেরিকান আর ব্রিটিশ সৈনিকরাও কিছুই করল না। তারা কি জানতে পারেনি না জানতে

দেওয়া হয়নি! এসবের পেছনে কি সরকারের ও কোনও হাত আছে? নবগঠিত সরকার কি কিছু লুকোতে চাইছে? নাকি পুরনো তালিবান হোমরা-চোমরার ভয়ে এসব করা হচ্ছে।

ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক!! আবদুর রহমান ভারতের ভক্ত ছিলেন। তালিবান ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কথা বলতেন। ভারত সরকারের এই খবরটা মোটেই ভাল লাগবে না।

আমাদের তো লাগলই না। যে দেশে একজন মন্ত্রীকে এভাবে মারা যেতে পারে সে দেশে নিরাপত্তার কি কোনও মূল্য আছে?

'বিবিসি'-তে আবদুর রহমানের শোকযাত্রা দেখাল। অথচ ব্যাপারটার বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

দু'দিন পরে তারা খবর দিল একজন আফগানি নাকি কাবুল শহরে কিছু ব্রিটিশ সৈনিকের ওপর আক্রমণ করেছে। পালটা গুলি চালাতে আফগানিটি মারা গেছে।

পরের দিন হাসপাতালে গিয়ে আসল খবরটা জানা গেল। একজন আফগানি তার গর্ভবতী স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্যাক্সি না পাওয়ায় সে একটা সৈনিকদের গাড়িকে হাত নেড়ে সাহায্য চাইছিল। ব্রিটিশ সৈনিকরা কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তার ওপর গুলি চালায়। একটা নিরস্ত্র লোক কী করে আক্রমণকারী হতে পারে সে সব বোঝার চেষ্টা করেনি ওরা।

সাদা চামড়ার লোকেদের ওপরে আফগানিরা বিশেষ আস্থা রাখতে পারত না। যখন সৈনিকরা রাস্তা দিয়ে দৌড়ে বা জিপে করে যেত, ফুটপাথের আফগানিরা তাদের বেশ ঘেন্নার চোখেই দেখত। একবার একটা ট্যাক্সিচালক বলেছিল— "এই সাদা চামড়ার কুকুরগুলো আবার ফিরে এসেছে। যখন রুশিরা এসেছিল তখন আমরা এদের মেরে তাড়িয়েছিলাম। তাদের ট্যাংক কেড়ে নিয়েছিলাম। আমাদের দাদুর দাদু বলতেন তাঁরা ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের ঘোড়া নিয়ে নিয়েছিলেন। এইসব আমেরিকান সৈনিকদেরও মারব আমরা। একদিন এদের জিপ কেড়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।"

কেন বলেছিল বুঝতে পারিনি। তবে সাদা চামড়ার সৈনিকদের যে এদেশে প্রচুর ভোগান্তি আছে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।

ইউনাইটেড নেশানস

কাবুলে 'ইউনাইটেড নেশানস'-এর অফিসে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা নিরাপত্তার মিটিং হয়। আমরা একদিন সেখানে গেলাম। গেট দিয়ে ঢুকে দোতলা বাড়ির সামনে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ল্যান্ডরোভার, পাজেরো, ল্যান্ডক্রুসার ইত্যাদি বড় বড় সাদা গাড়ির ওপরে নীল দিয়ে 'ইউ এন' লেখা। সব গাড়িতে বড় বড় রেডিয়োর অ্যান্টেনা লাগানো। ভেতরে কাচের জানলাওয়ালা কার্পেট পাতা অফিসে বসে সাহেবরা কম্পিউটার, ফ্যাক্স নিয়ে কী সব করছে। সব ঘরে ঘরে ম্যাপ, চার্ট টাঙানো রয়েছে। আমরা একটা ঘরে গিয়ে বসলাম। পিটার ফক্স বলে একজন আমাদের মিটিং-এ আলোচনা করলেন।

পিটার ফক্স অনেক কথা বললেন। আমেরিকান সৈনিকদের সঙ্গে আল-কায়দার সৈনিকদের অনেক জায়গায় লড়াই চলছে। 'খোস্ত' অঞ্চলে যেটা এককালে বিন লাদেনের গড় ছিল, সেখানে নাকি ভালমতো গোলাগুলি, রকেটবাজি চলছে। কাছেই গার্দেজে পাচা খানের সঙ্গে তাজ মহম্মদ বারদাকের লড়াইয়ের ফলস্বরূপ চল্লিশজন মৃত। ওদিকে পুবে জালালাবাদে হাজি কাদির তার নিজস্ব রাজত্ব চালাচ্ছে। সেই 'ইউ এন'-এর লোকেদের সঙ্গে মিলে আফিমের চাষ বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সাধারণ গরিব লোকেরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠছে। অথচ এই লোকটা এক সময় কোটি কোটি ডলারের আফিমের চাষ করত।

দক্ষিণ কান্দাহারে গভর্নর গুল আঘা তালিবানদের সরকারে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। সেখানে নাকি এখনও গান-বাজনা নিষেধ ও প্রায়শই মারামারি লেগে থাকে। পশ্চিমে হেরাতের অবস্থা মোটামুটি ভাল। দিনে দু-একটা বোমা ফাটলেও ফাটতে পারে। কাবুলের ওপর এককালের বিরাট মুজাহিদ্দিন যোদ্ধা— গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ারের নজর আছে। সে যে কোনও দিন

কাবুলের ওপর আক্রমণ করতেও পারে। এখানকার গৃহযুদ্ধের সময় অর্ধেক কাবুলের ধ্বংস এই লোকটাই করেছিল।

সবচেয়ের অসুবিধে উত্তরে। আবদুর রসিদ দোস্তামের জুমবায়াসির দলের সঙ্গে উস্তাদ আটা মহম্মদের জামায়তি দলের প্রায় যুদ্ধ লেগে যাচ্ছিল। শালগরা আর শারেপুল বলে দুটো জায়গায় নাকি দুই দল মহাভারতের যুদ্ধের মতো ট্যাঙ্ক সৈনিক রকেট বন্দুক নিয়ে মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল। অবশেষে 'ইউ এন'-এর লোকেরা গিয়ে তাদের ঠান্ডা করে। ওসব অঞ্চলে 'ইউ এন'-এর লোকেরাও খুন হয়েছে। একজন ফ্রান্সের মহিলাকে কারা সব উঠিয়ে নিয়ে গেছে বন্দুক দেখিয়ে। 'ইউ এন'-এর মাজার-এ-শরিফের অফিস হয়তো তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের গা ছমছম করে উঠল। এসব লোকেদের অনেককে তো আমরা চাক্ষুষ দেখেছি। রাত্রিবেলা একলা ট্যাক্সি নিয়ে উত্তর আফগানিস্তানে ঘুরেও বেড়িয়েছি। সেরকম তো কিছু বুঝতে পারিনি? এদেশের ভবিষ্যৎ কি? আমেরিকান সৈনিকরা কি পুরোপুরি তালিবান ও আল-কায়দাকে ধ্বংস করতে পারবে? মনে তো হয় না!

পিটার ফক্স মিটিং শেষ করলেন।—

"At the end of it all, it seems peace is a long way off in Afghanistan."

সার্জারি

পলিক্লিনিকে আমরা রুগি দেখি। ওষুধ দিই। তবে অপারেশন করবার সেরকম ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। ইন্দিরা গাঁধী হাসপাতালে অনেকবার দৌড়ঝাঁপ করে এটাই বোঝা গেল যে ওখানকার ডাক্তাররা আমাদের মাধ্যমে ওদের হাসপাতালের জন্য জিনিসপত্র চায়। সেখানে আমাদের নিজেদের অপারেশন করা বিশেষ সুবিধে হবে না। তা ছাড়া হাসপাতালের বাকি সুযোগ-সুবিধে ওদের হাতেই থাকবে। ওয়ার্ড, নার্স, ওষুধ, ল্যাব, এক্সরে সবই ওদের কথায় চলবে। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছুরি ঘোরালেই তো সার্জারি হয় না। আমরা ঠিক করলাম যে আমাদের নিজস্ব কোনও হাসপাতাল যতদিন না হয় ততদিন অপারেশন করা মুশকিল। অতএব পলিক্লিনিকে বসে সকাল থেকে বিকেল অবধি শুধু রুগিই দেখো।

দূতাবাসে অ্যাম্বাসাডারের একটা নখকুনি হল। দু'-তিন দিন তিনি ডা. নাথের কাছে ওষুধপত্র নিলেন। বিশেষ লাভ হল না। আঙুলের ডগা ফুলে কলাগাছ আর নখের পাশে পুঁজের ঢিপি হল। অপারেশন করাতেই হবে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল। আমাদের ঘরের সোফায় শুয়ে অপারেশন হবে। এর চেয়ে পরিষ্কার জায়গা আর পাওয়া গেল না। আমার কাছে একটা ব্লেড, ছোট কাঁচি, একজোড়া ফরসেপ, একটা ছোট কিডনি ট্রে আর কিছু সেলাই করার সরঞ্জাম। এছাড়া ক্রিম, লোশন, স্পিরিট— ব্যস এই আমার 'অপারেশন থিয়েটার'। হ্যাঁ গ্লাভসও ছিল। শুরু হল কারসাজি। ডা. বালা প্রথমে ব্যথা কমানোর ও আরেকটা ইঞ্জেকশন দিলেন যেটা হৃদয়কে সুরক্ষিত রাখে। আঙুলটা ধুয়ে অপারেশন শুরু হল। অ্যানাসথিশিয়া এমনকী লোকালেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। চামড়া কেটে পুঁজ বার করা হল। অ্যাম্বাসাডারের সহ্যশক্তি বেশ ভাল। মাঝে মাঝে উঃ, আঃ করছিলেন। বাকি সময়, "চালিয়ে যাও তোমার হাত বেশ ভাল।" বলে বেঁকা হয়ে সোফায় শুয়েছিলেন। দশ

মিনিট পরে যখন পুঁজ ধুয়ে, মরা চামড়া কেটে, ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করা হল, সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পেছনে ঘুরে দেখলাম বাকি তিনজন ডাক্তার, তিনজন কম্পাউন্ডার, মি. রঞ্জিত, দূতাবাসের দু'জন লোক অ্যাম্বাসাডারের চালক, আমাদের রান্নার লোক হাবিবউল্লা, সবাই পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ঘুরে তাকাতেই সবাই একটা শুকনো হাসি হেসে লজ্জিত মুখে এদিক-ওদিক চলে গেল। সবার মুখে যেন একটা ভাব— এটা আর এমনকী বড় ব্যাপার। অত চিন্তার কি আছে?

অ্যাম্বাসাডার ধন্যবাদ জানালেন। বললাম, "এটা তো খুব ছোট অপারেশন। যদি আমাদের মধ্যে কারুর অ্যাপেনডিসাইটিসও হয় তাহলে কি করা হবে?"

মুখে শুধু বললেন, "হুঁ"। তবে উনি যে বেশ চিন্তিত হলেন সেটা বোঝা গেল।

আফগানিস্তানের প্রথম অপারেশন সাফল্যপূর্বক শেষ হল।

অ্যাম্বাসাডার নড়ে-চড়ে উঠলেন। এদিক-সেদিক কথা বলে একটা ভাঙাচোরা হাসপাতালে আমাদের দু'জনকার জন্য ও পি ডি, ওষুধের ভাণ্ডার, অপারেশন থিয়েটার আর ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করলেন। কোহেমার্কাস বলে এই হাসপাতালে আফগানিস্তানের মিলিটারির 'খাদ'-এর লোকেদের চিকিৎসা হত। ভারতবর্ষে যেরকম 'আর-এ-ডব্লু', পাকিস্তানে যেমন 'আই এস আই', আমেরিকায় যেরকম 'সি আই এ', আফগানিস্তানে সেরকম 'খাদ'। এখানে এতকাল যুদ্ধ ও সরকার ওলোট-পালটের পরে এই হাসপাতালটাও ত্রিশঙ্কুর মতো হয়ে গেছে। কার চিকিৎসা করবে? টাকা কোথা থেকে আসবে? কিছুই জানে না। আমরা সেই হাসপাতালে এবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করব।

পলিক্লিনিকে যখন খবর দিলাম আমি ও ডা. বালা কোহেমার্কাসে কাজ করব, তখন অনেকেই নারাজ হল। ডা. বালার সঙ্গে থাকত একটা মেয়ে তারজুমান, নাম রুবিনা। সে তো রেগে ক্ষেপে একসা। জেদ ধরে বসল সেও কোহেমার্কাস যাবে। তাকে অনেক করে বুঝিয়ে আমার তারজুমান নাসিরকে নতুন হাসপাতালে রাখা হল।

পলিক্লিনিকের বেশ কিছু ওষুধের বাক্স ট্রাকে করে কোহেমার্কাস নিয়ে যাওয়া হল। ভারতবর্ষ থেকে অপারেশন থিয়েটারের জিনিসপত্রের ফিরিস্তি আনতে বলা হল। সেসব আসার পরেই অপারেশন শুরু হবে। এরপর আরম্ভ

হল কুলিগিরির কাজ। প্রত্যেক দিন সকালে আমরা দু'জন ডাক্তার, দু'জন 'ও.টি.' বয়, চালক কাইয়ুম ও নাসির হাসপাতালে এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে ওষুধের বাক্স খুলে খুলে সমস্ত ওষুধ তাকে সাজাতে লাগলাম। হাসপাতালের কিছু আফগানি সাহায্য করতে এল বটে কিন্তু বিশেষ সুবিধে হল না। বেচারারা তো ইংরিজি জানে না। যারা একটু চালাক-চতুর তারা হয়তো ওষুধগুলো পকেটে করে হাপিস করে দেবে। ভারতীয় ওষুধের এখানে খুব চাহিদা।

কনট্রাকটারকে বলে ওটি আর তার আসেপাশের ঘরের মেরামত শুরু হল। ঘরদোরের প্লাস্টারিং, এ সি, আলোর ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতির শুচিকরণের ব্যবস্থা, ওয়ার্ড ইত্যাদি সবই করতে হল। ডাক্তারি ছেড়ে আমরা রীতিমতো হাসপাতালের নির্মাতা হয়ে গেলাম।

কোহেমার্কাসের ডাক্তারদেরও উৎসাহের ঘাটতি নেই। তারা প্রায়শই আমাদের নির্মাণের কাজে এগিয়ে আসত। এতদিন পরে তাদের হাসপাতালটার একটু উন্নতি হবে। এদের নিজস্ব একটা ভাঙা ওটি ছিল। একদিন হাসপাতালের সুপার যিনি নিজে একজন সার্জন— আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেন।

"একটা কেস আছে। এক মহিলার বারবার ম্যালেরিয়া হয়ে স্প্লিনটা বিশাল বড় হয়ে গেছে। ওটাকে বাদ দিতে হবে।"

"তা হলে বাদ দিয়ে দিন।"

"আসলে এরকম অপারেশন আমি আগে করিনি, আপনি কি আসতে পারেন?"

আমি রাজি হলাম। তবে একটু বুকটা দুরদুর যে করছিল না, তা নয়। এত মাস পরে অপারেশন করব তাও আবার কারুর আহ্বানে। তা ছাড়া হিন্দুস্থানি বলে একটা ইজ্জত তো আছে। সারা দেশের নাম না ডুবে যায়! কেস খারাপ হলে তো এটা কেউ দেখবে না যে যন্ত্রপাতি বা ওষুধপত্র খারাপ ছিল। সার্জেনই গাল খাবে। অ্যাসিসট্যান্ট, নার্স, কেউই ভাল হিন্দি বা ইংরেজি জানে না। রক্ত দেবার জন্য ব্লাড ব্যাঙ্কের কোনও বালাই নেই। নানারকম চিন্তা মাথায়। শেষে "যা থাকে কপালে" বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম অপারেশনে।

কেস শুরু হল। চারদিকে আফগানি ডাক্তার, নার্স, ও.টি. বয়। তাদের মধ্যমণি আমি। ছুরি চলল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে স্প্লিন বেরিয়ে অপারেশন শেষ

হল। এক বোতল রক্তও লাগল না। সুপার ভীষণ বিগলিত হয়ে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "হিন্দুস্থানি ডাক্তার খুব অস্ত্! ভেরি গুড সার্জারি।"

কোহেমার্কাসে আমাদের দিন কাটতে লাগল। ওষুধের ডিপো সাজানো হয়ে গেল, ও.টি. প্রায় তৈরি। তারই পাশে আমরা নিজস্ব ও.পি.ডি শুরু করলাম। ওষুধ বিতরণও আরম্ভ হল। কিন্তু ও.টি.-র যন্ত্রপাতির কোনও দেখা নেই। ভারতীয় দূতাবাসে খোঁজ করলেই জবাব আসে— এই এল বলে। হাসপাতালে লোকেরা সার্জারি করাতে এসে বেজার হয়ে ফিরে যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় তারা যেন আমাদের আড়ালে হাসাহাসি করছে। তাদের না হাসার অবশ্য কারণ কিছু খুঁজে পেলাম না। ভারতবর্ষের সুন্দর ছবিটা মরীচিকার মতো হাসপাতালের লোকের সামনে থেকে উবে যেতে লাগল। আমরা তখন নিরুপায়— দেশের সম্মান বোধহয় বাঁচানো গেল না। বেগতিক দেখে হাসপাতালের সুপার আর রোগীদের নজর থেকে দূরে পালাতে লাগলাম। নানা অজুহাত চলল। আজ মিটিং আছে, কাল পলিক্লিনিক যাচ্ছি, পরশু ক্যাম্প আছে ইত্যাদি। অবশেষে একদিন ভারতবর্ষ থেকে প্লেনে করে আমাদের জন্য ও.টি.-র জিনিসপত্র এল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার তা হলে কাবুলে ভারতীয় ডাক্তাররা সুষ্ঠু ভাবে অপারেশন শুরু করবে।

প্রথম রুগি এল আমাদের কাছে অপারেশন করাতে। বিরাশি বছরের মহিলা যার পেটের সামনের দিকে একটা বড় হারনিয়া। পেটের মাসেল খুলে হারনিয়া সারাতে হবে। ডা. বালা তাকে পরীক্ষা করে সুস্থ ঘোষণা করল। আমাদের ওটি বয় পিটার তখন বাড়ির রান্না-বান্না ছেড়ে ওটি-র কাজে মগ্ন। সে আর সুদীপ্ত অপারেশন করার জন্য ছটফট করছে।

নির্দিষ্ট দিনে কেস হল। হিন্দুস্থানি ডাক্তারের অপারেশন দেখতে সারা হাসপাতালের ডাক্তাররা এল। অপারেশন শেষ হওয়াতে সবাই হাততালি দিয়ে করমর্দন করল। বলিউডের ক্লাইম্যাক্স একেবারে!!

রুগি বাড়ি চলে গেল। সাতদিন পরে আবার এল। তার মনে দুঃখ— হিন্দুস্থানি ডাক্তারদের সে ভাল করে ধন্যবাদ জানাতে পারছে না। তাই আমাদের তার বাড়ি যেতে হবে দুপুরের ভোজ খেতে। আমরা তো পা বাড়িয়েই আছি। বাড়ি খুঁজে যখন ভেতরে ঢুকলাম তখন দেখি হাসপাতালের সুপার, তিন-চারজন আফগানি ডাক্তার, ঝাড়ুদার, ওটি নার্স সবাই এসে

হাজির। বুড়ির বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। অনেক সদস্য পাকিস্তানে ও জার্মানিতে থাকে। পাকিস্তানে অপারেশন করাতে পারত কিন্তু হিন্দুস্থানিদের ওপর অগাধ বিশ্বাস তাই এখানে অপারেশন করাল। বাড়ির সদস্যরা বেশ কেতাদুরস্ত। বুড়ির মেয়ে হাসপাতালের সুপারের সামনে শার্ট ও স্কার্ট পরে সিগারেট খেতে শুরু করল। আফগানি বয়দের চক্ষু চড়কগাছ; আমরাও হাঁ! তালিবানরা যাবার পরে একেবারে নরক গুলজার। বাড়ির মধ্যে বোরখার কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

ভোজ শুরু হল। কাবুলি, অশাক, তরকারি, কাবাব, ডাল, স্যালাড, নান আর সবশেষে ফিরনি। দস্তরখান বিছিয়ে আমরা সব হইহই করে হামলে পড়ে খেতে লাগলাম। দুরে খাটে বসে বুড়ি খাবারের তদারকি করল।

বাড়িওয়ালা

রোজকার একঘেয়ে কর্মসূচির মধ্যে এক-আধটা উদ্ভট পরিস্থিতি ঘটত। এবারেরটা মনে হল বেশ জটিল।

প্রায় মাস চারেক হয়ে গেছে আমরা আমাদের বাড়িতে গুছিয়ে বসেছি। একদিন দুপুরে সবাই যখন টিভি দেখছি তখন ঘরের বাইরে একটা বড় ছায়া দেখা দিল। ঘরে ঢুকল একটা বিশাল চেহারার মানুষ। ছ' ফুটের বেশি লম্বা, চওড়া বুক, মাথায় কালো পাগড়ি, থুতনিতে একগাদা দাড়ি, পরনে জোব্বা ও ওয়েস্টকোট, হাতে সেলুলার ফোন। এ লোকের নাম গার্দেজি—এই বাড়ির আসল মালিক। এর আগে যে লোকটা 'গার্দেজি' বলে আসত সে এর ভাই। দাদার হয়ে সে বাড়ি-ঘরের দেখাশোনা করত। সে গড়নে এর চেয়ে অনেক ছোট।

বড় গার্দেজি আমাদের সঙ্গে করমর্দন করল। মনে হল যেন একটা বস্তা এসে ধপাস করে হাতে পড়ল। ডা. বালার মুখটা দেখে বুঝলাম তার হাতটা মুচড়ে গেছে। বড় গার্দেজি সোফায় বসল। সোফাটা একপাশে হেলে গেল। তলার স্প্রিংগুলো ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠল। চেহারাটা একেবারে জটায়ুর গল্পে "প্রখর রুদ্র"র মতো— উচ্চতা সাড়ে ছ' ফুট, ছাতি ছেচল্লিশ, কোমর বত্রিশ, কবজি সাড়ে আট। আমাদের চেহারার সঙ্গে একদমই মিলল না— আমাদের ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি!

বড় গার্দেজি সঙ্গে তার গোমস্তাকে নিয়ে এসেছিল। ফাইলপত্তর খুলে দরি ভাষায় গমগম আওয়াজে কথা শুরু করল। আমাদের বাবুর্চি তারজুমান তার অনুবাদ করে দিল।

বড় গার্দেজির বাবা গার্দেজ থেকে এখানে চলে আসতে চায় কারণ ওখানকার অবস্থা ভাল নয়। এখানে আর বাড়ি খালি নেই তাই ও এই বাড়িতে থাকবে। সেক্ষেত্রে আমাদের এ বাড়ি মাসখানেকের মধ্যেই খালি করে দিতে

হবে। ছ' মাসের অ্যাডভান্স যেটা দেওয়া হয়েছিল তার বাকিটা সে ফেরত দেবে।

এই বলে সে আমাদের দিকে হাসিমুখে তাকাল। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বাড়ি ছেড়ে দেব? যাব কোথায়? খাবই বা কী? কাগজপত্র অনুযায়ী আমাদের তো এখানে এক বছর থাকার কথা! এখানে তো কোর্টকাছারিও নেই যে উকিলকে বলব!

বড় গার্দেজিকে অনেক বোঝানো হল— আমরা তোমার মেহমান, এখানে এসেছি তোমাদের সেবা করতে, আমাদের আর কোনও থাকবার জায়গা নেই, হিন্দুস্থানিরা আফগানিদের পুরনো দোস্ত ইত্যাদি। সেসব কথা ধৈর্য ধরে শুনে বলল, "সে সব তো ঠিকই, তোমরা তো সারা দেশের মেহমান, কিন্তু আমার বাবার কী হবে?" এই বলে সে ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে কাগজপত্র নিয়ে চলে গেল।

এবার উপায়? মি. রঞ্জিত বললেন, "আসলে ওর এখন অনুতাপ হচ্ছে। যখন ওর ভাই এই বাড়ি ভাড়া দিয়েছিল তখন এই বাড়ির ভাড়া কম ছিল। তাই এই বাড়ি ১৫০০ ডলারে পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন এখানে এত বিদেশি এসেছে যে বাড়ির ভাড়া বেড়ে কম করে তিন-চার হাজার ডলার হয়েছে। ও নিশ্চয়ই আমাদের তুলে অন্য ভাড়াটে বসাবে।"

আমাদের বাবুর্চিও তাতে সায় দিল।

"গার্দেজির বাবার মতো বৃদ্ধ মানুষ কখনওই তার ঘর-বাড়ি, গ্রাম ছেড়ে অচেনা শহরে আসতে রাজি হবে না। সবার জন্যই তার দেশের মাটি খুব প্রিয়।"

সত্যি তো। গার্দেজি মনে হচ্ছে মোক্ষম চাল চেলেছে। বাবার গল্পটা বোধহয় সম্পূর্ণ বানানো। মোটমাট বাড়ির ব্যাপারটা যে বেশ গণ্ডগোলের হবে সেটা বোঝা গেল। দূতাবাসকে বললে তারা হয়তো বলবে অন্য বাড়ি দেখে নাও। কিন্তু ভদ্রস্থ বাড়ি যে আর পাওয়া যাবে না সেটা আমরা জানি। আর বড় গার্দেজির সঙ্গে মারামারি করে পারা যাবে না। সে তো এক ঘুষিতেই আমাদের চারজনকে কাত করে দেবে।

কী করা যায়?

মানুষ যখন প্রচণ্ড বেগতিকে পড়ে তখন দু'জনকে ডাকে— তার মা আর ভগবান। আমরা প্রথমজনকে ডাকলাম।

পলিক্লিনিকে খবর দিয়ে মাদার-টুয়ের সঙ্গে দেখা করা হল। বড় গার্দেজির কথা, এক বছরের এগ্রিমেন্ট, পয়সার অ্যাডভান্স সব বললাম। কাঁদো কাঁদো মুখ করে বোঝানো হল আমাদের কীরকম হেনস্থা হতে চলেছে। সব শুনে মাদার-টু গম্ভীর মুখে বললেন, "ফামেদাম"—বুঝলাম।

কোহেমার্কাস হাসপাতালে আমরা যখন রুগি দেখতে ব্যস্ত তখন বাড়ি থেকে ফোন এল। মাদার-টুয়ের কোনও লোক এসেছে। সে গার্দেজিকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

ঘরে ঢুকে দেখি এক দাড়িওয়ালা লোক মাথায় পাখোল, পরনে স্যুট, চোখে মুখে রাগ-রাগ ভাব। এর নাম জুবের আর এ মার্শাল ফাইমের একজন শাকরেদ। এককালে মাসুদের সৈন্যদলে ছিল। আপাতত সে এক কাবুল মিলিটারি গ্যারিসনের হর্তাকর্তা। অতএব সরকারের বেশ উঁচু স্তরের লোক। এ আমাদের সহায়তা করতে এসেছে।

জুবের হিন্দুস্থান অনুরাগী। পকেট থেকে নোকিয়ার ঝকঝকে মোবাইলটা বার করে কোলের ওপর ফেলে বক্তৃতা শুরু করল।

"তোমরা সব আমাদের মেহমান। তোমরা আমাদের দেশের জন্য যা করছ, কোনও দেশ এরকম করে না। এই লড়াইয়ের দরুণ পৃথিবীর সব দেশ কোনও-না-কোনও স্বার্থ নিয়ে আমাদের সহায়তা করতে এসেছিল শুধু হিন্দুস্থান ছাড়া। আজ তোমাদের খিদমত করাটা আমাদের উচিত।" বক্তৃতার মাঝখানে বড় গার্দেজি তার গোমস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ছ' ফুট লম্বা-চওড়া লোকটা সোফায় বসতেই জুবের কথা বলতে বলতে তার দিকে আড় চোখে তাকাল। মনে হল বুঝতে পারল ও কে।

বক্তৃতার শেষে বড় গার্দেজি বাড়ি খালি করার কথা বলতে শুরু করল। জুবের তখন তার আসল চেহারা দেখাল। ভয়ংকর এক গলায় গার্দেজির ওপর বকুনির বর্ষণ শুরু করল। আমরা ভয়ে সোফার মধ্যে সেঁদিয়ে গেলাম। জুবের তার পুরনো বক্তৃতাটা আবার আউড়ে বলল, "তোমার 'এগ্রিমেন্ট' যখন এক বছরের তখন তুমি এদের জ্বালাতন করলে ভাল হবে না কিন্তু। আমার ফয়সালা এই যে এক বছরের আগে তুমি একটিও কথা বলবে না। আমার মেহমানরা যেন বাড়ির ব্যাপারে কোনওরকম অসুবিধেতে না পড়ে। ব্যস এই ব্যাপারটা এখানেই খালাস।"

এই বলে জুবের সোফার ওপরে হাতের চাপড় মেরে কথা বন্ধ করল। বড়

গার্দেজি হতবাক। সে হতভম্ব হয়ে জুবেরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এক মিনিট ধরে। মুখ দিয়ে কোনও বাক্য বেরোল না। ছ' ফুট লম্বা পাঠানের বাজখাঁই চেহারাটা নিমেষের মধ্যে চুপসে একটা ছ' ইঞ্চি ইঁদুরের মতো হয়ে গেল। দেখে মনে হল সে কেঁদেই ফেলবে। নিশ্চয়ই ভাবছিল এই হিন্দুস্থানিগুলো তো মহা "ইয়ে"। এই জুবেরকে আবার কোথা থেকে জোগাড় করে এনেছে।

জুবের তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, "আদালত মুলতুবি হল"। গার্দেজি মুখ চুন করে ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে প্রস্থান করল। শুকনো মুখে হ্যান্ডশেক করল। হাতটা বেশ নরম ও হিমশীতল লাগল।

আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মাদার-টুর উদ্দেশ্যে প্রাণভরে গাইলাম— "আমার মায়ের নামটি দয়াময়ী।"

নারী

কাবুলের অবস্থা একটু ভাল হয়েছে। রাস্তায় ঘাটে অনেক লোকজন বেড়েছে, ট্যাক্সি করে প্রচুর লোক অফিস, দোকানপাটে যায়। রাস্তায় অনেক মেয়ে দেখা যায়, বেশিরভাগই বুর্খা পরা, তবে কালো কাপড় পরা মাথায় হিজাব দেওয়া মেয়েও রাস্তায় চোখে পড়ে। রাস্তায় আগেকার থমথমে ভাবটা কেটে গেছে। ফুটপাথে দোকানির ভিড় বাড়ছে ধীরে ধীরে।

সাহেবদের সংখ্যাও বাড়ছে। অনেকেই আমেরিকান, ব্রিটিশ, কানাডিয়ান, রুশি সৈনিক। এরা সব এসেছে 'ন্যাটো' আর 'আইস্যাফ'— আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বাহিনীর তরফ থেকে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও হাফপ্যান্ট গেঞ্জি পরে কোমরে পিস্তল আর পায়ে ছুরি নিয়ে রাস্তায় দৌড়োদৌড়ি করে। এদের দেখে কাবুলের আফগানিদের চক্ষু ছানাবড়া!

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা কাবুলের পার্ক স্ট্রিট— মানে মুর্গ ফরোসি বা চিকেন স্ট্রিটে ঘুরছিলাম। দোকানগুলোর সামনে অনেক বিদেশি খদ্দের। এরা বেশিরভাগই সৈনিক তবে কিছু কিছু এনজিও-র লোকজনও রয়েছে। ডা. বালা হঠাৎ রাস্তার চৌমাথার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "ওই দেখো, দুটো মেয়ে মনে হয় ভারতীয়।" দূর থেকে দেখলাম দুটো মেয়ে একটা বইয়ের দোকানে ঢুকছে। একজন চিনা বা জাপানি। অন্যজন ময়লা, বেঁটে, সালোয়ার-কামিজ পরা। লম্বা কালো চুল। গায়ের রং ও পোশাক দেখে বোঝা গেল যে সে হয় ভারতীয় বা এশিয়ার অন্য কোনও দেশের মেয়ে।

আর যায় কোথায়? বিবাহিত পুরুষ মানুষদের এতমাস ধরে শুধু দাড়িওয়ালা আফগানি দেখে দেখে মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। জীবনটা শুকনো কড়কড়ে শিউলিপাতার মতো হয়ে গেছিল। আমি ও ডা. বালা বড় রাস্তার ছুটন্ত ট্রাফিক অগ্রাহ্য করে দৌড়ে চললাম বইয়ের দোকানের দিকে। মি. রঞ্জিত বয়স্ক লোক— তিনি একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে মুচকি

হাসতে লাগলেন। দোকানে ঢুকেই মেয়েটাকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কি ভারতীয়?"

"না আমি নই।"

মুখ দিয়ে অজান্তে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে পড়ল।

"কিন্তু... তোমাকে তো দেখতে একদম ভারতীয়দের...?"

"আমার বাবা-মা কর্ণাটক থেকে অনেক কাল আগে ফিলাডেলফিয়া চলে এসেছে। আমরা ওখানেই বসবাস করি। আমার জন্ম পড়াশুনো সব ওখানে। একটু-আধটু কন্নড় বলতে পারি, তবে ভারতের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ নেই।"

"ও তাই বলো।" আমরা যেন একটু স্বস্তি পেলাম।

মেয়েটার নাম সরোজা হানাসোগে, অন্যজনের নাম বুনি না ব্লুনি। এরা একদল মেয়ে আমেরিকার এক এনজিও-র সঙ্গে 'ইউ এন'-এর প্লেনে করে কাবুলের মেয়েদের দুরবস্থার বিচার-বিবেচনা করতে এসেছে। আমাদের একটু গল্প ফাঁদবার ইচ্ছে ছিল— মেয়েগুলো নীরসের মতো বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তারপর বলল, "আমাদের এক জায়গায় যেতে হবে, একটু তাড়া আছে। তোমাদের ঠিকানাটা দিয়ে দাও, সন্ধ্যাবেলা সময় পেলে আসব।"

আমরা বিশেষ পাত্তা পেলাম না।

বাড়ির দিকে রওনা দিলাম, ঠিক করলাম, এখন কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। শেষে ওরা যদি না আসে তখন বাকিরা আমাদের হাস্যাস্পদ মনে করবে। বেইজ্জতির সীমা থাকবে না।

সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ির ঘণ্টাটা বাজল। বাবুর্চি হাবিবউল্লা চোখ ঠিকরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, "জানানি আয়া, জানানি। আফগানি নি অস্ত্।" সরোজা আর ব্লুনি বাড়িতে ঢুকে এল। পিটার, সুদীপ্ত আর তিবারি বিস্ফারিত চোখে রান্নাঘর থেকে দেখতে লাগল। আলু কাটা বন্ধ হয়ে গেল, কড়াইয়ে তেল পুড়তে চলল। বাড়িতে মেয়ে এসেছে! তাও আবার বিনা বুর্খার একেবারে ফোরেন থেকে! ডা. রাও একমনে টিভি দেখছিল, তার হঠাৎ কী কাজ মনে পড়ে গেল। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডা. হরি চটি ফটাস ফটাস করতে করতে ওপর থেকে নীচে নামছিল। চটির আওয়াজ থেমে গেল। সে আস্তে আস্তে রিভার্স গিয়ারে মেয়েগুলোর দিকে চাইতে চাইতে করুণ মুখ করে ঘরে চলে গেল।

আমাদের বলার আগেই পিটার ঝপাঝপ চা, বিস্কুট, পাঁপড় নিয়ে চলে এল। আমরা নির্বিকারভাবে মেয়েদুটোর সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম।

ঘন্টাখানেক পরে মেয়েগুলো চলে গেল।

ন'টা নাগাদ যখন খেতে বসেছি তখন আবার ঘণ্টা বাজল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সরোজা আর ক্লুনি। সরোজা একটু বেচারা বেচারা মুখ করে বলল, "আসলে আমাদের বাড়িতে একগাদা কারা সব এসে গেছে, তাদের আমরা চিনিও না। কীসব বাজে খাবার রাখা রয়েছে টেবিলে। ওদিকে আমাদের বাবুর্চিও পালিয়ে গেছে। যাবার সময় মনে হল যেন রুটির গন্ধ পেলাম তাই ভাবলাম আর কি...।"

এবার ক্লুনি বলে উঠল, "তাই আমরা ঠিক করলাম আমরা নিজেরাই নিজেদের নিমন্ত্রণ জানাব তোমাদের বাড়িতে। মানে তোমাদের যদি কোনও...।"

"আরে না না কি বলছ? এ তো খুব আনন্দের ব্যাপার।"—সবাই হই-হই করে উঠল।

খাবারে ছিল রুটি, আলু-কড়াইশুঁটি, ডাল, ফুলকপির তরকারি, স্যালাড ও ক্ষীর। পিটার ও তিওয়ারি দৌড়ে দৌড়ে গরম রুটি সেঁকে সেঁকে মেয়ে দুটোকে খাওয়াতে লাগল। আমরা নিজেদের বাড়িতে হঠাৎ সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে গেলাম। খাবার মাঝে সরোজা ও ক্লুনি আমাদের দিকে তাকিয়ে লজ্জা আর দুষ্টুমি ভাব মেশানো হাসি দিল। রেওভাঁটের মতো এসে যে বেশ ভালই খাবার খাচ্ছে সেটা জানিয়ে দিল। বোধহয় ভাবছিল ভাগ্যিস বইয়ের দোকানে দেখা হয়েছিল।

খাবার শেষে যখন জানান দেওয়া হল যে পিটারের তদারকিতে সব খাবার তৈরি হয়েছে তখন সরোজা বলল, "ওকে কি আমরা ধরে নিয়ে যেতে পারি?" তাই শুনে পিটারের কালো মুখের ভেতর থেকে হলদে সাদা দাঁতগুলো ঝলমল করে উঠল। আহ্লাদে চোখটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাত দশটা নাগাদ সরোজারা বাড়ি গেল।

পরবর্তী দু'দিন সরোজা ও চারজন মেয়ে পলিক্লিনিকে যাতায়াত করল। কাঁধে ঝোলা, তাতে ক্যামেরা, স্ট্যান্ড ও নোটবই। এরা সব আফগানি নার্সদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করল। আমাদের তারজুমান জাবাদকে সরোজার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া হল।

ঘন্টা তিনেক পরে জাবাদ ঘামতে ঘামতে ফিরে এসে বলল, "দূর ছাই! কি বাজে ইন্টারভিউ! নার্সগুলো ক্যামেরা ও আমেরিকান মেয়ে দেখে এমন ঘাবড়ে গেল যে একটাও কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। এমনিতে তো পলিক্লিনিকে সবসময় বকবক করতে থাকে, তার ওপর সরোজার এক-একটা প্রশ্ন তিন-চার মিনিটের ছিল। সে সব অনুবাদ করতে আমার ঘাম ছুটে গেছে। নার্সগুলো প্রশ্নের জবাব দু'-তিনটে শব্দে দিল। মনে হচ্ছিল নার্সগুলোই সরোজার ইন্টারভিউ নিচ্ছে।"

"তা হলে সরোজা কী রিপোর্ট তৈরি করবে?"

"কে জানে? যা বুঝতে পারল তাই লিখবে, বাকিটা যা ও কল্পনা করবে।"

"আর সেই রিপোর্ট 'ইউ এন'-এ যাবে।"

বাঃ! ইন্টারভিউ তার মানে একদম খাঁটি হয়েছে। সারা পৃথিবীর লোক আফগানি মেয়েদের দুর্দশার কথা খুব ভালভাবে জানতে পারবে!

সরোজারা আমাদের বাড়ির হাঁটাপথের মধ্যেই একটা বাড়িতে থাকত। সেখানে একদিন বিকেলে গিয়ে দেখি নরক গুলজার। কম করে তিরিশ পাটি জুতো বাড়িতে খোলা রয়েছে। এরা সবাই ছেলে-মেয়ে, বুড়ো, জোয়ান— এ বাড়িতে থাকে। সবাই কোনও-না-কোনও এনজিও-র। কে আসছে, কে যাচ্ছে কোনও ঠিকানা নেই। একটা রাঁধবার লোক আছে, সে যা পারে তৈরি করে। যে যখন সময় পায় খেয়ে নেয় যা পায়। সরোজা ও ক্লুনি সাধে কি আর আমাদের বাড়িতে হা-ঘরের মতো এসেছিল?

আমাদের দেখে মেয়েগুলো ভীষণ উৎসাহিত হয়ে ঠান্ডা চা ও মিশমিশে জাপানি বিস্কুট খাওয়াল। বিষণ্ণ মুখে বলল, "আর কিছু নেই।"

অনেকক্ষণ ধরে গল্প-টল্প হল। সাধারণ আমেরিকানরা যে তাদের দেশের নেতাদের এই সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রক যুদ্ধের প্রতারণা পছন্দ করে না সেটা বুঝতে পারলাম। আমেরিকাই যে হাতিয়ার বন্দুক জুগিয়ে আতঙ্কবাদী তৈরি করছে সেটাও সবাই জানে।

দু'দিন পরে সরোজা আর মেয়েদের দল 'ইউ এন'-এর প্লেনে চেপে, পাকিস্তান হয়ে আমেরিকা ফিরে গেল।

বামিয়ান

সামনে দু'দিনের ছুটি। অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি, প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছিল। একটা জায়গায় না গেলেই নয়। আফগানিস্তানে এসেছি, অথচ সেখানে না গেলে লোকে ছি ছি করবে। আমরা বামিয়ান যাবার তোড়জোড় করলাম।

এখান থেকে বামিয়ান প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার। রাস্তাটা বেশ খারাপ, হিন্দুকুশ পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগবে প্রায় সাত-আট ঘণ্টা। বুদ্ধমূর্তিগুলো বামিয়ান উপত্যকার মধ্যে, একদম হিন্দুকুশের মাঝমধ্যিখানে। আর এইসব অঞ্চলের বেশিরভাগ লোকই হাজারা। এরা চিনেম্যান গোছের দেখতে, চেঙ্গিস খানের মোঙ্গল সৈনিকদের বংশধর। এরা বেশিরভাগই কুলি মজুরের কাজ করে। এইসব অঞ্চলে চেঙ্গিস খানের বর্বরতা প্রচুর ছিল; তারই সৈনিকরা পরে এখানে থেকে যায়। হাজারারা শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। এদের নেতারা সেইজন্যে ইরান থেকে সাহায্য পায়। এইসব কারণেই আফগানিস্তানের বাকি লোকেরা পস্তুন, তাজিক, উজবেক— কেউই হাজারাদের ভাল চোখে দেখে না। তালিবানদের আমলে যখন বেশিরভাগই হর্তাকর্তারা পস্তুন ছিল তখন তারা একসময়ে এক প্রধান হাজারা নেতাকে কথাবার্তা বলার ছলে হেলিকপ্টার করে উঠিয়ে আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছিল। হাজারারাও অবশ্য কিছু কম যায় না, প্রায়শই তাদের মধ্যে চেঙ্গিস খানের রক্তটা গরম হয়ে ওঠে। এদের অত্যাচারের গল্প বেশ ভয়াবহ। শত্রুকে ধরে তার বয়েস জিজ্ঞেস করে তাকে ন্যাড়ামাথা করা হয়। এরপর শত্রুর যত বয়েস ততগুলো মোটা পেরেক তার মাথায় পুঁতে দেওয়া হয়। তাতে যদি সে মরে তো ভাল, নয়তো সেই অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আরেক ধরনের অত্যাচার হাজারাদের খুব প্রিয়— ভূতের নাচ। শত্রুর গলার শিরাটা ছুরি দিয়ে কেটে দেওয়া হবে। ফিনকি দিয়ে রক্ত যখন গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে, তখন

তাতে গরম ঘি ঢেলে দেওয়া হবে। রক্তের স্রোতটা কিছু কমে যাবে, কিন্তু যন্ত্রণায় শত্রু তখন পাগলের মতো ছোটাছুটি করবে। আর সেই ভূতের নাচ দেখে হাজারারা হাততালি দেবে। এছাড়া হাত-পা কাটা বা বুকের চামড়া উপড়ে নেওয়া তো সাধারণ ব্যাপার। এইসব অত্যাচারের পদ্ধতিগুলো মনে হয় না আফগানিস্তানের। খুব সম্ভব এইসব পদ্ধতিগুলো চেঙ্গিস খানেরই। আমরা আজ সেই হাজারাদের অঞ্চলে বেড়াতে যাচ্ছি।

একটা টয়োটা ভ্যানে করে আমরা কয়েকজন ডাক্তার আর কম্পাউন্ডার আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। কাবুল ছেড়ে আবার সেই চওড়া রাস্তা। চারিকার বলে একটা জায়গায় থেমে চা খাওয়া হল। মি. রঞ্জিত কেন জানি না চার প্যাকেট টয়লেট পেপার কিনলেন। আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের একটা কাঁচা রাস্তায় হিন্দুকুশ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। রাস্তার একপাশে খাড়া পাহাড় অন্য পাশে গভীর খাদ। তলায় দেখা দিল নীলচে-সবুজ পাহাড়ি ঝর্না। পাথরে ধাক্কা লেগে লেগে তার জল ফুলে ফেনা হয়ে যাচ্ছে। ঝর্নার দু'ধারে বড় বড় সবুজ গাছের সারি— আখরোট, কুরমানি, আলুবোখরা, তুঁত আরও কী কী সব গাছ। মাঝে মাঝে ছক কেটে কেটে গমের ক্ষেত দেখা দিল। পাহাড়ের ওপরের অঞ্চলটা চাঁচাছোলা। কালচে খয়েরি পাহাড়। একটা ঘাস বা একটা ঝোপঝাড় নেই— শুধু বালি, মাটি আর পাথর। সেসবের মাঝখানে বিরাট দাড়িওয়ালা পাহাড়ি ছাগল অনায়াসে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠা-নামা করছে। পাহাড়ের ওপরের আকাশ গাঢ় নীল, এক ছিটেও মেঘ নেই। গমের ক্ষেতে জল দেবার জন্যে দেখলাম শতবর্ষের পুরনো পদ্ধতি—জোয়ে। এই জিনিসটা আগে পাঞ্জশের উপত্যকায় দেখেছিলাম।

রাস্তার বাঁকে বাঁকে ভাঙা ভাঙা ট্যাঙ্ক দেখা দিল। হয়তো এইসব ট্যাঙ্কে চেপেই তালিবানরা বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ভাঙতে গিয়েছিল। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। পাহাড়ের গায়ে দূরে ছোট ছোট গ্রাম দেখা দিল। মাটির দেওয়ালের দু-একটা কামরাওয়ালা বাড়ি দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন পাহাড়ে একটা খাঁজ কেটে বাড়িগুলো সেখানে গুঁজে দিয়েছে। দারিদ্র্যের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।

কোরবান বলে একটা জায়গায় দুপুরের খাওয়া হল। ভাত, নান, আলুর সবজি (যার থেকে মাংসের টুকরো বেরল) আর স্যালাড। এসব জায়গায়

দেখলাম হিন্দুস্থানি দোস্তদের বিশেষ খাতির নেই। আমরা কে, কেন এসেছি কেউ কিছু গায়ে মাখল না।

রাস্তা আর শেষ হয় না। গাড়ি আস্তে আস্তে খাড়া পাহাড়ে উঠতে লাগল। আশেপাশের ছোটখাটো গাছপালা সব শেষ। চারদিকে শুধু কাঁটাঝোপ, বালি, পাথর। হাওয়া বেশ ঠান্ডা। আমরা এগারো হাজার ফুট শিবার পাস-এর দিকে এগোচ্ছি। পাহাড়ের মাঝখানে একটা খাঁজ পেরিয়ে ধূসর মরুভূমির মতো একটা এলাকায় এসে পড়লাম। চারদিকে হালকা ঢেউয়ের মতো ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী, ঘাসগুলো শুকিয়ে কাগজের মতো হয়ে গেছে। অনেক দূরে ফিতের মতো একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, তাতে একটিমাত্র গাড়ি। অনেককাল আগে আকিরা কুরোসাওয়ার সহনির্মাতার একটা সিনেমা দেখেছিলাম, "ডেরসু উজালা"। সে সিনেমাটায় সাইবেরিয়া অঞ্চলের ছবি। এই এলাকাটাও অনেকটা সেরকম। তবে এখানে অতটা বরফ নেই। চারদিকে শুধু শুকনো ঘাস। শিবার পাস থেকে নেমে আমরা খাস বামিয়ান উপত্যকায় ঢুকলাম। গাছপালা দেখা দিল, মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি নদী। এখানকার পাহাড়ের অদ্ভুত সব চেহারা, আর রং। কয়েকটা খয়েরি, কয়েকটা কালচে, কিছু পাহাড় লাল আর বাকি কিছু হলদে রঙের। তার তলায় সবুজ গাছ। সব মিলিয়ে বেশ রঙিন। বিভিন্ন আকৃতির পাহাড়। যেন কোনও অলৌকিক স্থপতি এসব কারুকার্য করেছে। প্রায়ই দেখা যাচ্ছিল কাদার ঢেলা ছুড়ে ছুড়ে মাটির যা চেহারা হয় সেই ধরনের পাহাড়। দূরে দেখলাম একটা বুড়ো আঙুল— আঙুলের ডগাটা মনে হচ্ছে এখুনি পড়ে যাবে। একপাশে দেখলাম একটা লম্বা নাকওয়ালা লোক আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গাড়িটা যখন বাঁক ঘুরে পাহাড়ের কাছে এল তখন সেই পাহাড়টা— লোকটা থ্যাবড়া হয়ে গেল। লালচে পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা কাটা পাথর— মনে হচ্ছিল যেন পাহাড় দিয়ে কেউ পর্দার ঝালর তৈরি করে রেখেছে। এসবের মাঝে গর্ত গর্ত ফুটোওয়ালা গুহাময় অজস্র পাহাড়— যেন অরণ্যদেবের খুলির পাহাড়।

চ্যাপটা নাকওয়ালা হাজারারা ক্ষেতে কাজ করছিল। মহিলারা বোরখা পরে না, তবে মাথায় লাল নীল হলদে বেগুনি একটা চাদর রাখে। আমাদের গাড়ি দেখে তারা সেই চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। এদের পোশাকগুলো আলাদা ধরনের। তলায় রংচঙে ঘাঘরা গোছের একটা পোশাক, ওপরে সার্টের মতো ব্যাপার। মাথায় তামার নানা আকৃতির গয়নাগাঁটি।

একটা চেক পোস্ট এল— তাতে লেখা, "Welcome to Bamiyan"— তার পাশে লাল পাহাড়ের ওপর অনেকগুলো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। এক হাজার বছরের পুরনো এই শহরের নাম ছিল 'শহর-এ-জোরাত'। চেঙ্গিস খান যখন বামিয়ানে এসেছিল তখন তার এক বিশ্বস্ত লোক এই অঞ্চলে খুন হয়েছিল। চেঙ্গিস খানের হুকুম হয়েছিল এই শহরে যেন একটা কুকুরও না বেঁচে থাকে। শহর-এ-জোরাত (অর্থাৎ লাল শহর) সেদিন থেকে নিস্তব্ধ হয়ে গেছিল। আজ সেই শহর অর্ধেক বালিচাপা পড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গাড়িটা একটাপাক ঘুরতেই আমার রোমহর্ষ হল। দূরে প্রায় মাইল পাঁচেক আগে একটা বিরাট বড় পাহাড়ের গায়ে দেখলাম একটা লম্বামতো খোদাই করা ফুটো। সেই বুদ্ধমূর্তির জায়গা। এটাকেই তালিবানরা গুঁড়িয়ে ফেলেছিল।

বামিয়ান পৌঁছলাম। গভর্নর হাজি আলি যারযাদির নামে দুটো চিঠি ছিল, সে সব দেখাতে আমরা তার বাড়ি গেলাম। এখানে আমাদের বিশেষ কদর নেই— এমনকী গভর্নরের খুব একটা ধরপাকড় নেই। নালি নর্দমা পার হয়ে গভর্নরের বাড়ি পৌঁছতে হয়। পুলিশগুলোরও গভর্নরের প্রতি বিশেষ ভক্তি নেই। তার কারণ হয়তো গভর্নরের না আছে ক্ষমতা, না পায় এখানকার উন্নতি করার টাকা পয়সা। এসব অঞ্চল খুব গরিব।

পাহাড়ের মাথায় একটা ছোট অতিথিগৃহে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। সামনে বুদ্ধমূর্তির গর্তগুলো দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধমূর্তির পাশে দেখলাম অজস্র ছোট বড় মাপের গুহা পাহাড়ের গায়ে গায়ে উঠে রয়েছে। মনে হয় ভেতরে সিঁড়ি থাকবে। অনেক দূরে, ডানদিকে দেখলাম সেই একই পাহাড়ের গায়ে আরেকটা মূর্তির খাঁজ এবং তার আশেপাশেও অনেক গুহা। পুরো ব্যাপারটা প্রায় মাইলখানেক লম্বা একটা পাহাড়ের গায়ে তৈরি করা। অবিশ্বাস্য। আমাদের পাশে একটা পাহাড়ে ভাঙা বাড়ির স্তূপ। এটা ছিল শহর-এ-গোলগোলা বা শোরগোলের শহর। এককালে এই শহরে নাচ গান হইহল্লা হত। চেঙ্গিস খানের আক্রমণের পরে এই শহরও নিস্তব্ধ হয়ে গেছিল। চেঙ্গিস খান অবশ্য বামিয়ান বুদ্ধকেও ভাঙতে গিয়েছিল, তবে সফল হয়নি।

আমাদের অতিথিগৃহে ঘর আছে, গদি আছে, তবে আলো নেই। দশজন লোকের পাঁচটা কম্বল। ড্রাইভারের কম্বল নেই তবে বিছানা আমাদেরই ঘরে। কীভাবে শোয়া হবে তা নিয়ে ভীষণ অঙ্ক কষাকষি আরম্ভ হল। গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাথরুমটা কোনদিকে?" "ওহো তাসনও, বিয়ো বিয়ো"

বলে সে আমাকে একটা দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল, দেখলাম তিনটে ভাঙা দেওয়ালওয়ালা ছাদহীন কয়েকটা ঘর। সেগুলো দেখিয়ে লোকটা বলল, "ই তাসনও অস্ত্। ই মকবুল নি অস্ত্ তো উজোস, ময়দানে আজাদ।" অর্থাৎ এটা যদি ভাল না লাগে তা হলে ময়দান তো আছেই। আজাদ হয়ে যা ইচ্ছে করো।

পাহাড় থেকে নীচে নেমে রাত্তিরের খাওয়া সারা হল। ভাত, নান, ডাল ও মাংস। মাংস দেবার সময় বলে গেল "গোস্পান গোস্ত" অর্থাৎ ভেড়ার মাংস। যখন মাংসতে কামড় দিয়ে ফেলা হয়েছে, তখন লোকটা বলল, "গোস্পান গোস্ত নি অস্ত্, ঈ গো গোস্ত অস্ত্" অর্থাৎ ... আরে রাম রাম রাম। তবে শুনেছি অজান্তে দোষ নেই। মি. রঞ্জিত দেখলাম গোস্তের ধারে গেলেন না। নান, তিন-চারটে তরমুজ আর একটা পেপসি খেয়ে বসলেন। তাসনও-এর কথাটা মনে করিয়ে দিতে হেসে বললেন, "তখন দেখা যাবে।"

এবার শোবার পালা। হাঁটু ঠোকাঠুকি, কনুইয়ের গোঁত্তা, কম্বল টানাটানি— অবশেষে নিজেদের মধ্যে লাথালাথি। ওদিকে বামিয়ানের শীতের হাওয়া ভাঙা জানলা দিয়ে হু হু করে ঢুকে আসছে। কোনওমতে ঘুমোলাম।

শহর-এ-গোলগোলার পাশে কামরা-এ-গোলগোলা। প্রচণ্ড শোরগোলে ঘুম ভাঙল। কার বুড়ো আঙুল রাত্তিরে কে লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে, কার নাক ঠুকে গেছে। আর দু'জনের পেট ব্যথা, আর একজন হাঁচছে। দরজার পাশে দেখলাম মি. রঞ্জিত হাঁড়িমুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। "সারা রাত ধরে আমি ওপর-নীচ করেছি। টয়লেট পেপারের বান্ডিল প্রায় শেষ। তরমুজটা বোধহয় বেশি খাওয়া হয়ে গেছিল। কী করব বুঝতে পারছি না।" তাকে ওষুধবিষুধ দিয়ে ধাতস্থ করা হল। আমরা অবশেষে এলাম বুদ্ধমূর্তির সামনে।

বিশাল বড় লম্বা গর্ত— পাহাড় কেটে তৈরি করা। উচ্চতায় নিউইয়র্কের স্ট্যাচু অফ লিবার্টির চেয়েও বড়। গর্তর মধ্যে একপাশে বুদ্ধের হাতের কাপড়ের কারুকার্য এখনও অবশিষ্ট আছে। টুকরো পাথর গর্তের সামনে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। আমরা সেই স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে ওপরদিকে তাকালাম। ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, সকলের মুখ একসঙ্গে হাঁ হয়ে গেল। কেউ বলল, "বাপরে", কেউ বলল, "কী লোকসানই না করল ব্যাটারা"— বলে তালিবানদের দু'-চারটে গাল দিল। সবাই থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এককালে যে একটা দুর্দান্ত মূর্তি ছিল সেটা আর বলে দেবার দরকার হল না। বহু শতাব্দী ধরে নানান সৈন্যরা এই মূর্তি ধ্বংস করার চেষ্টা করছে; সফল হয়েছে শুধু তালিবানদের কামান। মূর্তির পাশের পাহড়ে চারতলা অবধি সিঁড়ি এবং ঘর, বারান্দা। সবই পাহাড়ে খোদাই করা। এককালে বোধহয় এটা একটা বৌদ্ধ মনাস্ট্রি ছিল। ছাত্রেরা গুহার মধ্যে এইসব ঘরগুলোয় থাকত এবং পড়াশুনো করত। মনে হয় এটা কনিষ্কের সময়ে তৈরি। আমাদের পায়ের কাছে ছোট বড় পাথর স্তূপাকার। সাধারণ চোখে এগুলো শুধু পাথর, আসলে এগুলো ভেঙে-যাওয়া বুদ্ধমূর্তি। কয়েকটা পাথরে তখনও কারুকার্য লেগে রয়েছে। আমরা অনায়াসে সেখান থেকে বুদ্ধমূর্তির টুকরো নিয়ে পকেটে পুরলাম। শুনেছি যখন 'বার্লিন ওয়াল' ভাঙা হয়েছিল তখন সেই নীরস পঁয়তাল্লিশ বছরের দেওয়ালের এক একটা ইটের দাম ছিল পাঁচ ডলার। এইসব পাথরের টুকরো নিশ্চয়ই তার থেকে হাজার গুণ বেশি দামের হবে। এসবের ব্যবসা করার কেউ নেই, লোকে হয়তো এর দাম জানেও না। অবশ্য আমাকে যদি কেউ ওগুলো বিক্রি করতেও বলে তা হলে কোনওমতেই করব না। এই পাথরগুলোই আফগানিস্তানে পাওয়া অমূল্য সম্পদ আমার জন্যে।

আমরা বুদ্ধমূর্তির পাশ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের বৌদ্ধবিহারে যাবার চেষ্টা করলাম। আশেপাশের লোকেরা বারণ করল। কয়েকটা গুহায় নাকি এখনকার লোকেরা বাস করে, আর বাকিগুলোতে তালিবানরা এখানে ওখানে মাইন লাগিয়েছে। ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে একটা দ্বিতীয় ভাঙা বুদ্ধমূর্তি। এটার আকার একটু ছোট, তবে এ মূর্তির হাতের বেশ কিছুটা অংশ এখনও অক্ষত। তাতে হাতের চাদরের ভাঁজের কারুকার্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুটো মূর্তির খোপের মাঝে একটা খুব ছোট মূর্তির গুহা। এখানকার লোকেরা বলে বড়টা হল পুরুষ-বুদ্ধ, অন্যটা স্ত্রী-বুদ্ধ, আর ছোটটা সন্তান-বুদ্ধ। মনে হয় যেটা বোঝাতে চাইছে সেটা হচ্ছে বড়টা সিদ্ধার্থ, ছোটটা তার স্ত্রী যশোধরা, আর সন্তানটি পুত্র রাহুল।

বামিয়ান উপত্যকার লোকজনের পুরো বৌদ্ধবিহারটার ওপর বিশেষ কিছু মোহ নেই। এটার যে কী ঐতিহাসিক মূল্য সে ব্যাপারে হয়তো তাদের কোনও ধারণাই নেই। কী করেই বা থাকবে? যেখানে কাল বাদে পরশু কী খাবে তার ঠিক নেই সেখানে এসব পাথরের গুহা আর বড় বড় পাথরের পুতুল নিয়ে কীই বা হবে। এককালে অবশ্য বামিয়ানে বিমানবন্দর ছিল; কাবুল থেকে প্রচুর



পর্যটক এসব অঞ্চলে আসত। তালিবানদের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার এটাও একটা কারণ— যাতে বামিয়ানের শিয়ারা পর্যটকদের কাছ থেকে জীবনধারণের সুবিধে থেকে বঞ্চিত হয়।

আমরা বিষণ্ণ মনে বামিয়ান ছাড়লাম। রাস্তায় গেলাম কাকরাক উপত্যকায়। সেখানে নাকি এককালে একটি শায়িত বুদ্ধমূর্তি ছিল। সেটা কোথায় তা খুঁজে পাওয়া গেল না। যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে ছোট বৌদ্ধবিহার। ছোট বড় অনেক গুহা, সবকটাতেই বুদ্ধমূর্তির ভাঙা টুকরো। তালিবানরা একটাকেও আস্ত রাখেনি।

পুরনো রাস্তা দিয়ে ফেরা আরম্ভ হল। ধুলোবালি মেখে ভূতের মতো চেহারা করে সন্ধে নাগাদ কাবুল পৌঁছলাম আমরা। পকেট থেকে আফগানিস্তানের অমূল্য সম্পদটুকু অতি সন্তর্পণে ট্রাঙ্কে তুলে দিলাম।—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

কাওয়ালি

এখানকার লোকেরা বলে, সংগীতের জন্ম হয়েছিল আফগানিস্তানে, যৌবন পেয়েছিল ভারতবর্ষে ও মৃত্যু হল পারস্য দেশে। শেষ কথাটার অর্থ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। মনে হয় কট্টর আরব সৈনিকদের হাতে যখন ইসলাম ধর্মের কঠোর প্রচার চলছে তখন যে সংগীতের ইতি হয়েছিল সেটাকেই এরা পারস্য দেশে সংগীতের মৃত্যু বলে। বা হয়তো ভারতবর্ষের সংগীতের পরে বেদুইনদের একঘেয়ে সুর মরা মনে হয়।

দূতাবাসের এক ছুতোরের আমন্ত্রণে আমরা সন্ধেবেলা একটা অন্ধকার ঘিঞ্জি এলাকায় এসে পড়লাম। এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে নালি-নর্দমা পেরিয়ে একটা দরজায় এসে থামল রাস্তাটা। মাটির বাড়ির ভাঙা কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকা গেল।

ঘরের ভেতরে একপাশে একটা বিশাল বড় উনুনে নান তৈরি হচ্ছে। তার ধারে একটা বুখারি, তাতে রাশি রাশি কেটলি চা রাখা রয়েছে। অন্য ঘরে একটা ভাঙা বেঞ্চিতে চার-পাঁচজন দাড়িওয়ালা, পাগড়ি পরা বুড়ো লোক বসে ঝিমোচ্ছে। আমরা আসাতে তারা সন্দেহের চোখে আমাদের দেখতে লাগল।

"হিন্দুস্থানি। শুমো দোস্ত অস্ত্। ডাক্তারে হিন্দি।"

"ও হো খুশামুদ্দিন। বিসী বিসী।"

ইতিমধ্যে আমাদের ছুতোর বন্ধু এসে পড়েছে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আমরা দোতলা বাড়ির ওপরে একটা হলঘরে এসে পৌঁছলাম। এসেছি কাবুলের সুফিদের একটা দরগায়। এখানে প্রতি শুক্রবারে সুফিরা কাওয়ালি গায়।

হলঘরে একটা বেদী। তার ওপরে সবুজ চাদর টাঙিয়ে— লাল, রুপোলি হলুদ ঝালর দিয়ে সাজানো চত্বর। সেখানে পাঁচজন বুড়ো আফগানি মেঝের ওপর কোরান রেখে পড়ছে। কোরান পড়া শেষ হবার পর এরা হাত মুখ ধুয়ে নান খাবে তারপর কাওয়ালি শুরু করবে। হলের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে কিছু লোক বসে রয়েছে। কেউই একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে না। দু-একজন কোরান

শুনছে। বেশির ভাগই দৃষ্টিহীন ভাবে চেয়ে রয়েছে। আমাদের ছুতোর গাইড বলল, "এরা সব হেরোইন, আফিম ও চরসের নেশা করে তারপর বসে বসে গান শোনে। সারারাত এখানে থাকবে তারপর চা ও নান খেয়ে চলে যাবে। তোমাদের জুতোগুলো ভিতরে নিয়ে এসে সঙ্গে রাখো। নয়তো ওরা ওগুলো নিয়ে নেবে।"

"জুতো নিয়ে কী করবে?"

"জুতো বিক্রি করে চরস, আফিম কিনবে।"

পুরো ঘরটায় একটা মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধ। বেশ অদ্ভুত ধরনের। গাইড বলল, "এই যে ধোঁয়া মতো হয়েছে এটা তলার চত্বর থেকে আসছে। রাত বাড়লে সারা ঘরে চরস ও আফিমের ধোঁয়া ভরে যাবে।"

"পুলিশ কিছু বলে না?"

"এখানে বিশেষ আসে না। মাঝে মাঝে এক আধটাকে ধরে তবে বেশি পয়সা পায় না বলে ছেড়ে দেয়।"

আমরা জুতোগুলো বগলদাবা করে নীচে গিয়ে বসলাম।

ছুতোর গাইড চা খেতে খেতে বকবক শুরু করল। "সংগীতটা মুসলমান ধর্মের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছিল সুফিদের আসার সঙ্গে সঙ্গে। সুফিরা জায়গা জায়গা ঘুরে সংগীতের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচার করত। প্রচুর কাওয়ালি লেখা হয়েছিল তখন। সুফিদের মতে জিহাদ করা, হজে যাওয়া আর সুফি সংগীত শোনা এক স্তরে পড়ে। তবে নাচ একেবারে বারণ ইসলামে। ভারতবর্ষে সুফিদের সবচেয়ে বড় দরগা আজমের শরিফে। আমরা বলি মাজহার-এ-শরিফের দরগাও সুফির, তবে ওখানে গান-বাজনা চলে না।"

"তালিবানদের সময় তোমরা কী করতে?"

"আমরা তখন লুকিয়ে ধর্ম পালন করতাম। তালিবানরা এসে এখানকার বাজনা ও যন্ত্র ভেঙে দিয়েছিল। ওই দেখ ভাঙা তবলাটা পড়ে আছে। গত পাঁচ বছরে আমাদের ধর্মের বহু লোক এদিক-ওদিক চলে গেছে। এখন আমাদের কাছে অত পয়সাও নেই যে এসব আবার করে গড়ে তুলতে পারি। আর যাদের পয়সা আছে তারা সুফি সংগীতে বিশ্বাস করে না।"

"সুফি সংগীত কোথা থেকে এসেছিল?"

"মক্কা-মদিনা থেকে তো নয়। এইসব আরবের কোনও অঞ্চলে উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর আরব ব্যবসাদারদের সঙ্গে ভারতে যায়। সেখানে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে মিশে আরও ভাল হয়ে গিয়েছিল।"

আড়চোখে দেখলাম মি. রঞ্জিত ঢুলু ঢুলু চোখে একটা কাপড়ের বান্ডিল জাতীয় জিনিসকে বালিশ করে ঘাড়ের নীচে রাখছে। গল্প শুনতে শুনতে সে আস্তে আস্তে কাত হয়ে পড়ল। গাইড হঠাৎ—এবার খেয়ে নেওয়া যাক একটু পরে গান শুরু হবে— বলে মি. রঞ্জিতের মাথার তলার বালিশটা টেনে বের করে খুলল। ময়লা কাপড়ের পুঁটলি থেকে এক রাশ নান বের করল। চার-পাঁচটা নান রেখে বাকিগুলো আবার কাপড়ে মুড়ে বালিশ তৈরি করে মি. রঞ্জিতকে বলল, "নাও এবার শোও।"

মি. রঞ্জিতের চক্ষু ছানাবড়া। বালিশের চেহারা দেখে তার ঘুম ছুটে গেছে। বলল, "এরকম ধরনের বালিশে আমি জীবনে কখনও শুইনি।"

খিচুড়ি জাতীয় কিছু খেলাম। এখানকার লোকেরা একে বলে 'সোলা'। বেশ সুস্বাদু। লণ্ঠনের আলোয় বসে মাটির মেঝেতে সবাই মিলে গোল হয়ে নান, সোলা আর চা দিয়ে রাত্তিরের খাবার শেষ হল। এবার গানের পালা।

হলঘরে এখন বেশ ভিড়। কোনায় কোনায় কিছু গাঁজাখোর বসে ঝিমোচ্ছে। চত্বরের ওপর পাঁচজন লোক যন্ত্রপাতি বাজাচ্ছে। হারমোনিয়াম, তবলা, এসরাজ চেনা গেল। একটা সেতার জাতীয় যন্ত্র দেখলাম— একটু বেশি বেঁটে আর মোটা। মনে হয় এর থেকে সেতারের জন্ম হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বীণা নয়। তাল দেবার জন্য একজনের হাতে একটা লোহার ত্রিকোণ আর ছোট হাতুড়ি। আমরা বসতেই আসেপাশের লোক ভীষণ উৎসুক হয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমরা যথারীতি 'সেন্টার অফ অ্যাট্র্যাকশন'।

গান শুরু হবার জোগাড় হল। গাইড হঠাৎ আমার কাছে এসে বলল, "চলুন আপনাকে ডাকছে।"

"কে ডাকছে? কোথায় যাব?"

"বাজনদাররা বসে আছে আপনি তবলা বাজাবেন বলে, চলুন।"

বুঝলাম মি. রঞ্জিত এই বেফাঁসটা করেছেন। কোনওসময় বোধহয় গাইডকে বলে দিয়েছেন যে এই ছেলে তবলা বাজায়।

কালো সালওয়ার আর পাখোল পরে আমি কাওয়ালিদের দলে গিয়ে বসলাম। যন্ত্রপাতির অবস্থা বেশ খারাপ। বাঁয়া-তবলার গাবটা প্রায় উঠে গেছে। তবলাটা বাঁধবার কোনও হাতুড়ি নেই। হারমোনিয়ামের রিডও মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে। কোনওরকমে লোহার ত্রিকোণ দিয়ে তবলাটা মোটামুটি বাঁধা গেল। খারাপ লাগছিল। এইসব ভাঙা যন্ত্রপাতি নিয়েই লোকগুলো মহা

উৎসাহে গান-বাজনাটা বজায় রেখেছে। সংগীতের মৃত্যু যে এদেশেই তালিবানদের দরুণ হয়ে গেছে— সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

গান শুরু হল। ফারসি ভাষায় গান। কাহারবা তাল। ভাল ছন্দ। সুন্দর সুর। দু'লাইনের পরে পরে হলঘরের সব লোকেরা সুরে সুর দিল। তাদের আওয়াজে তবলা ও বাজনার আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছিল। গমগম করে উঠল হলঘর। দুলতে শুরু করল আফগানির ভিড়। আর তার মধ্যে মিষ্টি মিষ্টি ঝাঁঝালো আফিম ও চরসের ধোঁওয়ার গন্ধ। ত্রিকোণওয়ালার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তেহাই মেরে ভালই জমে উঠল তবলা। বাজনদারদের সঙ্গে মুচকি হেসে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে ভাব হয়ে গেল।

এ এক অদ্ভুত সম্পর্ক। কেউ কারুর নাম, ধাম, ঠিকানা জানে না, আর হয়তো কখনও দেখাও হবে না, শুধু সংগীতের মাধ্যমে এক মুহূর্তে নির্বাক কণ্ঠে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। দ্বিতীয় গানটা দীপচন্দী তালে, দুলে দুলে চলল। আসর বেশ জমে আসছিল। শ্রোতারা হিন্দুস্থানি তবলচী পেয়ে আশ্চর্য । দূর থেকে দেখলাম মি. রঞ্জিত উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করছে। এবার তা হলে উঠতে হবে।

গান শেষ হবার পরে উঠে দাঁড়াতেই বাজনদাররা হাঁ হাঁ করে উঠল। গাইড বুঝিয়ে দিল বাইরে কারফিউ লেগে যাবে, এদের অনেক দূর যেতে হবে। মুষড়ে পড়ল সবাই। বাজনদারদের সেলাম করে আমরা বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলাম আবার গান আরম্ভ হয়েছে।

সাড়ে দশটা বাজছে। রাস্তায় একটা গাড়ি, ঘোড়া, লোক নেই। বাড়ির কাছে যখন এসে গেছি তখন একটা পুলিশের ভ্যান আমাদের আটকাল।

"তোমরা জানো না দশটায় কারফিউ লাগে।"

"ইয়ে মানে আমরা একটু আটকে পড়েছিলাম।"

"ও হো তোমরা তো দেখছি হিন্দুস্থানি, চলো তোমাদের পৌঁছে দিই।" বলে আমাদের গাড়ির সামনে ও পেছনে দুটো ভ্যান দিয়ে পুলিশ আমাদের বাড়ি অবধি পৌঁছে দিল।

"কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

"সুফিদের কাওয়ালি শুনতে গিয়েছিলাম।"

পুলিশ হতবাক!!

"এখানে কাওয়ালি হয় বুঝি? জানতাম না তো!!"

কোহেমার্কাস হাসপাতাল থেকে আমরা মাঝে মাঝে পলিক্লিনিক গিয়ে বসতাম। এখানে লোকজনের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তাদেরই মধ্যে আমি মিনির রহমত কাবুলিওয়ালাকে খুঁজে বেড়াতাম। তবে কারুর মধ্যেই সেই বিশাল চেহারা, সেই পাকানো পাগড়ি আর স্মিত হাসি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সবাই যেন থকে গেছে। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পরে সবাই রণক্লান্ত। এ যাত্রায় বোধহয় রহমতের সঙ্গে দেখা হবে না।

পলিক্লিনিকে আজ রোজকার মতো বেশ ভিড়। এগারোটায় ভিড় যখন চূড়ান্তে— ঘরে তখন পাঁচ-ছ জন রোগী আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক কোনায় দেখলাম তিনজন মহিলা চুপ করে ডাক্তারের অপেক্ষা করছে। দু'জন বেশ ফরসা, টিকোল চেহারা, তৃতীয়জন একটু ময়লা মোটা-সোটা, আর নাক-চোখ বিশেষ পরিষ্কার নয়। রোগীর ভিড় যখন হালকা হল তখন তারা এগিয়ে এসে বসল। মোটা মেয়েটি বাকি দু'জনের দোভাষী। সে হিন্দি জানে ও পাস্তু বোঝে। বাকি দু'জন পাস্তু ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে না।

রোগী দেখা হয়ে গেল। ফরসা মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। মোটা মেয়ে তখনও বসে আছে। কী ব্যাপার? ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "আপলোক হিন্দুস্থান সে আয়া। বহুত আচ্ছা। হাম ভি হিন্দুস্থান সে আয়া।"

"ও তাই নাকি—" ডা. বালা লাফিয়ে উঠল। "বলো ওখানকার কি খবর?"

এ আবার কবে হিন্দুস্থান থেকে এল। গায়ে ময়লা কাপড়, জুতোগুলো ছেঁড়া, নীল বুর্খা পরা, এ তো এখানকার মনে হচ্ছে। তবে চেহারাটা কেমন যেন আফগানি নয়!!

"আসলে আমি সতেরো বছর আগে হিন্দুস্থান থেকে এসেছিলাম।

এখানকার পাক্তিকা প্রদেশের এক আফগানি ব্যবসাদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তখন থেকে আমি এখানেই থাকি। কাবুল এসেছি ভিসার খোঁজ-খবর করতে। এই দুটো মেয়ে আমাদের এলাকারই। তোমাদের খবর পেলাম এখানে এসে। ভাবলাম এদের চিকিৎসা করিয়ে নিই।"

মহিলাটির হিন্দিতে কী রকম টান ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "হিন্দুস্থানমে আপকা ঘর কিধার থা?"

"হাম বাঙ্গাল কা হ্যায়।"

ডা. বালা বলে উঠল, "আই ও"— আমি তো চেয়ার থেকেই পড়ে যাচ্ছিলাম।

'আইও' শুনেই মহিলা বলে উঠল, "আরে ইয়ে তো মালয়ালি হ্যায়।"

ডা. বালা গলে জল।

মহিলার নাম আমিনা। তবে তার আসল নাম ছিল রুমা মৈত্র। বাড়ি হুগলি জেলার চুঁচুড়াতে। উনিশশো আশি সালে ধানবাদের মেডিকেল কলেজ থেকে সে এক আফগানি ব্যবসাদারের প্রেমে পড়ে।

"মতলব আপকা ইস্ক হো গিয়া থা।"

ডা. বালার মন্তব্য।

"হা হা ইস্ক হুয়া থা।" রুমা মৈত্র ওরফে আমিনার হি হি করে হাসি।

উনিশশো ছিয়াশি সালে সে বাড়ি-ঘর ছেড়ে এই মুলুকে আসে। এখানে তাকে রুমা মৈত্র বলে কেউ জানে না। সে এখন দুই ছেলেমেয়ের মা। পাক্তিকাতে ডাক্তারি করে। বাড়ির বাকি লোকেদের সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক আছে জানি না। তবে ওর ভাই খবরাখবর নেয় ফোনে। এতদিনে যুদ্ধ থামার পরে তার হিন্দুস্থান যাবার ইচ্ছে হয়েছে। তাই সে কাবুলে এসেছে।

রুমা মৈত্রের ভাব ভঙ্গি ও কথাবার্তা দেখে মনে হচ্ছিল সে এককালে বেশ ডানপিটে ছিল। তা না হলে এতদূর এসে সম্পূর্ণ অজানা পরিস্থিতি ও ধর্মের মধ্যে পড়ে এতকাল যুদ্ধ, মেয়েদের অত্যাচার দেখে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে! অনেকটা আজিমের মতো গল্প, তবে এটা মেয়ের দিক থেকে।

"যুদ্ধের সময় অসুবিধে হয়নি তোমার?"

"আমাদের এলাকাগুলো পাস্তুনে ভরা, তালিবানদের এ সব জায়গা কব্জা করতে অসুবিধে হয়নি। প্রচুর তালিবান সৈনিক আমাদের এলাকায় ছিল। ভীষণ একটা ধরাকাটা ছিল না। এখানকার লোকেরা এমনিতেই ইসলামের

বেশ অনুসরণ করে। আমাকে তো অনেক সময় বুর্খাও পরতে হত না। শুধু মাথায় ও মুখের ওপর হিজাব রাখলেই হত।"

"ক'দিন পরে বাংলা বলতে পারলেন?"

"বাংলা বলা হয়। পক্তিকায় আরও চার-পাঁচটা বাঙালি আছে। তারা আমার চেয়ে বেশি বাংলা বলে।"

রুমা মৈত্রর গল্প শেষ হল।

"আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম," বলে সে চলে গেল।

কাবুলিওয়ালার সন্ধানে

পূর্ব আফগানিস্তানের সীমানাটা পাকিস্তানের সঙ্গে লাগোয়া। এইসব এলাকায় লোকবসতি খুব কম ও ছড়ানো ছিটোনো। জালালাবাদ ও তোরখাম ছাড়া বেশিরভাগ এলাকাই মরুভূমি আর পাথুরে। পাকিস্তানের সীমানাটা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। এইসব এলাকার বেশির ভাগ লোকই পাস্তুন বা পাঠান। সে সব জায়গায় স্থানীয় লোকেদের নিজস্ব কানুন চলে। সরকারের বিশেষ ধর-পাকড় নেই। লোকেরা অনায়াসেই মরুভূমির মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে। এক-আধ সময় পাকিস্তানের রেঞ্জাররা তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করে তবে তাঁরাও এ ধরনের লোককে সামলে চলে। এইসব অঞ্চলেই পাকিস্তানের সাহায্যে ওসামা বিন লাদেন তার কুখ্যাত আল-কায়দার ট্রেনিং ক্যাম্প তৈরি করেছিল। তার সবচেয়ে বড় ক্যাম্প ছিল 'খোস্ত' বলে এক প্রদেশে। আর তার পাশেই পাক্তিকা প্রদেশ। এইখানেই রুমা মৈত্র থাকে।

অ্যাম্বাসাডারের সঙ্গে আমাকে পাক্তিকা যেতে হবে। সেখানকার স্বাস্থ্যব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সুবিধেমতো হাসপাতাল গঠন করতে হবে। ওসব জায়গা নাকি ভীষণ অনুন্নত। হয়তো এমনও হতে পারে যে খোস্তের আসেপাশের পাহাড়ে আল-কায়দার লোক থাকে। হয়তো বিন লাদেনও সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। মাঠ ঘাটে হঠাৎ যদি তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!!

তিনটে গাড়ি বোঝাই করে আমরা পাক্তিকার রাজধানী সারানের দিকে রওনা হলাম। নীল রঙের, রেডিয়ো লাগানো, নিশান প্যাট্রোল গাড়িতে অ্যাম্বাসাডার ডা. কুরেশি ও এক বডিগার্ড বসল। দু'নম্বর গাড়ি টয়োটা প্রাডোতে বসলাম আমি, পাক্তিকার রাজ্যপালের সেক্রেটারি আর একজন ক্যামেরাম্যান। তিন নম্বর গাড়িতে বোঝাই করে মিলিটারির লোক। আমরা এখন পাক্তিকা রাজ্যপালের স্টেট গেস্ট। কাবুল ছাড়ার আগে আরেকটা গাড়ি

আমাদের সঙ্গে লেগে পড়ল। এ গাড়িতে বোঝাই করা মিলিটারির লোক, তাদের হাতে এ-কে ৪৭, ব্যাগে গ্রেনেড ও পাশে রকেট লঞ্চার। রাস্তায় যদি কোনও বিপদ আপদ হয় তা হলে এরা আমাদের রক্ষা করবে। এদের কর্তা মহম্মদ খাঁ। ইনি পাক্তিকার উকিল এবং আপাতত ভোটে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছেন। আজ ইনি সরকার হয়েছেন। তবে গতকাল ইনি অন্য ধরনের লোক ছিলেন। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, চওড়া, ধবধবে সাদা সালোয়ার পরা এই পাঠান এককালে মুজাহিদ্দিন যোদ্ধা ছিলেন। তালিবানরা আসবার পরে ইনি মাসুদের দল ছেড়ে মনে হয় তালিবানদের হয়ে যুদ্ধ করতেন। সেটা স্পষ্ট করে ঠিক জানা গেল না। তবে আজ ইনি রাজ্যপালের প্রায় ডান হাত ও আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের পাক্তিকায় নিয়ে যেতে এসেছেন।

কাবুল ছাড়ার পরে ছোট সবুজ ক্ষেত ও ঘরবাড়ি আস্তে আস্তে কমে শেষ হয়ে গেল। দু'দিকে দেখা গেল ধূসর মরুভূমি, আসেপাশে শুকনো বালি, পাথর ও ঝোপঝাড়। তিন-চারটে ছেঁড়া তাঁবুর আসেপাশে লাল, বেগুনি, হলদে কাপড় পরা মহিলা দেখলাম। এদের মাথায় জটা। আর চুল, কান ও গলায় বিভিন্ন আকারের গোল চাকতিওয়ালা তামার লোহার গয়না। এরা হচ্ছে কোচি বা বঞ্জারণ বা বেদে। ক্যামেরাম্যান বলল, "ওই দেখো দূরের পাহাড় থেকে একটা মেয়ে ঘাস ও কাঠের টুকরো আনছে। এতে ওদের রান্না হবে। জল যা পাবে তাই দিয়ে রান্না হতে পারবে। পাহাড়ে শুকনো ঘাস ফুরোলে ওরা ভেড়া, ছাগল, উট নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে।"

পলিক্লিনিকে মাঝে সাঝে এই "বেদে"রা চিকিৎসা করাতে আসত এবং তৎক্ষণাৎ সারা ঘরে একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। তার কারণ আজ বুঝলাম।

"চান করলে এরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদের মধ্যেও সবচেয়ে বড় গালাগাল হচ্ছে— "আল্লা করুন তোর বিয়ে কোনও শহরের লোকের সঙ্গে হোক।" এতে এদের চান-টান করে সভ্য হয়ে থাকতে হয়। এটা তারা ঘেন্না করে।" —ক্যামেরাম্যান বোঝাল।

পাক্তিয়া প্রদেশের ওপর দিয়ে পাক্তিকা চলেছি আমরা। এই পাক্তিয়া প্রদেশের রাজধানী গার্দেজ শহর। এককালে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, ডাক্তারি কলেজ সবই ছিল। আজ গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার, পাচা খাঁ— এদের দরুণ পুরো শহরটাই ভগ্নস্তূপ। সে সব পেরিয়ে ধুলো-বালি মাখা ভাঙা রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ি দাঁড়াল। জলখাবার খেতে হবে। রুক্ষ পাথুরে মরুভূমির মধ্যে

এটা যেন একটা মরূদ্যান। চারদিকে সবুজ গাছপালা আর তার মাঝখান দিয়ে কুল কুল করে ঝরনা বয়ে চলেছে। কোথা থেকে যে জল আসছে সে জানি না।

মহম্মদ খান বললেন, "ওই যে দূরে পাহাড়ের শ্রেণী দেখছ ওগুলো হচ্ছে সারিকোট পাহাড়। ওগুলো সব খোস্ত প্রদেশের মধ্যে। ওইখানেই বিন লাদেনের আসল গড় ছিল। আমেরিকা আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ এখানেই চালিয়েছিল, 'অপারেশন অ্যানাকোন্ডা।' অবশ্য আল-কায়দার লোকেদের বিশেষ পায়নি। বেশিরভাগই ততদিনে ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়েছিল। ওর পেছনেই পাকিস্তানের সীমানা। পালাবার সোজা পথ।"

"এখানেও তো থাকতে পারে?" আমি বললাম।

"তার সম্ভাবনা কম। এখানে জনবসতি মুষ্টিমেয়। সবাই সবাইকে চেনে।"

পরোটা, আলুর তরকারি, মুরগির কাবাব আর বিভিন্ন রকমের ফলমূল খেয়ে আমরা আবার রওনা দিলাম। জুরমাত বলে একটা ছোট বাজার পেরিয়ে আমরা পাক্তিয়া ছেড়ে পাক্তিকায় ঢুকলাম। এ সব অঞ্চলে রাস্তা বলে বিশেষ কিছু নেই। আমাদের গাড়িগুলো শুঁয়োপোকার মতো এঁকেবেঁকে বালির ওপর চলতে লাগল। এককালে এ সব এলাকায় জল থাকত এমনকী বরফও পড়ত। আজ চারদিকে ধূ ধূ মরুভূমি। গাছপালার চিহ্ন নেই। এক আধ জায়গায় দু-একটা মাটির বাড়ি। একটা জায়গায় দেখলাম কিছু গাছের ঝোপ-ঝাড় ও একটা জলের হ্রদ। মনে হল বেশ মনোরম জায়গা। গাড়িটা বোধহয় ওখানে দাঁড়াবে। রাস্তাটা ঘুরতেই গাছ ও জল চোখের সামনে থেকে উবে গেল। কী ভয়ংকর!! মরীচিকা যে কি সাংঘাতিক সেটা বুঝলাম। না জানি কত লোক এভাবে ধোকা খেয়ে জলের জন্য ত্রাহি ত্রাহি করে প্রাণ হারিয়েছে এখানে।

পেছনে তাকিয়ে দেখি আমাদের গাড়ির সারির পেছনে কম করে তিরিশটা গাড়ি চলেছে। এরা সব পাক্তিকার বাসিন্দা। এদের এই দুর্গম দেশে প্রথমবার কোনও বিদেশি এসেছে। আর সে যদি হিন্দুস্থানি হয় তা হলে তো বিরাট ব্যাপার। আজ এদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে গ্রামের লোকেরা অ্যাম্বাসাডারকে দশ বারোটা শুকনো মালা পরাল। আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে সবাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছু ভাঙাচোরা বাড়ি দেখা দিল তারপরে একটা ছোটখাটো বাজার।

মাটির বাড়ির ভেতরে ওষুধ, চাল, ডাল ও গাড়ির পার্টসের দোকান। দূরে এদিক-সেদিক এক আধটা বাড়ি। এটাই পাক্তিকার রাজধানী সারান। আমাদের "শোভাযাত্রা" হৈ হৈ করতে করতে গভর্নরের অফিসের দিকে যেতে লাগল। রাস্তার দু'ধারে ভিড় বাড়তে লাগল। চিৎকার শুনলাম— "হিন্দুস্থান! হিন্দুস্থান।" নিজেকে বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিল। গভর্নরের অফিস যখন দূরে দেখা যাচ্ছে তখন হঠাৎ দড়াম গদাম বুদুম করে পুরো মাটিটা কেঁপে উঠল। গাড়িটা এক হাত লাফিয়ে উঠল। বোমা পড়েছে। তালিবান না আল-কায়দা কেউ আমাদের নিশানা করেছে। আর নিস্তার নেই। বেঁচে ফিরতে হচ্ছে না। চারদিকে পটাপট গুলির শব্দ। আমি ভয়ে সিটের তলায় সেঁধিয়ে গেলাম। কোনও আর্তনাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম না। কি ব্যাপার? উঁকি মেরে দেখি দু'ধারের ভিড় মহাউল্লাসে হইহই করছে। ভিড়ের পেছনে আন্টি এয়ারক্রাফ্ট কামান ও দশ বারোটা মর্টার বন্দুক— এইগুলোতে বোমা ফাটিয়ে এরা আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিল।

"কি হল ডাক্তারবাবু? কি হল ডাক্তারবাবু? আপনি তো ভয় পেয়ে গেলেন?" ভয় পাব না? একেবারে একুশ কামানের সেলামি! এই না হলে আর পাঠান! আমি লজ্জিত মুখ করে হে হে করতে করতে গাড়ি থেকে নামলাম।

গভর্নরের সঙ্গে অ্যাম্বাসাডারের মিটিং বসল। চারদিকে সাড়ে ছ'ফুট উচ্চতার বাজখাঁই দেখতে গণ্যমান্য পাঠানদের সমাবেশ— "পাক্তিকা এককালে পাক্তিয়ার একটা অঞ্চল ছিল। এটা আফগানিস্তানের দুর্গম জায়গা। কোনও সরকারি লোক এসব অঞ্চলে আসেই না। রাস্তা ঘাটের অবস্থা তো দেখলেই; বিজলি বলে কোনও জিনিস নেই। সোলার প্যানেল দিয়ে অনেকেই কাজ চালায়। পড়াশুনোর বিশেষ ব্যাপার নেই। গত তিরিশ বছরে পুরো প্রদেশ থেকে মাত্র চারজন কাবুলে গিয়ে কলেজে পড়েছে। জলের প্রচণ্ড অভাব। কিছু লোক পাম্প লাগিয়েছে, তারাই বাকিদের জল দেয়। এখানকার বেশির ভাগ লোকই কাবালি বা tribesman। তাই এখানে কাবালি কানুনই চলে। গ্রামের বড়রা শাস্তি ঠিক করে দেয় ও তা নিয়ে কোনও বচসা হয় না। যদি কেউ কারুর গাড়ি চুরি করে তা হলে গাড়ি তাকে ফেরত দিতেই হবে। খুন হলে পরে খুনিকে মরতেই হবে। সোজা হিসেব। তবে এখানে খুব একটা কানুন অলঙ্ঘন হয় না। এমনকী তালিবানদের সময় এসব অঞ্চলে শান্তি ছিল।

এখানকার লোকেরা বিশেষ পলিটিক্স বোঝে না। পাকিস্তান থেকেও যখন লোকেরা আসত আমরা তাদের বলতাম— এসব থেকে আমাদের দূরে রাখ।"

ডা. কুরেশি পুরো বক্তৃতাটা অনুবাদ করে দিলেন এবং তারপর শুরু হল অ্যাম্বাসাডারের বক্তৃতা— "ভারতবর্ষ আফগানিস্তানের অনেক পুরনো বন্ধুত্ব ইত্যাদি... মনে হচ্ছে যেন ভাই আরেক ভাইয়ের বাড়িতে এসেছে। তার জন্য সেবা করবে। এমনকী ডাক্তারও সঙ্গে নিয়ে এসেছে এখানকার হাসপাতাল দেখবার জন্য।" পাস্তুতে অনুবাদ শুনে পাঠানের দল আনন্দে আত্মহারা হয়ে হইহই করে হাততালি দিয়ে উঠল।

মিটিং শেষ হল। এবার খাবার পালা। চার-পাঁচটা গাড়ি ভরে আমরা মিছিল করে গভর্নরের গেস্ট হাউসের দিকে এগোলাম। সবাই তড়িৎ বেগে রাস্তা ছেড়ে দিল। সারানের বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা মাঠ-ঘাট দিয়ে লাফাতে লাফাতে যেতে লাগলাম। এদিককার বাড়িগুলো এক ধরনের। সিমেন্ট বা কাঠের কোনও বালাই নেই। মাটির তৈরি বিশাল উঁচু দেওয়ালওয়ালা বাড়িগুলো দেখলেই রাজস্থানের কোনও কেল্লার কথা মনে পড়ে। প্রচুর বাড়ির এলাকা প্রায় পাঁচশো ফুট লম্বা ও ততোধিক চওড়া। জমির তো কোনও অভাব নেই। যে যত বড় বাড়ি চায় করতে পারে। ফুট দেড়েক চওড়া মাটির দেওয়াল। এর কোনায় চৌকো গম্বুজের মতো ওয়াচ টাওয়ার জাতীয় ব্যাপার। ঢোকবার জন্য শুধুমাত্র একটা ছোট লোহার গেট। তার ভেতরে সবজির ক্ষেত। কুয়ো আছে। ওয়াচ টাওয়ারে সালোয়ার পরা দ্বাররক্ষী দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরের লোকেদের বাড়ির ভেতরের গতিবিধি কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

গভর্নরের গেস্ট হাউসটা একটা একতলা মাটির বাড়ি। একটা লম্বা ঘরে ফরাসের ওপর বসতেই প্লাস্টিকের দস্তরখান বিছিয়ে খাবার এসে গেল— কাবুলি নান, মাংস, কোর্মা, চাটনি, স্যালাড, ফিরনি, কোক, বিস্কুট যা পেরেছে সব এনে হাজির করেছে। আমাদের চারদিকে একগাদা পাগড়ি পরা লম্বা চওড়া পাঠানরা জেঁকে বসল। এরা মনে হয় এখানকার মন্ত্রীর দল। দরজায় উৎসুক জনতা হাঁ করে আমাদের খাওয়া দেখতে লাগল। জানলা দিয়ে বাচ্চাদের দল খাবার দেখে ঢোঁক গিলতে লাগল। তাদের— "বুরোবাচাবুরো" বলে তাড়ানো হল।

গভর্নর এক লম্বা চওড়া দাড়িওলা পাঠানকে দেখিয়ে বললেন, "এখানে অনেকেই আছে যারা ভারতবর্ষে অনেককাল ছিল। এও তাদের মতো একজন।"

অ্যাম্বাসাডার উৎসুক— "বেশ, বেশ কোথায় ছিলে?"

"কলকাতায় ছিলাম কুড়ি-পঁচিশ বছর।"

এবার আমার কানগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

অ্যাম্বাসাডার— "বাংলা জানতে হো?"

"জি!"

"ফির ইনসে কুচু বাতচিত কিজিয়ে।" বলে আমার দিকে দেখালেন।

আমি কী কথা বলব ভেবে পেলাম না। অবশেষে বললাম— "কিছু বলুন?"

"কী বলব? আপনি প্রশ্ন করুন আমি জবাব দিব।"

আফগানিস্তানের ওই রুক্ষ দুর্গম গন্ডগ্রামে এক বিশালাকার পাঠানের সঙ্গে একজন রোগা মতো বাঙালির বাংলাবার্তা শুনে জনতার ভিড় হতচকিত। মিনিটখানেক একদম 'পিনড্রপ সাইলেন্স,' তারপর হঠাৎ "হো হো" চিৎকার, হাসি, হাততালি ও উরু চাপড়ানোর ঝড় উঠল। অ্যাম্বাসাডার ও ডা. কুরেশি হেসে কুটিপাটি।

আমার গত কয়েক মাসের খোঁজ শেষ হল। মিনির সেই কাবুলিওয়ালাকে আজ আমি খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু এ তো কাবুলের লোক নয়, তবে কাবুলিওয়ালা কেন হবে। হয়তো আফগানিস্তান বলতেই কাবুল বোঝাত। তাই সব পাঠান বলতেই কাবুলিওয়ালা বলা হত। বা হয়তো যেহেতু এখানকার কাবালি ধরনের লোকেরাই ভারতবর্ষ যেত ব্যবসা করতে তাই কাবালি থেকে কাবুলি হয়ে কাবুলিওয়ালা হয়ে পড়েছে। হাসিমুখো, দাড়িওয়ালা পাঠানের নামটা জিজ্ঞেস করা হল না— হয়তো বলত রহমতুল্লাহ বা রহমত। তবে নাম নিয়ে আর কী হবে? লোকটাকেই তো পাওয়া গেছে। তার বুকপকেটে বোধহয় নোংরা কাগজের চিরকুটে বাচ্ছা মেয়ের হাতের ছাপ আর থাকবে না— সে তো এখন তার বাবার সঙ্গেই থাকে।

কাবুলিওয়ালা বহু বছর ধরে বড় বাজারে থাকত এবং হ্যারিসন রোড ও তার আসেপাশের গলির বাড়িতে বাদাম, আখরোট, পেস্তা বিক্রি করত। পরে অবশ্য কাপড়ের ব্যবসাও শুরু করেছিল। দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকার ফলে

বাংলাটা বেশ সড়গড় হয়ে পড়েছে। রবি ঠাকুরের গল্পের কথা জিজ্ঞেস করাতে সে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

খেয়ে-দেয়ে আমি চলে গেলাম হাসপাতাল তদারক করতে। অনেকটা জায়গা জুড়ে সিমেন্টের তৈরি নতুন হাসপাতাল গড়ে উঠছে। তার পাশে কয়েকটা ভাঙা চোরা মাটির ঘরে পুরনো হাসপাতাল। আমি ভিসিটিং কনসালটেন্ট হয়ে সেখানে রাউন্ড শুরু করলাম। পেছনে ডাক্তারের ভিড়। অবশ্য সার্জারির কেস খুব একটা ছিল না। দু-একজন বাংলাভাষী রোগীও দেখা দিল। এরাও কিছুকাল কলকাতায় ছিল। রাউন্ড শেষ হওয়ায় দু'জন ডাক্তার আমার জামা খামচে ধরে বলল, "একবার চিকিৎসা বিভাগে চলুন, কিছু কথা আছে।"

"কিন্তু ওখানে যাবার কথা তো আমার নয়। কে বলেছে ওখানে যেতে?"

"আমাদের গভর্নর বলেছিলেন। একবারটি আসুন না। ওখানে বসে সব ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে।"

এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ, নাছোড়বান্দা ডাক্তার আমাকে হাত ধরে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে গেল চিকিৎসা বিভাগে। অফিসের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। ভাঙা জানলা, দরজার বদলে ছেঁড়া কম্বল। মেঝেতে গর্ত আর বিজলির কোনও ব্যবস্থাই নেই।

"কিন্তু ওই হাসপাতালটা তো বেশ ভালভাবে তৈরি হচ্ছে।"

মহম্মদ হানিফ বলে এক ডাক্তার আমাকে একটা ভাঙা চেয়ারে বসিয়ে তার বক্তব্য শুরু করল, "ওই হাসপাতালটা আরব দেশের এক এনজিও-র দল তৈরি করছে। ওরা আমাদের বিশেষ পাত্তা দেয় না।"

"কিন্তু হাসপাতাল হলে তো লোকেদের সুবিধে হবে?"

"কী সুবিধে হবে? যে সার্জেনের সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে সে অপারেশন করতেই জানে না। কালই হাসপাতালে এসেছে। বাকি ডাক্তাররাও তাদের নিজেদের দোকান থেকে রুগিদের দিয়ে এলোপাথাড়ি ওষুধ কেনায়। এরা শুধু এনজিও-র কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নিজেদের পকেট ভরে। এই তো সেদিন একজন মহিলা ডেলিভারি করাতে হাসপাতালে এসেছিল। হাসপাতালের কোনও ডাক্তার তাকে কিছুই করতে পারল না। অগত্যা তাকে ট্র্যাকটরে করে গাজনি নিয়ে যেতে হল। রাস্তাতেই তার ডেলিভারি হয়ে গেল। আল্লার খাতিরে সে এখন ভাল আছে।"

"তোমরা তো রুগি দেখতে পারো?"

"আমরা দেখবটা কোথায়? আমাদের অফিস তো দেখছই। এই বারান্দার এক কোনায় চাদর পেতে আমরা দিনে পঁচিশ-তিরিশটা রুগি দেখি। W.H.O-এর দেওয়া কয়েক বাক্স ওষুধ আছে সেগুলো বিতরণ করা হয়। এসব জায়গায় বিশেষ কোনও এনজিও আসতেই চায় না। সবাই জানে এখানে তালিবান আর বিন লাদেনের লোকেরা থাকে। এমনকী সরকারের লোকেরাও এদিকে পা মাড়ায় না। গত ন' মাস ধরে আমরা এক আফগানি পাগারো পাইনি। পঁচিশ-তিরিশ বছর পরে তোমরাই হচ্ছ প্রথম বাইরের লোক যারা এখানে এলে। আরব এনজিও-র হাসপাতালটা পুরো তৈরি হবার পরে যদি বাইরে থেকে কোনও ডাক্তার আসে তাহলেই কিছু উন্নতি হবে। এখানকার ডাক্তার বা প্যারা মেডিকেলের দ্বারা কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নেই। সবাই যে যা পারছে লুটে পুটে খাচ্ছে। তবে আল্লা মেহেরবান তোমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা জানি তোমরা আমাদের সাহায্য করবে। দয়া করে আমাদের হাসপাতালটা তৈরি করে দাও। পাক্তিকার লোকেরা তোমাদের চিরকাল দুয়া দেবে।" বলে মহম্মদ হানিফ আমার হাতটা আঁকড়ে ধরল।

আমি কী করব ভেবে পেলাম না। স্বাস্থ্যর অবস্থা যে অত্যন্ত মর্মান্তিক তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুখে বললাম, "অ্যাম্বাসাডারকে সব কথা বলব। হিন্দুস্থান সরকার থেকে যতটা সহায়তা করা যায় আমরা তা করব। আপাতত আরব এনজিও-দের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। ইনসাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বিকেল নাগাদ গভর্নরের আয়োজিত মনোরঞ্জন অনুষ্ঠান। গান বাজনা, কবিতা পাঠের কোনও বালাই নেই। আট দশটা ঘোড়সওয়ার ঘোড়া নিয়ে এদিক-সেদিক লাফিয়ে বেড়ালো। গভর্নর একটা কালো ঘোড়া তিরের বেগে দৌড় করিয়ে "টেন্ট পেগিং" দেখালেন। চারদিকে সারানের জনতার ভিড়। অবশ্য এদের জন্য ঘোড়সওয়ারিটা বিশেষ আকর্ষণীয় নয়। সবার দৃষ্টি কিন্তু অন্য মনোরঞ্জনের দিকে— "আমরা"। উৎসুক জনতার ভিড় আমাদের গোল করে ঘিরে হাঁ করে দেখে চলেছে। নিজেদের মধ্যে বকবক আর হাসি ঠাট্টা করছে। কী যে আমাদের এত দেখছে বুঝে পেলাম না। অবশ্য কলকাতায় যদি মঙ্গল গ্রহ বা ক্রেনিয়াস থেকে অ্যাং এসে পদার্পণ করত তা হলে আমাদেরও

হয়তো এরকমই অবস্থা হত। আর তারা যদি হঠাৎ করে আমাদের সঙ্গে কথা বলত তা হলে তো একেবারে বাজি মাত।

সন্ধেবেলা আবার 'মিটিং'। সেই বিশাল-বিশাল পাঠান হাততালির ঝড় আর হিন্দুস্থানিদের বাহবা।

আবার সেই গাদাখানেক খাবার আর একরাশ লোক। একবার মনে হল যে যা পারছে ঢুকে খেয়ে-দেয়ে হাত মুছতে মুছতে চলে যাচ্ছে। অবশ্য আমাদের আলাদা ঘরে দস্তরখান বিছিয়ে তোওয়াজ করে খাওয়ানো হল। খাবার পরে দস্তরখান উঠে গেল আর তার জায়গায় সাদা ধবধবে চাদর পাতা হল। আমরা সেখানে শুয়ে পড়লাম।

রাত্রে ঘুম ভালই হল। ঘরের একপাশে একটা উঠোনে মুখ ধুয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। একজন পাঠান যে এককালে ভারতবর্ষে ছিল আমার মতিগতি বুঝতে পারল।

"বাথরুম তো এখানে নেই। একবার বাইরে গিয়ে দেখুন-ই না। মাঠে হালকা হওয়া যে কি আরাম সেটা বুঝতে পারবেন।" আমি একটা লোটায় জল ভরে অতিথি গৃহের বিশাল উঁচু ও মোটা মাটির প্রাচীর পার করে বাইরে এলাম।

সকাল হয়েছে। ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া বইছে, হালকা কুয়াশার আমেজ। দূর দূর অবধি শুধু বালি, হালকা খয়েরি মাটি ও ছোট ছোট পাথর। অনেক দূরে একটা মাটির প্রাচীরওলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আশে-পাশে কোনও গাছ বা ঝোপঝাড় কিছুই নেই। কোনও পাখির আওয়াজ নেই, এমনকী কাকও দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যে দিয়ে আমি দিনের রাজকার্য সারতে গেলাম। দেওয়ালের ধার দিয়ে ডানদিকে যেই ঘুরব তখন গেটের পাশে দাঁড়ানো ভারতীয় দূতাবাসের Security Guard চাপা গলায় বলে উঠল, "স্যার ওদিকে যাবেন না, ওখানে অ্যাম্বাসাডার গেছে।" আমি পোঁ-পোঁ করে উলটো বাগে দৌড় দিলাম।

ঠান্ডা বাতাস খেতে খেতে রাজকার্য সারার আলাদা আরাম। পাঠানটা ঠিকই বলেছিল।

খেয়ে-দেয়ে আবার মিটিং। অজস্র ধন্যবাদ। হাসি হাসি বিগলিত মুখ। আর

ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে অনেক আশা। গভর্নর আমাদের সবাইকে সিল্কের কাপড় উপহার দিলেন। বললেন এটার থেকে যখন সালোয়ার করবে তখন পাক্তিকার কথা মনে পড়ে যাবে।

এবার ফেরার পালা। অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া হল। একইরকম বালি, পাথরওলা দুর্গম রাস্তা। এসব এলাকায় দেখলাম রাস্তার ধারে হ্রদ থেকে ড্যাম করা হয়েছে। রাস্তার অবস্থাও এক এক জায়গায় বেশ ভাল ছিল। এগুলো সব তৈরি হয়েছিল রুশিদের আফগানিস্তান দখল করার সুবাদে। মাঠের মাঝখানে দেখতে পেলাম বিশাল বিশাল লোহার বাক্স। রুশিদের তাড়াবার জন্য আমেরিকা যখন ওসামা বিন লাদেন আর গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ারের মতো অজস্র মুজাহিদ্দিনদের আশকারা দিয়ে পোষণ করছিল তখন এই ধরনে লোহার বাক্স করে তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র পাচার করত।

দূরে একটা বড় শহর দেখতে পেলাম। পাকা বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, বাজার আর বাস ট্যাক্সি। মোটামুটি বড় জায়গা। ড্রাইভার বলল, এটা হচ্ছে গাজনি।

সেই গাজনি। এখান থেকেই মহম্মদ বলে এক পাঠান ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। সতেরোবার গুজরাতের সোমনাথ মন্দির লুঠমার করে অজস্র ধনরত্ন সংগ্রহ করেও তার মন ভরেনি। ইতিহাস বলে সে যখন মারা যাচ্ছিল তখন বুঝতে পেরেছিল যে অত ধনরত্ন সে নিয়ে যেতে পারবে না— "জান্নাত" বা "জাহান্নমে"। মহম্মদের হুকুম হয়েছিল তার সমস্ত ধনরত্ন যেন তার সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়।

আজ সেই মহম্মদের রাজত্বর কোনওই চিহ্ন নেই। তার দুর্গের দুটো ভাঙা মিনার শুধু অক্ষত আছে। সেই মিনারের ধারে একটি পরিত্যক্ত বাগান। সেখানে আশে-পাশের বস্তির ছেলেরা ফুটবল খেলছে, ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আর সেই বাগানের এক কোনায় একটা ভাঙা গম্বুজওয়ালা মসজিদের মধ্যে আফগানিস্তানের এককালের সম্রাট গজনির মহম্মদের সমাধি। এককালে এখানে নিশ্চয়ই হাজার হাজার লোক মাতন করে রাজাকে বিদায় জানিয়েছিল। আজ সেই মসজিদ যত্ন করবারও কোনও লোক নেই। কর্পূরের মতো সবকিছু যেন উবে গেছে।

প্রেম

আমাদের বাড়ির ভিসিডি চোর ফারহাদের দাদা পলিক্লিনিকের তারজুমান। এর নাম জাবাদ। কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, ফর্সা, লম্বা, টিকোলো নাক আর শান্ত স্বভাব। যে কোনও বলিউডের নায়কের চেয়ে ভাল দেখতে। আমাদের সঙ্গে ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। ইংরিজির ওপর মোটামুটি দখল ছিল। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করত।

একদিন আমাদের দিয়ে চাকরির দরখাস্ত লেখাল। সে জাপানি দূতাবাসে তারজুমানের চাকরি চায়। দরখাস্ত লেখাবার দু' সপ্তাহের মধ্যে তার চাকরি হয়ে গেল। মাসে পাঁচশো ডলার। ভারতীয় পলিক্লিনিকের আশি ডলারের চাকরি ছেড়ে সে জাপানি দূতাবাসে কাজ নিল। অবশ্য আমাদের তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু জাবাদ চলে যাচ্ছে বলে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। জাবাদ সেসব বুঝতে পেরে তার জায়গায় একজন মেয়েকে চাকরি দিয়ে গেল। মেয়েটার নাম রুবিনা। সতেরো-আঠারো বছর বয়স। হিন্দি ছবি দেখে ভালই হিন্দি জানে। ফর্সা রং, মাঝারি উচ্চতা, বেশ সুন্দরী। তালিবানদের সময় এদের পরিবার পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল। আজকাল রুবিনার বাবা এদিক-ওদিক কুলিগিরি করে পয়সা রোজগার করে।

জাবাদ রুবিনাকে কী করে চিনত সেটা জানি না তবে পলিক্লিনিক ছাড়ার পরেও সে প্রায়শই আমাদের কাছে রুবিনার খবরাখবর নিত। মাঝে মধ্যে পলিক্লিনিকে এসে পড়ত। আমাদের সঙ্গে গল্প করত। আর দূর থেকে আড়চোখে রুবিনাকে দেখত। বোধহয় সাহসে কুলোত না তার সঙ্গে দুটো কথা বলার।

জাবাদ অনেকদিন ধরেই আমাদের চাকরির দরুণ খাওয়াবার কথা বলছিল। একদিন সেটা পাকা হল। আমি ও ডা. বালা এবং তাঁর সঙ্গে রুবিনাকে সে খাওয়াতে চাইল। অবশ্য ব্যাপারটা বেশি দৃষ্টিকটু না হয় সেজন্য

পলিক্লিনিকের হেড নার্স ফারিদাকেও সে নিমন্ত্রণ করল। দুপুরে পলিক্লিনিক সেরে আমরা সবাই যখন ট্যাক্সিতে উঠলাম, তখন হঠাৎ ডা. জারওয়ারি "কোথায় যাচ্ছ তোমরা, আমিও যাব" বলে গাড়িতে বসে পড়লেন।

"এই বুড়োটা আবার কেন আসছে?" ফরিদার মন্তব্য।

এদিকে রুবিনা ঘাবড়ে গিয়ে তার বাড়িতে কিছুই বলেনি। দুপুরে যে ফিরতে দেরি হবে সেটা তার বাড়ির লোককে জানানো দরকার। একটা নাগাদ আমরা জাবাদের গাড়িতে গাদাই হয়ে বেরুলাম। সামনে আমি, জাবাদ ও ডা. বালা। পেছনে ডা. জারওয়ারি, ফারিদা ও রুবিনা। কাবুলের এক গলিঘুপচি অঞ্চলে মাটির বাড়িতে রুবিনারা থাকে। গাড়িটা মোড়ের মাথায় রাখা হল। ফারিদা ও রুবিনা নীল বোরখা পরে বাড়িতে গিয়ে বলে এল যে রুবিনা ফারিদার সঙ্গে বাইরে খেতে যাচ্ছে। ফিরে এসে বলল, বাড়িতে শুধু দিদিমা রয়েছে। বাকিরা ঘণ্টা দুই পরে ফিরবে। তাকেই বলে এলাম। জাবাদ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

আজকাল রাস্তাঘাটে বাজারে দোকানে দু'-তিনজন মেয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। অবশ্য বেশিরভাগই হালকা নীল বোরখা পরে থাকে। তবে সন্ধেবেলা তারা আর বেরোয় না। এসব অঞ্চলে সন্ধেবেলা ডেটিং করা একটা কাল্পনিক ব্যাপার। আমরা জনতার ভিড়ে, দুপুর দেড়টার কড়কড়ে রোদে ডেটিং করতে এবং ডেটিং জোগাতে চলে এলাম। গুলফারোসী রাস্তার কাছে 'মার্কো পোলো' রেস্তোরাঁতে।

কোনার একটা টেবিল নেওয়া হল। ফারিদা ও রুবিনা একপাশে এমনভাবে বসল যে তাদের পিঠটা অন্য লোকেদের দিকে থাকে। বসবার পরে মুখ থেকে বোরখাটা সরালো কিন্তু মাথা থেকে সরালো না। "এখন তো অনেকদিন হল তালিবানরা চলে গেছে, তোমরা এখনও কেন এত ভয়ে ভয়ে থাকো?"

"কে জানে কোন লোকটা কীরকম? এখানে কোনও কিছুরই স্থিরতা নেই।" ফারিদার জবাব।

আশেপাশে দেখলাম আমাদের ছাড়া এক কোনায় একটি আফগানি পরিবার তিনটে বাচ্ছা সমেত খাবার খাচ্ছে। বাকি রেস্তোরাঁয় দাড়িওয়ালা, গোঁফওয়ালা, সালওয়ার, কোট পরা নানা আকারের পুরুষ মানুষ খাচ্ছে। এরা সবাই আমাদের সন্দিগ্ধ চোখে দেখছিল। বোরখা পরা দুটো মেয়ে তার সঙ্গে একটা বুড়ো আর তিনটে জোয়ান ছেলে, তার মধ্যে দুটো হিন্দুস্থানি না

পাকিস্তানি; এরা যে কারা, কী সম্পর্ক, কী মতলব কেউ বুঝতে পারেনি। আমরা অবশ্য বম্বের ভাষা মতন—"বিন্দাস!"

মেয়েদের অবস্থাটা বেশ সঙ্গীন। এরা দু'জনে নিজেদের মধ্যেই গল্প করে কাটাল। মাঝে-সাঝে আমাদের দিকে তাকিয়ে এক-আধটা কথা বলছিল। এদের মনের ভেতর ভয়টা ভালভাবে গেঁথে আছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কখন কী হবে কেউ জানে না। এই সরকারই বা ক'দিন চলবে? এদের বদলে যারা আসবে তারা যদি তালিবানদের চেয়েও খারাপ হয়? যদি এ ধরনের সরকার টিকেও থাকে তাহলে হয়তো কম করে আট-দশ বছর লাগবে এসব পুরনো কায়দা-কানুন বদলাতে। হয়তো একটা পুরো প্রজন্ম লেগে যাবে এ ধরনের মনোভাব থেকে মুক্তি পেতে।

খাবারটা মোটামুটি ছিল। নান, পোলাও, কাবাব, কোফতা ও স্যালাড। জাবাদ লজ্জিত মুখে এক কোনায় বসে খাবারগুলো খুঁটতে লাগল। রুবিনার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলল। ওদিকে ফারিদা হঠাৎ জাবাদের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প জুড়ে দিল। রুবিনা একমনে বসে কাবাব চিবোতে লাগল। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে গোলমেলে ঠেকল। ডেটিং-এর তিরটা যেন এদিক-সেদিক চলে যাচ্ছিল।

দশ লাখ আফগানির বাণ্ডিল থেকে জাবাদ খামচে অনেকগুলো নোট বার করে বিল মেটাল। জাপানি দূতাবাসে কাজ করে সে অনেক সপ্রতিভ হয়ে গেছে। তবে রুবিনার ডেটিং-টা যে মাঠে মারা গেছে তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

জাবাদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। তার প্রেমের খবর জানতে আমরা একদিন পলিক্লিনিক গেলাম। নার্সরা আমাদের দেখে হাসিমুখে একটা সুখবর দিল, রুবিনার বিয়ের ঠিক হয়েছে। আমরা হাঁ। জাবাদ তো তা হলে বাজিমাত করে ফেলেছে। ছেলেটা তা হলে মানুষ হল।

"বাঃ! খুব ভাল খবর। কবে বিয়ে?"

"এখন তো সবে সাগাই হয়েছে। ছেলেটা তার ব্যবসা সামলে পরের বছর বিয়ে করবে।"

"ব্যবসা! কীসের ব্যবসা?"

"ও তো একটা দরজি। দোকান তৈরি করছে।"

আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত। ক্যাবলা জাবাদটা কিছুই করে উঠতে পারেনি। তার প্রেমের গল্প শুরু করতে সে এত দেরি করেছে যে ইতিমধ্যে রুবিনার বাবা তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে।

রুবিনার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম সে জাবাদের মনের কথা কিছু জানেই না। বিশেষ কোনও আক্ষেপও নেই।

"আচ্ছা যদি সাগাইটা ভেঙে দাও বা অন্য কোথাও তোমার বিয়ে হয় তা হলে কী হবে?"

"তা কি করে সম্ভব! এ তো হতেই পারে না। যদি ছেলের কোনও ভয়ানক দোষ না থাকে তা হলে এটা করা যায় না।"

জাবাদের সঙ্গে কয়েকদিন পরে দেখা হল। করুণ মুখ করে তাকে রুবিনার খবরটা দিতে বাধ্য হলাম আমরা। সে অবশ্য নির্বিকার। আরও চারটে আফগানির মতো বলল, "পরোয়া নি অস্ত্"। তার প্রথম প্রেম বুকের মধ্যেই কবরস্থ হল।

জাবাদ পলিক্লিনিক যাওয়া একদম বন্ধ করে দিল। জিজ্ঞেস করাতে বলল, "রুবিনার সঙ্গে সে গল্প-টল্প করে। তবে পলিক্লিনিক না যাবার অন্য কারণ আছে।"

"আবার কী কারণ?"

"ওই ফারিদাটা আমার প্রেমে পড়ে গেছে। দেখা হলেই গায়ে পড়ে গল্প করতে আসছে।"

মার্কো পোলো রেস্তোরাঁয় আমার সন্দেহটা ঠিক বেরলো।

"ফারিদাও তো মোটামুটি দেখতে। ফর্সা আছে। অনেক বকবক করতে পারে। খারাপ কী?"

"পাগল! ওই বুড়ির সঙ্গে কে আরোসি করবে? আমার চেয়ে আট বছরের বড়।"

প্রেমের ত্রিভুজ হয়ে গেছে। একেবারে বলিউড মার্কা। তবে বলিউডি হ্যাপি এন্ডিং এতে নেই। ত্রিভুজের কোনও বাহুই একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়নি।

প্রেমের জোয়ারে

আমাদের ও.টি. তখনও তৈরি হয়নি। কনট্রাক্টর আসে, একটু একটু করে কাজ করে। আমরা দুটো ঘরে রুগি দেখি, ওষুধপত্র গুছোই আর মাঝে-মধ্যে দূতাবাসে গিয়ে সার্জারির সরঞ্জাম আনাবার তাগাদা দিই। মাঝেমধ্যে নতুন গড়ে ওঠা ও.টি.-র তদারকি করতে যাই।

ও.টি.-তে চার-পাঁচটা দাড়িওয়ালা আফগানি ওটি অ্যাসিসট্যান্ট সারাদিন বসে বসে চা, নান, কিসমিস আর বাদাম খায়। এরা সবাই বেকার। এছাড়া তিনজন ও.টি. নার্স আছে। ওমায়েরা, শুক্রিয়া ও আরিফা। ওমায়েরা ও শুক্রিয়া বয়স্কা। আরিফা তরুণী। ফর্সা, মোটাসোটা, টিকোলো নাকওয়ালা, অবিবাহিত। শুক্রিয়া উর্দু বা ইংরিজি জানে না। কাজেই আমাদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হত না। ও.টি.-র বাকি লোকেরাও ফার্সি ছাড়া বিশেষ কিছু জানে না। ওমায়েরা ভাঙা ভাঙা ইংরিজি জানে। তার সঙ্গে প্রায়শই গল্প হয়। তার বাড়ি পাঞ্জশের উপত্যকায়। সে মাসুদকে স্বচক্ষে দেখেছে এবং তার ভীষণ ভক্ত। তার মতে মাসুদের মতো ভাল লোক আফগানিস্তানে জন্মায়নি। তালিবানদের সে ঘৃণা করে এবং গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ায় "মা পাঞ্জশেরি অস্ত্"। রাস্তাঘাটে সে বোরখা পরে না, শুধু মাথায় একটা কালো হিজাব রাখে।

আরিফার সঙ্গে বিশেষ কথা হত না। মাঝে মধ্যে এক-আধটা ফারসি ও উর্দু মেলানো কথা হত। কিছুদিন আগে তার শরীর খারাপ হল। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথা ও গায়ে-হাতে ব্যথা ইত্যাদি। ওমায়েরার কথায় আমি তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ দিলাম। রক্ত পরীক্ষার কোনও বালাই নেই। আন্দাজে ম্যালেরিয়ার ওষুধ দেওয়া হল।

"আরিফা এখন কেমন আছে?"

"She, all right, you give medicines now no sick." তারপর ফিস ফিস করে বলল, "Actual she no sick."

"তার মানে? ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিয়েছি, কাজ করেছে। তাই এখন ভাল আছে।"

"No you don't know. She very shy. But she tell me, she like you and she love you. I also like you, but only like you. But she love you. she tell me."

অ্যাঁঃ! সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। এ আবার কি আপদ! কিন্তু সে তো আমায় সেরকম কিছু বলেনি। বা হাবভাব দেখায়নি। আমার কাছে কোনও তো ইঙ্গিত আসত?

"No, she very shy, she is very anxiety, in Kabul it is very difficult. This is Khad Hospital—Afganisthan secret service. Everyone here is secret people. She is very anxiety.

বুঝলাম যে আরিফার প্রেম উথলে পড়ছে কিন্তু ভয়ে প্রকাশ করতে পারছে না। শুধু ওমায়েরাকে বলতে পেরেছে। আমার অবশ্য মনে হল যে ওমায়েরার ভীমরতি হয়েছে। আরিফার হাবভাব দেখে একবারও মনে হচ্ছিল না যে তার আমার প্রতি কোনওরকম দরদ জেগেছে।

ওমায়েরাকে আমার বউ-বাচ্ছার কথা বলাতে বলল, "পারওয়া নি অস্ত্, She will be her sister."

এই প্রেমকাহিনি বেশিদূর না এগোলেই ভাল।

সোমালি

ইন্দিরা গাঁধী হাসপাতালে আমাদের পলিক্লিনিকে একটা চায়েখানা ছিল, সেখানে বেলার দিকে হালকা খয়েরি রঙের বিনা দুধের চা তৈরি হয়। চায়েখানার দেখাশোনার ভার ছিল আদিলা বলে এক বছর পঁচিশেকের মহিলার ওপর। ফুটফুটে দেখতে রোগা ফরসা আদিলার বর এককালে ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করত। তালিবানদের হাতে তার মৃত্যু হয়। তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে সে এখন চায়েখানায় চা তৈরি করে সংসার চালায়। মুখ চোখে বয়সের ছাপ একটু বেশি পড়েছে কিন্তু মন মেজাজ এখনও উৎফুল্ল। এক বর্ণ হিন্দি বা ইংরেজি জানে না। প্রত্যেকদিনই আমাদের সঙ্গে খুব উত্তেজিত হয়ে দরি ভাষায় বকবক করে। আমরা অবশ্য ওর সেই দ্রুত দরি বিশেষ না বুঝতে পেরে, "হে-হে হুঁ হুঁ ফামেদাম" বলে তাকে সন্তুষ্ট করি। আদিলার অনেক দিনের ইচ্ছে আমরা সবাই ওর গ্রামে গিয়ে ভোজ করি।

রবিবারে ছুটির দিন। ড্রাইভার আসবে না। আদিলাকে নিয়ে তার মামা আমাদের বাড়ি এল। ছ'জন ডাক্তার, পাঁচজন নার্সিং-এর লোক। আদিলা ও তার মামা চেপে বসল আমাদের রাশিয়ান গ্যাজেল ভানে। বাঁ হাতে স্টিয়ারিং-ওয়ালা এই ভ্যানটা দূতাবাস থেকে আমাদের যাতায়াতের জন্য দেওয়া হয়েছিল। গাড়ি চালালাম অগতির গতি—আমি। ভারতবর্ষে গাড়ি চালানোর পরে এই ভ্যান চালানোর সময় মনে হচ্ছিল যেন আয়না দেখে গাড়ি চালাচ্ছি। গিয়ার, ইন্ডিকেটর, রাস্তাঘাট সবই উলটোদিকে। কাবুল ছাড়িয়ে যখন আমাদের ভ্যান সালাঙের রাস্তা ধরল তখন আমার চালানো সড়গড় হয়ে গেছে।

সেই পুরনো রাস্তা। দু'দিকে দূরে দূরে পাহাড়। আর রাস্তার ধারে মাইলের পর মাইল আঙুরের ক্ষেত। এই আঙুরের ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে থেকে মাসুদের লোকেরা তালিবানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। তালিবানরা পরে ওইসব

অঞ্চলের গাছ কেটে ফেলে, কুয়োর জলে বিষ দিয়ে এখানকার চাষ-বাস ধ্বংস করে। আজ সেই আঙুরের ক্ষেতে সবুজ পাতা দেখা দিয়েছে। আবার আঙুর হতে বছর পাঁচেক সময় লাগবে।

আমাদের ভ্যান আশি কিমি স্পিডে বনবন করে যেতে যেতে হঠাৎ খটাং খটাং আওয়াজ শুরু করল। দেখলাম পেছনের স্লাইডিং দরজাটার লক খারাপ হয়ে সেটি আর বন্ধ হচ্ছে না। সেটাকে আধখোলা অবস্থায় রেখে দড়ি দিয়ে চেপে বাঁধা হল। দরজাটা ভ্যানের থেকে চার ইঞ্চি বেরিয়ে রইল।

রাস্তার বাঁদিকে হিন্দুকুশ পাহাড়। আর সেই পাহাড়ের পদতলে সবুজ ঘন জঙ্গল। এই অঞ্চলটার নাম সোমালি। পাহাড়ি ঝর্না, উর্বর জমির দরুণ সোমালি অঞ্চলে বিভিন্ন ফল-মূলের চাষ হয়। আদিলার বাড়ি সোমালির একটা গ্রামে।

বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা বাঁদিকে বাক নিলাম। কাঁচা রাস্তায় পড়া মাত্রই টায়ার পাংকচার এবং জ্যাক লাগিয়ে চাকা পালটানো। আশেপাশে কোনও গাড়ি সারাবার দোকান নেই। আমাদের গাড়িতে আর কোনও স্টেপনি নেই। গাড়ি বিগড়োলে এই গণ্ডগ্রামে মাইনফিল্ডের মধ্যে বসে থাকতে হবে। কাউকে খবর দেবার জন্য সেল ফোন বা রেডিয়ো-ও নেই।

গাড়ি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। চারদিক সবুজ। নীচে দেখা দিল সরু সরু ঝর্না। গাড়ির ধারে দেখা দিল চেরি, আর আলু-বালুর গাছ। আলু-বালুটার বাংলা বা ইংরিজি নাম আমার জানা নেই। এটা এখানকার ফল। দেখতে চেরির মতো তবে একটু ছোট আর খেতে টক-মিষ্টি। একবার মনে হল হয়তো ভারতের করমচা। কিন্তু গাছ দেখে ও ফল খেয়ে বুঝলাম সেরকম নয়।

আদিলা একটা জায়গায় নেমে পড়ল। তোমরা ঘুরে এসো। আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি— বলে সে মুখের ওপর বোরখা ফেলে, গাড়ি থেকে বেরিয়ে, তরতর করে পাহাড় দিয়ে নেমে চলে গেল। দেখলাম অনেক নীচে পাহাড়ি ঝর্না ও তার নীচে একটা গ্রাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে আমার ঘাম বেরিয়ে গেল। এবড়ো-খেবড়ো কাঁচা পাথুরে রাস্তা দিয়ে গ্যাজেল ভ্যান গোঁ-গোঁ করে ওপরে উঠতে লাগল। একপাশে ফলের জঙ্গল, অন্যদিকে গভীর খাদ। আর আমি প্রথমবার বাঁ হাতি গাড়ি চালাচ্ছি। পেছন ফিরে দেখি সবাই ভয়ে কাঁটা হয়ে মুখ আমসি করে বসে আছে। আমায় দেখে অবশ্য তারা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, "ভালই তো

যাচ্ছি, এই তো এসে গেছি প্রায়।" হঠাৎ ঝড়াং দুমদাম করে একটা আওয়াজ আর সবার চিৎকার। "আরে থাম থাম, গাড়ির দরজাটা পড়ে গেছে।"

ঢিলে দরজা কখন যে দড়ি ছিঁড়ে আলগা হয়ে গেছে সেটা কারুর খেয়াল ছিল না। সেটা খুলে পাশের পাহাড়ের গায়ে লেগে ভেঙে গাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেল। গাড়ি থামিয়ে দেখি গ্রামের ছেলেরা একটা বিশাল দরজা নিয়ে টানাটানি করছে। সেই দরজাকে চ্যাংদোলা করে গাড়ির ভেতরে রেখে আমরা আবার চলে পড়লাম।

গাড়ি আরও বিগড়োল। এবার গোঁ গোঁ থেকে গোঁৎ গোঁৎ আরম্ভ করল। ফার্স্ট গিয়ারের ওপর কোনও গিয়ার নিচ্ছে না। সামনের রেডিয়েটার থেকে হুস হুস করে বাষ্প বেরোতে লাগল। একসময় গাড়ি গড়-গড় করে কয়েক ইঞ্চি পেছনে গড়িয়ে গেল। ততক্ষণাৎ সবাই দুড়দাড় করে ভাঙা দরজার জায়গা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল। ড্রাইভার তো গাড়ির ক্যাপ্টেন সে গাড়ি ছেড়ে যাবে কোথায়? বাকিরা অবশ্য পাথর রেখে ঠেলে ঠুলে গাড়িকে দাঁড় করাল। এবার হাঁটা। গাড়ি থেকে নেমেই বিশাল এক তুত গাছের ফল খেয়ে আমরা এগোলাম। ইংরিজিতে এই ফলকে বলে মালবেরি।

মাটির বাড়ির গ্রাম। বাড়ির মাঝখানে মাঝখানে গমের খেত। আশেপাশে আখরোট, বাদাম, চেরি, আলু-বালু, আপেল আর তুতের গাছ। মাঝে মধ্যে একটা খুরমানি আর আলুবখরার গাছ রয়েছে। তারি মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা। আর সেই রাস্তার ধারে জংলি গোলাপের গাছ। দূরে দেখা যাচ্ছে হিন্দুকুশ পাহাড়। সব মিলিয়ে মনোরম দৃশ্য।

জঙ্গলের মধ্যে একটা সমতল এলাকা, সেখানে খাজা মহম্মদ আলির দরগা। ইনি সোমালি অঞ্চলের এক সুফি দরবেশ। দরগায় রং-বেরঙের রুমালের ঝালর। আর তা ছাড়া কবরের ওপরে সবুজ চাদর। বাগানের সিঁড়িতে বিশাল বিশাল বড় বড় গামলায় নানা রঙের ও আকারের ফুল। কাছে গিয়ে দেখি গামলাগুলো আসলে রুশি রকেটের ভগ্নাংশ, যেগুলো এককালে এইসব অঞ্চলে ফেলা হয়েছিল। আজ সেগুলোতে ফুল ফুটেছে।

আমরা সেখানে পৌঁছতেই চারদিক থেকে বিরাট দাড়িওয়ালা আফগানিরা ছুটে এল আমাদের খাতির করতে। তাদের মুখ চোখের উত্তেজনা দেখে বুঝলাম ওরা কোনও জন্মেও এসব অঞ্চলে কোনও বিদেশি তার ওপর ভারতীয়কে দেখেনি। হয়তো আর কোনওদিন বাইরের লোক এসব অঞ্চলে

আসবেও না। এক মিনিটের মধ্যে শতরঞ্চি, বালিশ, জল, তুত আর পাতলা ঘোল এসে পড়ল। যেন গুপী গাইনের ভূতের রাজার দেওয়া এক থালা খাবার। আমরা বিরাট চিনার গাছের তলায় মৃদু হাওয়া খেতে খেতে একপাশে হেলে পা ছড়িয়ে আধশোওয়া হয়ে এক হাত দিয়ে তুত ও অন্য হাত দিয়ে ঘোল খেতে লাগলাম। পাহাড়ি রাস্তার যাত্রার ধকল ও আমার ড্রাইভারির কেরামতির ফলে অনেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা কলরব।

দেখলাম তিনজন দাড়িওয়ালা আফগানি একটা বিশাল বড় হুঁকোতে কী সব ভরছে। আমায় একটা নরম মতো কালো ঢেলা দেখাল। এটা হল আফগানিস্তানের বিখ্যাত ক্যানাবিস গাছের তৈরি চরস। এই গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে গাঁজা, ভাং, সিদ্ধি, চরস তৈরি হয়। এই চরস বিক্রি করে এখানকার লোকেদের একটু-আধটু পয়সাকড়ি হয়। তালিবানদের সময় চরস ও আফিং সরকারিভাবে বিদেশি দালালদের হাত দিয়ে বিক্রি করা হত। অবশ্য তালিবানরা আফগানিদের এইসব জিনিস সেবন করতে দিত না। আফিমের কথা জিজ্ঞেস করাতে একজন বুড়ো নীচের দিকে আঙুল দেখাল। দেখলাম গমের ক্ষেতের পাশে গোলাপি ও বেগুনি ফুলওয়ালা দু'তিন ফুট গাছের অনেকগুলো খেত। কয়েকটা গাছে গোল বলের মতো হালকা সবুজ ফল রয়েছে। এগুলো সব আফিম গাছ। এ গাছের ফুল ঝরার পরে, ফলের রস থেকে আফিম তৈরি হবে। তারপর সেটা বিদেশে চালান যাবে। এই গাছের জন্যই একদিন চিন ও ইংল্যান্ডের মধ্যে আফিম যুদ্ধ হয়েছিল।

বুড়োরা হুঁকো ধরাল। হালকা একটা ঝাঁঝওলা মিষ্টি গন্ধ বেরোল। তিনজন বুড়ো এক-এক করে বিরাট শ্বাস ছেড়ে একরাশ ধুয়ো ছড়াল। তারপর বেদম কাশি। একজনের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো চরস শেষ ও বুড়োরা ধীর গতিতে চিনার গাছের তলায় বসল। চোখ তাদের ঢুলু-ঢুলু, মুখে তাদের 'রা'-টি নেই। এরা যে এখন এ জগতে নেই, সেটা বলাই বাহুল্য।

দরগা দেখে আমরা রওনা দিলাম নীচের দিকে। গাড়ি করে আদিলার গ্রামের কাছে এসে একটা ঝর্না পেরিয়ে চারটে চিনার গাছের তলায় এলাম। রাজকীয় ব্যবস্থা। সবুজ ঘাসের ওপর ফরাস ও গদিওয়ালা বিরাট বিছানা, সাত-আটটা বালিশ এদিক-ওদিক ছড়ানো। গদির একপাশে

তিন-চারটে আফগানি ছেলে আমাদের অপেক্ষায় খাতিরদারি করবার জন্য বসে আছে।

আদিলার মামা খাবার নিয়ে এল। বিশাল বড় (দু' ফুট চওড়া) গোল গোল নান। সঙ্গে এল কাবুলি পোলাও, ওশাক, বোলোনি আর দই। সঙ্গে আদিলার সন্দেশ এল। "সময় এত কম ছিল যে আমি গোস্তের ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি।" খাওয়ার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল; আগে যে ঘোল ও ফল খাওয়া হয়েছে সেটা সবাই ভুলে গেল। মিনিট পনেরোর মধ্যে খাওয়া শেষ ও আমাদের পেট ঢোলকের মতো ফুলে উঠল। এবার হাসফাঁস হয়ে চিৎ হয়ে শোবার পালা। আদিলার মামা ডা. হরির গোল পেটটা টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে তার ওপর একরাশ চেরি রাখল আর আমাদের হাঁসফাঁস অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে চেরি চিবোতে লাগল।

খাওয়া শেষ। আরাম শেষ। এবার ফেরার পালা। আমাদের পিকনিকের প্রধান উদ্যোক্তা আদিলাকে এখানে দেখা যাবে না। তার খাবারের প্রশংসা কালকে পলিক্লিনিকেই করতে হবে। সে-ই যে আমাদের এত খাতিরদারি করল সেটা একমাত্র তার মামা ছাড়া কেউই জানতে পারল না। হয়তো জানতে পারলে দাড়িওয়ালা বুড়োরা তাকে প্রাণেই মেরে ফেলত। অথচ এত লোকের খাবার ও সব ব্যবস্থা করতে, তার নিশ্চিতভাবে প্রাণপাত হচ্ছিল।

বিকেল হয়ে আসছে। গাড়ির গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে। আস্তে করলেই থেমে যাচ্ছে। কাজেই ঢালু পাহাড় দিয়ে নামবার সময় গাড়ি বনবন করে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা অবশেষে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। একটা ছোট হেঁচকি তুলে গাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। বনেট খুলে দেখি ডিস্ট্রিবিউটরের তার ঢিলে।

তার-টার ঠিকঠাক করার পর কিছুক্ষণ ভাল চলল, আবার হেঁচকি। এবার ফিল্টার পরিষ্কার করার পালা। কয়েল ঠান্ডা করার ব্যাপার। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ডা. বালার পেটে পোলাও আর নানগুলো এবার হেঁচকি তুলল। গাড়ি থামানো হল।

"ভীষণ আর্জেন্ট"। সে কাটা আঙুর গাছের ক্ষেতের দিকে দৌড়ে গেল।

"ওদিকে যে মাইন থাকতে পারে।"

"চুলোয় যাক মাইন। যে মাইন আমার পেটে ফাটছে....।" বলতে বলতে

সে ছুটে ঝোপের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। দশ মিনিট পরে ফিরে এল হাসি হাসি মুখ নিয়ে। হাতে একটা খালি কোকের বোতল।

"টয়লেট পেপার ছিল নাকি?"

"না এটাই সম্বল" বোতলটা দেখাল।

"কিন্তু ওতে তো কোক ছিল।"

"জানি তো"। আমাদের সবাইয়ের মুখ হাঁ।

"তা হলে কোক দিয়ে...!"

"উঃ দুর্দান্ত অনুভব।"

গাড়ি আর স্টার্ট নিল না। কয়েকজন ট্যাক্সি করে কাবুল রওনা দিল। এক ট্রাকওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করে গাড়ি টানাবার বন্দোবস্ত করা হল। পয়সাকড়ির হিসেব যখন হচ্ছে তখন গাড়ি হঠাৎ দুম করে স্টার্ট হয়ে গেল। আমরা তৎক্ষণাৎ রাশিয়ান ভ্যানে উঠে সাঁ-সাঁ করে গিয়ে গাড়ির মেজাজ বিগড়োনোর আগে সোজা বাড়ি পৌঁছলাম।

পরের দিন আমাদের ড্রাইভার কাইয়ুম গাড়িটার দিকে তাকিয়ে স্টার্ট করে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, "কী অবস্থা করেছ, কোথায় নিয়ে গেছিলে গাড়িটাকে।"

"হে হে মানে, হিন্দুকুশে পিকনিক।"

নাসির

কোহেমার্কাস হাসপাতালে আমার সঙ্গে একজন তারজুমান বসত। তার নাম নাসির। ভালই হিন্দি জানে। আমাদের হাসপাতাল গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধপত্র গোছায়। কার্ডবোর্ডের বাক্স তুলে রাখে। প্রায়শই দেখতাম কাগজের আর কাঠের খালি বাক্সগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রেখে সেগুলো দড়ি দিয়ে বাঁধছে।

"নাসির এসব নিয়ে কী করবে?"

"এগুলো আমার বাড়ির ছাদ তৈরি করতে কাজে লাগবে। বাড়ির দরজা, জানলা সবই তো ভাঙা, এগুলো দিয়ে সারাব। আমাদের বাড়িটা তো আশেপাশের বস্তির হাজারারা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।"

"কবে হয়েছিল এসব?"

"কোটেসাংগি বলে এক এলাকায় আমাদের বাড়িটা। উনিশশো অষ্টআশি সালে যখন রুশিদের সঙ্গে মুজাহিদ্দিনের যুদ্ধ বেড়ে গেল তখন সপরিবারে আমরা পাকিস্তান পালালাম। তোরখামের সীমানা পেরিয়ে আমরা পেশওয়ারের একটা ঘরে ছিলাম এক বছর। আমার বাবা-মা-বোন হিন্দুস্থান চলে গেল। আমার ভাই ও আমি ছোকরা ছিলাম বলে ভিসা পাইনি। তখন আফগানিস্তান থেকে প্রচুর ছোকরা টেররিস্ট হয়ে কাশ্মীর যেত। অবশেষে আরও ছ'মাস পরে এক দালালকে পয়সা খাইয়ে হিন্দুস্থান যাবার ব্যবস্থা হল। সে আমাদের নিয়ে গেল আজাদ কাশ্মীরের এক এলাকায়। আমরা তিনজন দিনে ঘুমোতাম, আর রাত্তিরে হেঁটে হেঁটে line of control-এর কাছে এলাম। Line of control যখন বেশ কাছে তখন গাইড হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল। আমরা তিন রাত চার হাত পায়ে ঘষটে line of control-এ এলাম। দিনের বেলায় ভারতীয় সৈনিকদের পোস্টগুলো দেখা যেত, সেই সময়ে আমরা ঘাপটি মেরে ঝোপ ঝাড়ে লুকিয়ে থাকতাম। রাত্তিরে যখন

গাইডকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম এবার কোনদিকে যাব তখন ফিরে দেখি সে গায়েব। সে আমাদের হিন্দুস্থানে ঢুকিয়ে ফিরে পালিয়ে গেছে। দূরে একটা আলো দেখতে পেলাম। সেদিকে যেতে যেতে ভোর হয়ে গেল। কাছে দেখলাম একটা রাস্তা, একটা বাস দেখে তাতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় একটা ফৌজি গাড়ি বাসের কাছে এল। ওরা আমাদের ভাষা শুনে বুঝে গেল আমরা ভারতীয় নই। আমাদের কিছু করল না, শুধু গ্রেফতার করে পুলিশকে দিয়ে দিল। পুলিশ আমাদের চোর ভেবে আকনুর থানায় নিয়ে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ জেরা করে আমাদের কাহর বলে এক জায়গায় জেলে পুরে দিল।"

"জেলে?"

"হ্যাঁ। তিন মাস জেলে ছিলাম। জেলের সুপার রশিদ খাঁ বেশ ভাল লোক, আমাদের আলাদা ঘরে রেখেছিল। কোনও অত্যাচার করেনি। মাঝে মাঝে বাজারে যেতে দিত। অবশেষে তিন মাস জেরা করার পর যখন বুঝল আমরা টেররিস্ট নই তখন ছেড়ে দিল। আমরা সেখান থেকে বাস ধরে চলে এলাম দিল্লি।"

"তারপর?"

"দিল্লিতে ইউ এন-এর মাধ্যমে আমার মা-বাবাকে খুঁজে পেলাম। সবাই মিলে আম্বেদকর নগরে থাকতাম। U.N.H.C.R. থেকে refugee পয়সা পেতাম, বাবা পেতেন আটশো টাকা, আমরা চারজন পেতাম চারশো টাকা। সব মিলিয়ে দু'হাজার চারশো। আমি সেলাই করতাম পাজামা, পাঞ্জাবি, কখনও টাইপিং করতাম, কখনও বা ইংরিজির কোর্স শিখতাম। অবশেষে উনিশশো চুরানব্বই-এ যখন 'ইউ এন' আমাদের পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দিল তখন আমরা পাকিস্তান ফিরে এলাম। সেখানে কিছু দিন থেকে আবার কাবুল ফিরলাম। তালিবান সরকারের সময় গত পাঁচ বছর ধরে চাকরি পাবার ও বাড়ি সারাবার অনেক চেষ্টা করলাম, লাভ হয়নি। এবার ইনসাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। নতুন সরকার এসেছে। তোমাদের মতো ভাল লোক আমাদের চাকরি দিয়েছে।"

নাসিরের গল্প শুনে বেশ অদ্ভুত লাগল। মানুষ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কি না করে। দুটো দেশ পার করে এক অজানা দেশে বসেছিল পাঁচ বছর। অবশ্য নিজের দেশের টানের জন্যই আবার এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ফিরেও এসেছে। এখন এদের সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

কয়েকদিন আগে অবধি ওর চাকরি ছিল না। পরের দিন কী খাবে তাও ঠিক নেই। এখন কোনওরকম জমানো টাকা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। স্কুল কলেজের নিশ্চয়তা নেই। আছে শুধু আশা— তারই ভরসায় কত পরিবার পড়ে আছে আফগানিস্তানে।

নাসির একদিন আমাদের ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করল। তার মেহমাননাওয়াজি দেখে আমরা হতবাক। এই শুনলাম তার কাছে বাড়ি-ঘর নেই, টাকা নেই, তার মধ্যে আবার আমাদের ডাকা কেন? নাসির নাছোড়াবান্দা— "তোমাদের আসতেই হবে। আল্লার পরে যদি কেউ থাকে তা হলে তারা হচ্ছে হিন্দুস্থানি আর তোমাদের আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না।"

হাসপাতাল সেরে রাশিয়ান ভ্যানে করে আমরা কুশলখাঁ এলাকা পেরিয়ে কোটেসাংগির কাছে এলাম। এখানে এক কালে কাবুলের সবচেয়ে বড়লোকের বাড়ি ছিল। তালিবানদের রাজত্বে যখন হাজারা ও পাস্তুনদের মধ্যে লড়াই হয় তখন এই এলাকাটা আস্তে আস্তে ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে। যে সব বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তার কোনও দরজা-জানলা নেই, দেওয়ালে গুলি ও বোমার দাগ। কয়েকটি বাড়িতে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে। তারা প্লাসটিক ও বস্তা দিয়ে জানলা-দরজার খোলা জায়গাগুলো ঢেকে নিজেদের আব্রু বাঁচিয়ে রেখেছে।

নাসিরের বাড়িটা ওর মামার তৈরি করা। তিনি চব্বিশ বছর আগে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছেন আর হয়তো ফিরবেন না। বাড়িটা তিনি নাসিরের বাবাকে দিয়ে গেছেন। ভারতবর্ষ থেকে ফেরার পর ওঁরা এই বাড়িতেই আছেন।

একটা ভাঙা দরজা দিয়ে আমরা ঢুকলাম। মাঝারি মাপের একটা খোলা এলাকা— সেখানে কুমড়ো, টম্যাটোর গাছ লাগানো হয়েছে। এক দিকে ফুলের গাছের সারি, অন্যপাশে কুয়ো।

"এই কুয়োটা আমরা এসে তৈরি করেছি। আগের কুয়োটা এ পাশে ছিল।" সে কুমড়োর ক্ষেতের দিকে তাকাল।

"আমরা যখন ফিরে আসি তখন দেখলাম ওই কুয়োতে পাঁচজনের লাশ পড়ে আছে।"

"এখানে কাদের লড়াই হচ্ছিল?"

"যে যেখান থেকে পারে লুঠমার করত। গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ারের সঙ্গে মাসুদের লড়াই যখন হয় তখন বেশিরভাগ রকেট ও বোমা এই সব জায়গায় পড়েছিল কারণ এগুলো ধনী এলাকা ছিল। তালিবানদের সময় হাজারারা এসব জায়গা লুঠ করত। এগুলো ছিল পাস্তুন এলাকা। তালিবানদের অনেকেই পাস্তুন ছিল এবং তারা হাজারাদের ওপরে নানা অত্যাচার করেছিল। হাজারারা পাস্তুনদের দেখতে পারত না। এই দেখো আমাদের বাড়ির দেওয়াল দেখো। এটা electric line-এর concealed wiring-এর নালি ছিল। হাজারারা দেওয়াল ভেঙে প্রত্যেক ইঞ্চির তার পর্যন্ত টেনে বার করে লুট করে নিয়ে গেছে।"

"এখন তোমাদের কী ভাবে চলছে?"

"We had to start from zero. হিন্দুস্থান থেকে ফেরার পরে আমাদের এক পয়সাও ছিল না। হিন্দুস্থানেই মা'র মৃত্যু হয়। এখানে আসবার পরে বাবা সরকারি দপ্তরে একটা ছোট চাকরি পেয়েছিলেন। সেই পয়সাতে খাওয়া-দাওয়া করতাম। প্লাসটিক ও বস্তা দিয়ে জানলা দরজা করা হয়েছিল। এখন তোমাদের ওষুধের বাক্স পেয়ে অনেক লাভ হয়েছে। গত চার-পাঁচ বছরে দুটো ঘর থাকবার মতো করা গেছে।"

"নাজিবুল্লাহর সময় তো অবস্থা ভাল ছিল। তোমরা তখন হিন্দুস্থান পালালে কেন?"

"নাজিব আসতেই সে আঠারো বছরের ওপরের সব ছেলেদের মিলিটারিতে ভরতি করেছিল। আমরা যুদ্ধের ভয়ে হিন্দুস্থান পালিয়ে গেছিলাম।"

"আর সেখানে তোমাদের জেল হয়ে গেল।"

"হা হা হা" নাসির হেসেই অস্থির।

"তবে সেখানে আমাদের একদম অযত্ন হয়নি। হিন্দুস্থানে থাকাকালীন বুঝেছিলাম খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়া কাকে বলে। কত স্বাধীন কত আজাদ।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এখানে না তো আজাদি আছে নাইই কেউ ঠিক করে ইসলাম মানে। দেশের জন্য একটা লোক ভাবে না। শুধু নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি। সবাই চোর বদমাইশ। কেবল ইসলামের অপমান করে, ভুল-ভাল মানে বের করে।"

নাসিরের বাড়ির দোতলার একটা ঘরে আমরা বসলাম। জানলায় পুরনো

কাঠের ফ্রেমে প্লাসটিক লাগানো। দেওয়ালে নতুন রং। ছাদে আলো লাগানো তবে এসব এলাকায় বিজলি নেই। মেঝেতে আমাদের জন্য গালচে পাতা হয়েছে। ঘরের এক কোনায় টেপরেকর্ডারে খ্যানখেনে হিন্দি গান বাজছে। বিজলি নেই বলে নাসির একটা গাড়ির ব্যাটারি জোগাড় করে আমাদের জন্য টেপ চালিয়েছে।

খাবার এল। প্লাসটিকের দস্তরখান পেতে আমরা মাটিতে বসে পড়লাম। তরমুজ, খরমুজ ও আঙুর, পোলাও, নান, মুরগি, ঢেঁড়শের তরকারি, সালাড ও ফিরনি। নাসির ও তার ভাইপো হাসিমুখে যত্ন করে আমাদের আপ্যায়ন করে ক্ষমা চাইল। "মানে... আসলে এতটুকুই আমাদের ক্ষমতা। এর চেয়ে বেশি আর কিছু করা গেল না।" আমরা হতবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকালাম। কী বলব বুঝে উঠতে পারলাম না।

বাড়ি ফিরলাম। সবাই কেন মুষড়ে পড়ে ভাবছে। বছরের পর বছর কোনও স্থিরতা নেই। জীবনের কোনও মূল্য নেই। কাল কী হবে কেউ জানে না। তা সত্ত্বেও এরা বেঁচে আছে ও হাসিমুখে আছে। লোকজনকে খাওয়াচ্ছে। প্রত্যেক নতুন সরকারের পরে ভাবছে এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো এবার সব ঠিক হয়েও যাবে। তবে এমন হতে পারে যে এ সরকার বেশিদিন টিকবে না। কে জানে?

রাজনীতি

দুপুরবেলা যখন হাসপাতাল থেকে বেরোচ্ছি, তখন একজন লোক হাসিমুখে প্রশ্ন করল, "চিনতে পারছ কি?"

"কই না তো?"

"আমার নাম হামিদ। তোমরা কুন্দুজ গিয়েছিলে গুলাম মহম্মদের মেহমান হয়ে, তখন আমি সেখানকার কমান্ডার ছিলাম।"

"ও হো! তোমার তো দাড়ি ছিল। তাই চিনতে পারিনি।"

হামিদকে আমরা বাড়ি নিয়ে এলাম। সে বলল, "এখানকার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, বিশেষ করে দক্ষিণ আফগানিস্তানে। তালিবান ও আল-কায়দার লোকে ভিড়ের মধ্যে মিলে গেছে, তাদের খুঁজে বের করা অসম্ভব। তিন দিন আগে বাগরামে আমেরিকান মিলিটারির ওপর রকেট দিয়ে হামলা করেছে তাতে তিনজন আমেরিকান মারা গেছে। এই তো সেদিন কার্তে পামির সিনেমার সামনে, একজন ইংরেজ সৈনিককে মারল। এগুলো কে করাচ্ছে?"

"কিন্তু তালিবানরা তো ধরা পড়েছে। বাকিরা তো পাকিস্তান পালিয়ে গেছে।"

"কে বলল? আফগানিস্তানে প্রায় তিন লক্ষ তালিবান ছিল। তাদের মধ্যে হাজার পঁচিশেক হয় মারা পড়েছে বা ধরা পড়েছে। বাকিরা কোথায়? এরা দাড়ি গোঁফ কামিয়ে জনতার সঙ্গে মিলে গেছে। অনেকেই এখন কারজাইয়ের সঙ্গে সরকারের কাজকর্ম সামলাচ্ছে। এই তো সেদিন জালালাবাদে মারশাল ফাইমের গাড়ির ওপর বোমা পড়ল। এতে কার হাত ছিল? ফাইম তো রক্ষামন্ত্রী। তার গাড়িতে বোমা ফেলা মানে সরকারে কোনও ভেতরের লোকের হাত আছে। ফাইম তো Northern Alliance ও আহমেদ শাহ মাসুদের লোক ছিল। শুধুমাত্র আমরা তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। কারজাইয়ের সঙ্গে যদি তালিবানদের পুরনো লোকের গাঁটছড়া থাকে তা হলে

তো ফাইমকে সরানো খুব দরকার। তা হলেই ওর নিজের লোক রাজ্জাককে তার জায়গায় বসাতে পারবে। কারজাইয়ের সঙ্গে তো জানোই পাকিস্তানের বেশ ভাল বন্ধুত্ব আছে। মুশাররফকে বলেছিল যে পাকিস্তান ওর দ্বিতীয় বাড়ি। তার কথায় ছ'শোজন পাকিস্তানি বন্দি যারা তালিবানদের সঙ্গে কাজ করত— এক কথায় ছাড়া পেল। আস্তে আস্তে দেখবে আবার আফগানিস্তানে গন্ডগোল দেখা দেবে।"

"এখন তো আগের রাজা জাহির শাহ ফিরে এসেছে। এবার তো শান্তি হবে।"

"জাহির শাহ এল তো কী এসে গেল? যখন তেইশ বছর ধরে যুদ্ধ চলছিল তখন তো ও রোমে বসে আরামে দিন কাটাচ্ছিল। আমরা যখন লড়ে মরলাম এত লক্ষ হাজার লোক যে মারা পড়ল তাদের জন্য কেউ একবারও নামাজ পড়েছে? এখন যখন যুদ্ধ থেমেছে তখন বলছে এখানে এসে থাকতে চাই নিজের লোকেদের সঙ্গে। এসব আমেরিকার একটা চাল। দেখবে লোয়া জিরগার সময়ও গন্ডগোল হবে।"

"লোয়া জিরগাটা আবার কি?"

"লোয়া জিরগা মানে বড় মিটিং। এই জমায়েতে সারা দেশের হর্তা-কর্তা, বড় বড় উকিল, নামি লোক যাদের ওপর সাধারণ মানুষের ভরসা আছে, মিলে-মিশে নতুন সরকারের নির্বাচন করে। গ্রামের লোকেরা তাদের গ্রামের হর্তা-কর্তাকে নির্বাচন করে। অনেক গ্রামের কর্তারা জমায়েত হয়ে একজন বা কয়েকজন লোককে তাদের province বা সুরার প্রতিনিধি করে। আবার অনেকগুলো সুরা থেকে কিছু লোক নির্বাচিত হয় এবং অবশেষে এরাই কাবুলে সরকার তৈরি করে।"

"এতে গন্ডগোলের কি আছে?"

"যে সব হর্তা-কর্তারা নির্বাচিত হতে পারে তারা অনেকেই এক সময়কার বড় তালিবান বা নিজস্ব সৈন্যওয়ালা Warlord। এরা যদি কোনও কারণে সরকারে না ঢুকতে পারে তা হলে বুঝতে পারছ তো কি হবে? পাস্তুন নেতা চাইবে যে তাজিক আর northern alliance-এর লোকেরা সরকারে না আসুক। অথচ আমরাই এতদিন ধরে যুদ্ধ করলাম তালিবানদের বিরুদ্ধে। উত্তর আফগানিস্তানে যে সাত-আটটা province-এ আমাদের লোক আছে সেখানে আমরা শান্তি বজায় রাখব। আর আমাদের লোক আতা মহম্মদ তো

আছেই মাজার-এ-শরিফে। ওখানকার উজবেক নেতা দোস্তমকে নাকি আমেরিকা পাঁচ লক্ষ ডলার দিয়েছে। আতা মহম্মদ দোস্তমকে ছাড়বে না।"

আমরা শিউরে উঠলাম। মাজার-এ-শরিফে আমরা আতা মহম্মদের সঙ্গে চা খেয়েছি। সে কি এবার যুদ্ধে নামবে? চেহারা দেখে অবশ্য বেশ যোদ্ধা বলে মনে হয়েছিল।

"তোমরা তো মাসুদের সঙ্গেও কাজ করেছ? কীরকম লোক ছিল সে?"

"আহমেদ শাহ মাসুদের মতো লোক এই দেশে খুব কম জন্মেছে। এখানে সবাই পাস্তুন, হাজারা, তাজিক, উজবেকি, নুরিস্তানি করে দেশটাকে ভাগ করে রেখেছে— মাসুদই একমাত্র লোক ছিল যে তাজিক হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তানের লোকেদের এক ভাবত। ওই একমাত্র লোক যে পাকিস্তানের চাল বুঝতে পেরেছিল। এর জন্যই পাকিস্তানের সঙ্গে ওর ভীষণ ঝগড়া ছিল। পাকিস্তানের সাহায্য নিয়েই আল-কায়দার লোক মাসুদকে মেরে ফেলল। মাসুদের স্বভাব খুব নরম ছিল। মেয়েদের খুব সম্মান দিত। কখনও কোনও মেয়ের সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলত না। অবশ্য ওর দলের কিছু মুজাহিদ্দিন সেটা মানত না। মাসুদ বুঝেছিল যে যত বড় বড় দেশেরা এই দেশকে সাহায্য করে তাদের কোনও-না-কোনও মতলব থাকে। তবে হিন্দুস্থানের ব্যাপারে ও বলেছিল একমাত্র এরাই আমাদের সাহায্য করে বিনা কোনও মতলব নিয়ে। শুধুমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে।

মাসুদ প্রথমে রুশিদের বিরুদ্ধে দশ বছর লড়াই করল। ওরা ওকে লায়ন অব পাঞ্জশের ভ্যালি বলত। এরপর মাসুদ গৃহযুদ্ধে অন্যান্য বেপরোয়া warlord-দের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তখন ও ছিল নাজিবউল্লাহর রক্ষামন্ত্রী। অবশেষে ও তালিবানদের সঙ্গেও লড়েছিল। শেষের দিকে ওর অনেক নেতার মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। কিছু লোক পালিয়ে গিয়েছিল। একজন নাকি প্রশ্ন করেছিল, "আর কতদিন এভাবে চলবে? আমাদের কাছে তো এখন আফগানিস্তানের মাত্র দশ থেকে পনেরো প্রতিশত জমি আছে। যা মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে তালিবানরা কবজা করে নেবে।" মাসুদ তখন তার পাখোলটা মাটিতে ফেলে বলেছিল, "যদি আমার কাছে এই পাখোলটুকুর মতো জমি থাকে তা হলেও আমি লড়ে যাব। আফগানিস্তানকে আমি কখনও এদের হাতে তুলে দেব না।"

মাসুদ যখন মারা গেল তখন আফগানিস্তানের লোকেরা কেঁদেছিল।

এমনকী তার চরম শত্রু তালিবানদেরও বেশ কিছু যোদ্ধার চোখে নাকি জল এসে গিয়েছিল। তারা জানত এরকম যোদ্ধা আর কোনওদিন জন্মাবে না। আজ যদি মাসুদ বেঁচে থাকত তা হলে এই দেশের রাজা হত। এসব কারজাই খারজাই গদির ধারে-কাছে আসত না।"

হামিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার কথা বন্ধ করল। আমরা রোমাঞ্চিত হলাম। কি লোক ছিল!!

হামিদের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলতে আরম্ভ করবে সেটা ঠিক ধারণা করতে পারিনি। আফগানিস্তানের উপরাষ্ট্রমন্ত্রী হাজি আবদুল কাদির যে এককালে জালালাবাদ অঞ্চলের গভর্নর ছিল তার সম্বন্ধে খবর এল। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল যখন আমরা জালালাবাদ গিয়েছিলাম। সভ্য ভদ্রলোক। মেপে কথা বলে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব ভাল উচ্চমানের ধারণা রাখে। আমাদের সামনে অনেক গুণগান করেছিল।

হাজি আবদুল কাদির খুন হল ৬ জুলাই। কে মেরেছে? কেন মেরেছে? কেউ বলতে পারল না। তার নাকি অনেক শত্রু ছিল। কেউ ছিল পুরনো তালিবানদের লোক যাদের সঙ্গে এককালে সে মুজাহিদ্দিন হয়ে লড়াই করেছিল। কোন শত্রু চরস গাঁজার ব্যবসাদার ছিল যাদের সঙ্গে এককালে হাজি কাদিরও ব্যবস্থা পাকিয়েছিল। আবার কেউ ছিল পুরনো পাঞ্জশেরের লোক।

নাসির বলল, "এমনও হতে পারে যে কারজাইয়ের লোক ওকে মেরে ফেলেছে। সে নিজে এককালে মুজাহিদ্দিন ছিল এবং সে তার গদি শক্ত করার জন্য বাকিদের রাস্তা থেকে সরাচ্ছে। কারজাই এখন জালালাবাদী আর পাঞ্জশেরির মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেবে। এতে দু'দলের বড় বড় লোক মরবে আর আমেরিকার কবজা দেশের ওপর আরও শক্ত হবে।"

"কিন্তু এ ব্যাপারটা তো লড়াই না করে করতে পারে?"

"সেটা সম্ভব নয়। পুরনো মুজাহিদ্দিন যার মধ্যে বেশির ভাগ পাঞ্জশেরি তাদের পুরনো বোমা বারুদ সরকারের হাতে তুলে দেয়নি এখনও। ফাইম নিজের কাছে এত হাতিয়ার কেন রাখছে? কারণ যদি কোনওদিন দরকার হয় তা হলে সে সরকার পালটে দেবে। এখানকার যে secret service— "খাদ" সেটাও কারজাই নিজে হাতে নিতে চেয়েছিল। ফাইম সেটা হতে দেয়নি।

এতে ওর অর্ধেক ক্ষমতা চলে যাবে। ওদিকে আমেরিকাও পাঞ্জশেরিদের পছন্দ করে না। এই লোয়া জিরগাতে ওদের অনেক বাধা সত্ত্বেও বড় বড় পাঞ্জশেরি— ফাইম, আবদুল্লাহ আর ইউনুস কানুনি এরা সবাই এ সরকারের উঁচু জায়গায় বসে আছে আর এতে কারজাইয়ের প্রচুর অসুবিধে হচ্ছে।

এ তো মহা জট পাকানো পলিটিক্স। কে যে কোন দলের বোঝা খুব মুশকিল। এ তো মনে হয় ঘরে ঘরে শত্রু। ভস্মে ঘি ঢালার জন্য তো আমেরিকা তৈরি হয়ে বসে আছে। শুধুই কি ঘি ঢালা?

নাসির এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে তার মুখ থেকে থুতুর ফোয়ারা বেরিয়ে এল, "আমেরিকা এই সুযোগটাই তো খুঁজছিল। তুমি জানো নিউজউইকে বেরিয়েছিল যে নিউইয়র্কে বোমার কথাটা ওরা ভেতরে ভেতরে জানত। এই অজুহাতে ওরা আফগানিস্তানে নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করেছে। এখান থেকে ইরান ও চায়নার ওপর কড়া নজর রাখবে। তুর্কমেনিস্তান থেকে গ্যাসের পাইপলাইন বের করার চেষ্টা করবে। পাকিস্তানকে গোছা গোছা হাতিয়ার দেবে। আর এই করেই ওরা মরবে।"

আমরা বোকার মতো নাসিরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা যেরকম বোকা দেখতে সেরকম নয়। অনেক খবর রাখে। আমেরিকা কি তা হলে চোরাবালিতে পা রেখেছে? এবার তো তা হলে সে না পারবে বেরোতে না পারবে বাঁচতে। আফগানিস্তান কি তা হলে আমেরিকার দ্বিতীয় ভিয়েতনাম?

আফগানিস্তানে যে গন্ডগোল চলতেই থাকবে তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ রইল না। যে দেশে উপরাষ্ট্রপতির জীবন এত সস্তা সে দেশে কি সাধারণ জনতার কোনও দাম আছে?

যাবার বেলায়

নয় নয় করে অনেকদিন থাকা হয়ে গেল। আফগানিস্তানের রাস্তা-ঘাট এখন আর ফাঁকা নয়, বেশ শহর শহর ভাব। বাজারে প্রচুর লোকজন আর বোরখা পরা মেয়েদের দেখা যায়। সিনেমা হলে বলিউডের সিনেমা চলে। ট্রাকে করে প্রায়শ সাহেব সৈনিক দেখা যায়। আমাদের হাসপাতালও বেশ রমরমা, ক্যাম্প করার আর দরকার হয় না। রুগিরা মাছির মতো হাসপাতালের সামনে ভিড় করে, চিকিৎসা করায় ও হিন্দুস্থানিদের গুণগান করতে করতে বাড়ি চলে যায়। আফগানি টাকার দাম বেড়েছে। এক কালে এক ডলারে সত্তর হাজার আফগানি আসত। এখন তিরিশ হাজার আফগানিতে এক ডলার পাওয়া যায়। মাঝে এক-আধটা বোমার আওয়াজ এদিক-ওদিক থেকে শোনা যাবে। কিন্তু সব মিলিয়ে অবস্থা শান্তিপূর্ণ।

প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। বাড়ি ফেরার কোনও নাম নেই। আমাদের সবারই দেশের প্রতি প্রেম উথলে পড়তে লাগল। প্রায়শই আমরা অ্যাম্বাসাডারের কাছে গিয়ে ছিঁচকাঁদুনের মতো ঘ্যান ঘ্যান করতাম। অবশেষে একদিন তিনি খবর দিলেন, "তোমাদের জন্য সুখবর আছে। আরেক দল ডাক্তার মাস খানেকের মধ্যে কাবুলে আসবে। তোমরা এবার পাততাড়ি গোটাবার ব্যবস্থা করো।"

মনটা খুশিতে ভরে গেল। এখানে আমাদের কোনওরকম অসুবিধে হয়নি এখনও অবধি। একবার অবশ্য থানায় যেতে হয়েছিল। এখানকার আতিথেয়তার জবাব নেই। কিন্তু দেশের মাটির টানই আলাদা।

আমাদের ভ্যানের ড্রাইভার কাইয়ুম খুব শান্ত-শিষ্ট মানুষ। সবসময় হাসি হাসি মুখে থাকে। কোথায় সস্তায় তেল পাওয়া যায়, কোন বাজারে ভাল সবজি পাওয়া যায়, সবই দেখিয়ে দিত। আমাদের দেশে ফেরার কথা শুনে তার হাসিটা নিমেষের মধ্যে উবে গেল। বিষণ্ণ মুখ করে বিড়বিড় করতে লাগল "নেই, আচ্ছা নেই, ই বহুত খরাব অস্ত্। মা বহুত পরেশান।"

"কিন্তু আমাদেরও তো পরিবার আছে। নিজেদের লোকেদের কাছে ফিরে যেতে তো সবারই ভাল লাগে।"

"নেই, আচ্ছা নেই, বহুত খরাব খবর, আচ্ছা নেই।"

এ তো মহা ফ্যাসাদ। কাইয়ুমকে বোঝানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল যে আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাব। মুখে তার হাসিটা রয়ে গেল কিন্তু সে নামেমাত্র।

দুটো হাসপাতালেই খবরটা পৌঁছাল। ভীষণ একটা হট্টগোল হল। কেনই বা আমরা যাচ্ছি, এখানে কি অসুবিধে ছিল? নতুন ডাক্তাররা কীরকম হবে! আমাদের মতো না হলে কী হবে? ইত্যাদি। অনেকে বলল তারা চাকরি ছেড়ে দেবে। আমরা তাদের আটকালাম। খবরটা কোহেমার্কাস হাসপাতালের ওটি মেট্রনের কানেও গেল। ওমায়েরা শুনে বলল, উই!!... !! বলে দু'হাতে দিয়ে তাঁর ঠোঁটগুলো চেপে ধরল।

"It is not beautiful news. I am hungry very hungry."

"Hungry?" এর আবার শোকের খবর শুনে খিদে পেয়ে গেল কেন?

"No not hungry angry."

শোকে মনে হয় ওমায়েরার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভুলভাল ইংরিজি বলছে।

"আর আরিফা? তার কী হবে?"

"কী হবে মানে?"

"ওই দেখ কী করছে?"

দেখলাম আরিফা ওটি-র সব ঘর আর বারান্দার সব আলো নিবিয়ে দিচ্ছে। ভীষণ মেজাজ করে দুটো ওটি বয়কে বকল।

"জান ও কী বলছে?"

"কী?"

"পুরো ওটিতে কালো রং করে দেবে। তোমাদের ঘরে যে অন্য ডাক্তার বসবে সে ও কিছুতেই সহ্য করবে না। না জানি কী করে বসবে।"

"আমাদের তো একদিন ফেরত যেতেই হত। দেখবে আস্তে আস্তে এসব সয়ে যাবে। আর অন্য ডাক্তাররা হয়তো আমাদের চেয়ে ভাল হবে।"

"তা অসম্ভব!" ওমায়েরা চোখ মুছতে মুছতে তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

হঠাৎ নিজেদের ভীষণ জরুরি মনে হতে লাগল। সেটা কি শুধু ডাক্তার হিসেবে? মনে হয় না। এখানকার লোকেরা এতদিন যুদ্ধের পরে একটা বাইরের লোকের কাছ থেকে দুটো কথা একটু গল্প শুনেই তাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে শুরু করেছে। আর সেই জন্যই বোধহয় আমাদের এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

আমাদের ভারতবর্ষে ফেরার কথা শুনে কিছু লোক নির্বিকার ছিল। এদের সঙ্গে অবশ্য খুব কম দিনের আলাপ। বাড়ির সামনে মার্শাল ফাইমের রক্ষী, পাউরুটির দোকানওয়ালা বা বাড়ির নতুন রান্নার লোক কারুর বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। এর মধ্যে একজন ছিল আমাদের এক নতুন ট্যাক্সি ড্রাইভার আবদুল্লাহ।

আবদুল্লাহর বয়স প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি। তালিবানদের সময় সে পাকিস্তান পালিয়ে গিয়েছিল। হিন্দি বা উর্দু জানে না তবে তার গাড়িতে সাইগাল, রফি বা মুকেশের গান বাজে। আমাদের দেশে ফেরার খবর শুনে সে নিজের থেকে কাবুলের অনেক অজানা জায়গা দেখাতে নিয়ে গেল।

লম্বা মোটা লোকটা জোব্বা পরে কাবুলের গলি দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে চারদিকে চিনিয়ে দিল। ছবি তোলার আওয়াজে সে পেছন ফিরে "বহুত খুব" "বহুত খুব" বলে আহ্লাদে আটখানা হল। ঘুরতে ঘুরতে আমরা এলাম কাবুল নদীর ধারে 'সাধু-এ-সামসিরা' মসজিদে। আবদুল্লাহ সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, "ই মসজিদ বহুত পুরানা। আফগানিস্তান মা সব বুদ্ধে, সব হিন্দু, আরব আয়া, আরব জং করেগা। তলোয়ার জং করেগা। ইসলাম করো, ইসলাম করো। মা ভি বুদ্ধে পহলে। মা দাদা কা দাদা বুদ্ধে থা।"

"তোমরা আগে বৌদ্ধ ছিলে? বৌদ্ধ মানে অবশ্য এখানকার অনেকে ভাবে মূর্তিপূজারী। কারণ দেশের সবচেয়ে বড় মূর্তি ছিল বামিয়ানের বুদ্ধ। আবদুল্লাহর পূর্বপুরুষরা হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল।

"ও হো ওহো সয়িস্ সয়িস্। মা পহলে বুদ্ধে। ফির জং করো, ইসলাম করো, ই সমসিরা মসজিদ মা বুদ্ধে সে ইসলাম করো, ইসলাম করো।"

সামসিরা মসজিদে আরব সৈন্যরা এখানকার লোকেদের জোরজবরদস্তি মুসলমান করত। মসজিদটা যদিও দু'-তিনশো বছর পুরনো মনে হচ্ছিল।

ঘটনাটা ঘটেছিল হাজার বছর আগে। হয়তো এখানে একটা অন্য মসজিদ ছিল এককালে।

"আমরা তো হিন্দুস্থান ফিরে যাচ্ছি।"

"ও হো! বহুত খুব বহুত খুব। হিন্দুস্থান মা বহুত খুব বুদ্ধে, বহুত ইসলাম, বহুত আজাদি অস্ত্।"

লোকটা কী বলতে চাইছে সেটা তো বুঝতে পারলাম। তবে ও যে আমাদের দেশে ফেরা নিয়ে বিশেষ দুঃখিত সেরকম নয়। সারাদিন ট্যাক্সি চালায়। রাত্তিরে দু'-তিনটে সিগারেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কে এল, কে গেল তা নিয়ে ওর বিশেষ মাথাব্যথা নেই। সব কিছুই ওর জন্য বহুত খুব!!

"এবার তো আরেক বুদ্ধেকে খবরটা দিতে হবে।" ডা. বালার চিন্তিত উক্তি।

"খুবই দুঃখিত হবেন মনে হয়।"

আজিমের বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন। ওঁর তরফ থেকে এটা আমাদের জন্য বিদায় ভোজ। দুপুর পৌনে একটা নাগাদ আমরা এক প্যাকেট টফি নিয়ে আজিমের বাড়িতে পৌঁছালাম। দেখলাম এক বুড়ো ভদ্রলোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাছে এসে দেখি তিনি আজিম।

"এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমরা তো বাড়িটা চিনি।"

কোনও ব্যাপারে নয় বলে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

চারতলা বাড়ির ভাঙা জানলাওয়ালা, কার্পেট পাতা ঘরে জুতো খুলে আমরা বসে পড়লাম। চা এল আর তারপর এল কমলালেবু। আজিমের মুখ শুকনো। আজিমের বড় ছেলে আমিনের মুখ চোখের বিশেষ বদল নেই। প্রায় ছ'ফুট লম্বা আর তেমনি মোটা সে তার ওজন কমাবার চেষ্টা নিয়ে অনেক গল্প করল। নির্দোষ মুখ করে জিজ্ঞেস করল আমার কেক, চিজ, মাখন, পেস্তা, বাদাম, আইসক্রিম, বার্গার, কোলা খেতে খুব ভাল লাগে— এগুলো খেলে কি ওজন বাড়ে? আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। আমিই তার ভারতবর্ষ যাওয়া নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগলাম। বাবার কাছে ভারতের এত গুণগান শুনেছে— সেই কৌতূহল মেটাতে সে নাকি অক্টোবর মাসে দিল্লি ও কলকাতা আসবে। কোথায় যেতে হবে, কী দেখতে হবে সমস্ত খবরাখবর নিল। আজিমের কাছে রাজধানী এক্সপ্রেসের বর্ণনা শুনে

তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। এত তাড়াতাড়ি যদি ট্রেন চলে তা হলে তো আমি বাইরের দৃশ্য কিছু দেখতেই পাব না। আজিমকে বললাম, "এইবেলা তুমিও একবার ভারতবর্ষ ঘুরে এসো না। তুমি তো হজে গেছ। এটা তোমার দ্বিতীয় হজ হবে।"

"আসলে অত পয়সা নেই।" সে বেচারার মতো মুখ করে চুপ করে গেল। তার মনের ভেতর দোটানা সে চেষ্টা করেও চাপতে পারছিল না। কথায় মনে হচ্ছিল সে প্রাণপণে তার মাতৃভূমিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটা একটা মরীচিকার মতো সামনে থেকে উবে যাচ্ছে। আর আমরা চলে গেলে হয়তো সম্পূর্ণভাবে গায়েব হয়ে যাবে।

আজিম খাবার আনতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিন বলল, "ওঁকে আমি অনেকবার বলেছি আমার সঙ্গে যেতে। যাতায়াতের খরচা তো লাগবে না। আমি তো Airlines-এ কাজ করি। তবে উনি যাবেন না। ওখানে কে আছে এখন ওঁর? উনি নিজের দেশ নিজের ধর্ম ছেড়ে, এখানে এসে ইসলাম গ্রহণ করে এই আফগানিস্তানের মতো জায়গায় বসবাস করেছেন এতকাল। ওখানকার লোকেরা ওঁকে কী চোখে দেখবে কে জানে? কাছে পিঠের লোকেরা অবশ্য কেউ নেই। এক বোন আর ভগ্নিপতি ছিলেন, তাঁরাও মারা গেছেন। কিছুকাল আগে অবধি তাঁদের চিঠি আসত, ওঁর এখন যাবার কোনওই জায়গা নেই।" আমিনের বাবার প্রতি শ্রদ্ধা খুব নির্ভেজাল। "এই আফগানিস্তানের মতো জায়গা"— যখন বলছিল তখন বুঝলাম যে এত কষ্ট, এত যুদ্ধ সহ্য করে আজিম তার ছেলে-মেয়েদের ভাল ভাবে মানুষ করছে। তার বাবা যে তাঁর মাতৃভূমি, প্রিয়জন, সব ছেড়ে এখানে থেকে তাদের প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন সেটা আমিন ভালভাবে বুঝতে পারে।

খাবার এল। আগের মতো কাবুলি, নান, ওশাক, কাবাব আর ফল।

"তোমরা সব হিন্দুস্থান ফিরে যাবে। নিজেদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবে, এটা খুব ভাল ব্যাপার। আমি অবশ্য চাইব যে তোমরা অনেকদিন এখানে থাকো। তাতে আমারই সবচেয়ে ভাল লাগবে। আমার জীবন তো প্রায় শেষ হয়ে গেল। এদেশে আমাকে অনেক কিছু দেখতে হয়েছে। একটা বড় বাড়ি ছিল আমাদের। যুদ্ধে সে সব ভেঙে গেছে। এখন শুধু শেষ যাত্রার অপেক্ষা।" আজিমের চোখ ছলছল করে উঠল, গলা ধরে গেল। চোখের দৃষ্টি করুণ। হয়তো ভাবছিল, "এদের মতো বয়সেই আমি এ দেশে এসেছিলাম। তারপর

সবকিছু যেন ওলোট-পালট হয়ে গেল। প্রেম করলাম, বিয়ে করলাম, ধর্ম পরিবর্তন করলাম। ভাল ভাবেই ঘর দোর চলছিল। কিন্তু বিশ বছরের যুদ্ধে আমার যেন সব কিছু শেষ হয়ে গেল। এখন তো ফেরত যাবার কোনও রাস্তা নেই।"

"চলে যাবার আগে তোমাদের জন্য আমাদের তরফ থেকে একটা সামান্য তোহফা গ্রহণ করো।" আমাদের একটা-একটা প্যাকেট দিলেন। খুলে দেখি একটা স্যুটপিস। আমরা আপত্তি করাতে উনি বললেন শান্তভাবে, "এটা যখন পরবে তখন আমায় মনে রেখো। আর এখানে আমাদের সম্পর্কটা মনে রেখো।"

আমরা নির্বাক। দেশের মাটির টান যে কত শক্ত হতে পারে সেটা বুঝতে পারলাম।

"একটা পারিবারিক ছবি তুলতে পারি কি?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। দাঁড়াও।" আজিম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন এক ফরসা বুড়ি ভদ্রমহিলাকে। ইনি আজিমের স্ত্রী। এতদিন ধরে ইনি আমাদের রান্নাঘরের দরজার আড়াল থেকে ভোজ খাইয়ে যেতেন। একবারও বাইরের আসার প্রয়োজন মনে করেননি। হয়তো সংস্কার বা সাহসের জড়তার মধ্যে আটকে গিয়েছিলেন। আজ আমাদের নিজের বাড়ির লোক মনে করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রমহিলা বেশ ঘরোয়া ও হাসিখুশি। দরি ভাষায় বললেন, "নিজেদের বাড়ি মনে করে যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবে।" আজিম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "ওরা তো এবার চলেই যাবে।"

আমরা বাড়ি ফিরলাম। ডা. বালা বলল "আজিমের জন্য বেশ খারাপ লাগছে। মাতৃভূমি ও প্রিয়জন যে কি জিনিস আজ বিদেশে এসে বুঝতে পারছি।" আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাগ্যিস তোর বিয়ে হয়ে গেছে। আর ভাগ্যিস তোর সঙ্গে আরিফার প্রেম বেশিদূর এগোয়নি। তা না হলে তিরিশ বছর পরে তোরও ওই একই অবস্থা হত।"

ভাবতেই গা ছম ছম করে উঠল। ভাগ্যিস!

বিদায়

সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে গেল। হাওয়ায় একটা ঠান্ডা মেজাজ। রাত্তিরে শীত করে। গাছের পাতা কমলা হয়ে খয়েরি হতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে সে সব পড়ে যাবে। সাহেবদের ভাষায় এই ঋতুর নাম Fall বা Autumn। প্রকৃতি তার পুরোনো জীবন ত্যাগ করে, শীতকালে গা ঢাকা দিয়ে মার্চ মাস নাগাদ নতুন প্রজন্মে পুনর্জীবন লাভ করে। গাছে কচি পাতা গজাবে, ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটবে, আর আফগানিস্তানে নাওরোজ পালিত হবে।

দেশে এখন শরৎকাল। দুর্গাপুজো আসছে। চারদিকে একটা আমেজের ভাব। গ্রামবাংলায় মেয়ে বাড়ি আসবে। আমাদের মধ্যে কোনও মেয়ে নেই, তবু সবার যেন মনে হচ্ছিল এবারে বাড়ি ফিরতে খুবই ভাল লাগবে।

আমাদের ফেরার দিন ঠিক হয়ে গেছে। ২৮ সেপ্টেম্বর। কাবুলের এয়ারপোর্ট এখন চলমান। রানওয়ে সারানো হয়েছে। এরিয়ানা এয়ারলাইন্স-এর তিনটে প্লেন ভারতবর্ষ, ইরান, পাকিস্তান যাতায়াত করে। এটারই একটায় করে আমরা ফেরত যাব। জিনিসপত্রের জন্য দূতাবাস থেকে আলাদা পারমিট নিতে হবে। সবার কাছে প্রায় সাত-আট কেজি পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, আখরোট আছে। এ ছাড়া লেপ, কম্বল, তোশক, গরমজামা তো আছেই।

নতুন ডাক্তারের দল এল। দু'-তিনদিন কেটে গেল তাদের রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, বাজার সব দেখাতে। চেনাশোনা লোকেদের সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিলাম। আমাদের দরি ভাষার ওপর দখল দেখে তাদের চোখ গোল গোল হয়ে গেল।

ইন্দিরা গাঁধী হাসপাতালের ডাইরেক্টর আমাদের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমরা পুরনো এবং নতুন ডাক্তারেরা সেখানে এসে পৌঁছালাম। গিয়ে দেখি সেখানে মেলা ভিড়। ডাইরেক্টর, কিছু মুখ-চেনা পুরনো ডাক্তার—

ডা. জারওয়ারি আর কয়েকজন চেনা নার্স ছাড়া আর কাউকেই চিনতে পারলাম না। এরা কারা? কেনই বা এসেছে? এরা কি জানে এখানে কি হচ্ছে? ডা. জারওয়ারি বললেন, "It is not important পরোয়া নি অস্ত্। আফগানিরা যখন দেখে কোথাও একটা ছোট পরবের মতো হচ্ছে বা খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে তখন তারা সেখানে মাছির মতো এসে জুটে যায়। তাদের বাড়িতেও কোনও ভোজ হলে আসপাশের লোকেরা বিনা নেমন্তন্নয় চলে আসতেই পারে। তুমি হয়তো অর্ধেক লোককে চেনোই না আর ওরাও তোমাকে চেনে না। তবে এটাই এখানকার মেহমাননাওয়াজি।"

লম্বা টেবিলের দু'ধারে আমরা ভিআইপি-র মতো বসলাম। কাপের পর কাপ চা চলল সঙ্গে বিস্কুট, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস। ডাইরেক্টর ছোট মতো একটা বক্তৃতা দিলেন। যা যা বলতে হয় সবই বললেন। আমরা কত ভাল। হিন্দুস্থানি ডাক্তার আসাতে কত সুবিধে হয়েছে। নতুন ডাক্তাররা এভাবেই কাজ করে যাবে। এবং আমরা হিন্দুস্থানের কাছে আরও সহায়তা আশা করি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার যাবার পালা। রুবিনা, ফারিদা, আদিলা, আরও বেশ কয়েকজন পুরনো মেয়েদের চোখ ছলছল করছে। সেই অবস্থাতেই তারা এক-একজন এক-একটা করে রাংতা আর প্লাসটিকের তৈরি করা ঝিকিমিকি মালা নিয়ে এল। এক এক করে সব পুরনো ডাক্তারদের গলায় সেগুলো পরিয়ে দিল। রোগা বেঁটে আদিলা লাফিয়ে উঠে আমার গলায় মালা পরাল। আশ্চর্য লাগছিল। এই রেওয়াজটা এ সব অঞ্চলে আর গান্ধার এলাকায় কয়েক হাজার বছর আগে প্রচলিত ছিল। ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে মালা বদল করে বিবাহ করত। সে সব রীতি নীতি বোধহয় এখানকার লোকেরা বিন্দুমাত্র জানে না। এখানকার নার্সরা যে আমাদের অতি আপন ভেবেছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তা না ভাবলে কি এতগুলো বাইরের লোকের সামনে বিনা বুর্খায় আমাদের সঙ্গে গল্প করে মালা পরিয়ে হ্যান্ডশেক করতে পারত? মেয়েদের জীবন যে এ দেশে সবচেয়ে করুণ সেটা কে না জানে? গত বিশ বছর ধরে কখন যে তার আব্বা, সোহর, বা ছেলে মারা পড়বে তার কোনও ঠিকানা নেই। কবে যে তার বাড়িঘর হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে সে কিছু জানে না। কাল যে কী রান্না হবে তারও কোনও হিসেব নেই। আর সেই পরিস্থিতিতে পড়ে যখন কয়েকজন বিদেশি লোক তাদের সঙ্গে সহানুভূতির

সুরে কথা বলে তা হলে তাদের চোখে জল আসাটা স্বাভাবিক। মনে পড়ল নাসির একবার বলেছিল, "জানো ডাক্তার সাহেব, আমার বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু ছেলেবেলাটা কী আমরা জানতেই পারলাম না। পাঁচ-ছ' বছর বয়স থেকেই যুদ্ধ দেখছি। কখনও রুশিদের সঙ্গে, কখনও গৃহযুদ্ধ কখনও বা তালিবানদের অত্যাচার। খেলাধুলো তো কোনওদিন করতেই পারলাম না। শুধু বয়সটাই বেড়ে গেল। এই দেখ চুলও পেকে গেছে।" এখানকার মেয়েদের মনে হয় ওর চেয়েও চরম দুর্দশা।

আজ কোহেমার্কাস হাসপাতালে বিদায়ের জন্য বিকেলে চায়ের আয়োজন। এটা মিলিটারি ও সরকারি হাসপাতাল মেলানো তাই এখানকার কেতাই আলাদা। অনিমন্ত্রিত বাইরের লোকেরা ভিড় করে আসতে পারবে না। যারা এসেছে তারা সবাই স্যুট পরা। বাইরের বাগানে সোফা লাগানো হয়েছে। খুব ঘনিষ্ঠ চার-পাঁচজন ডাক্তার ছাড়া বাকি সবাই সরকারের হোমরা-চোমরা লোক।

অ্যাম্বাসাডার এলেন। আর তার পরেই এলেন আফগানিস্তান সরকারের Deputy Interior Minister. আমরা সবাই একটা ছোট হল ঘরে গিয়ে বসলাম। চারদিকে আখরোট কাঠের প্যানেলিং কায়দার সোফা আর মেঝেতে মোটা গালচে। ঘরের এক কোনায় একটা সোফায় আরিফা, ওমায়েরা জুজুবুড়ির মতো মাথায় হিজাব দিয়ে বসেছিল।

হাসপাতালের সুপার প্রথমে ইংরিজি তারপর দরি ভাষায় আমাদের অনেক গুণগান গাইলেন। অ্যাম্বাসাডার বিগলিত হয়ে, হাসি হাসি মুখে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। আমরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি সবাই আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে, যেন আমরা মঙ্গলগ্রহের কোনও প্রাণী। আড়চোখে একবার ওমায়েরা আর আরিফার দিকে দেখলাম। দু'জনেই মেঝের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আজ আর কোনও হাসি-ঠাট্টা নেই। এরা যে আমাদের আদৌ চেনে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। আরিফার মনের ভেতর কী হচ্ছে জানবার খুব ইচ্ছে হল। মনে হয় আর কোনওদিন সুযোগ পাব না। সরাসরি তাকে প্রশ্ন তো করা মুশকিল। মেয়েটা খুব কম হিন্দি জানে। আর আমার দরি অতটা পাকা নয়। পুরো ব্যাপারটায় একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়েই গেল।

আবার চা আর মেওয়া। আর তারপর certificate ও উপহার। আমার আর ডা. বালার জন্য মাজার-ই-শরিফ অঞ্চলে কাজ করা উলের কার্পেট ও দু'জন ওটি বয়ের জন্য জেড-এর তৈরি দাবার সেট। সবার সঙ্গে করমর্দন করে আমরা গাড়িতে উঠলাম। অ্যাম্বাসাডার আমাদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। ভাবটা যেন, "বা! বা! বেশ বেশ!"

আমরা ফিরে যাচ্ছি। সকাল থেকে উঠে ভয়ানক তোড়জোড় শুরু হল। নয় নয় করে ন' মাসে অনেক জিনিসপত্র বেড়ে গেছে। আত্মীয়স্বজনদের জন্য হাতের তৈরি ছোট ছোট রঙিন কাচের ফুলদানি যাচ্ছে। বিভিন্ন রঙের আফগানি টুপি পাখোল। এছাড়া গালচে, মেওয়া, চামড়ার জ্যাকেট, ডাক্তারি বইপত্র তো আছেই। সবকিছু ভরার জন্য দুটো বিশাল বিশাল রেকসিনের ব্যাগ কেনা হয়েছে। সবারই বিশালাকার লাগেজ। আমার লাগেজের ওজন সত্তর কেজি।

মি. রঞ্জিত আগের থেকেই দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলে চিঠি বের করে কাবুলের এয়ারপোর্টের কর্তাদের দিয়ে এসেছিলেন। কী সব সরকারি কলকবজা নেড়ে জিনিসপত্রগুলো অন্য এক কার্গোতে চলে যাবে আর আমাদের বেশি পয়সা দিতে হবে না। অবশ্য এতে একটা অসুবিধে যে জিনিসপত্র হয়তো সাতদিন পরে এল বা কাবুলেই রয়ে গেল।

তিনটের সময় প্লেন ছাড়বে। নতুন ডাক্তারের দল আমাদের ঘরে তাদের জিনিসপত্র খুলে বসে গেছে। খেয়ে-দেয়ে আমরা একটা নাগাদ শেষবারের মতো কাইয়ুমের সঙ্গে রাশিয়ান গ্যাজেলে উঠে বসলাম। মার্সাল ফাইমের রক্ষীদের বিদায় জানিয়ে ওয়াজির আকবর খান ছেড়ে আমরা এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরলাম।

কাবুল এখন বেশ রমরমা শহর। ছোট ছোট মেয়েরা মাথায় সাদা হিজাব নিয়ে হইহল্লা করতে করতে স্কুল থেকে ফিরছে। বাচ্চা ছেলেরা ব্যাগ নিয়ে স্কুলের পোশাকেই পার্কে ফুটবল খেলছে। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। মাঝে মাঝে ট্রাফিক জ্যামও হয়। দূরে ওয়াজির আকবর খানের মসজিদ থেকে আজানের ডাক শোনা যাচ্ছে। রাস্তার ধারে নান ও ফলের দোকান— কয়েকজন দোকানি চাদর পেতে নামাজ পড়তে শুরু করেছে। অনেকেই নির্বিকার স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে।

মনে পড়ে গেল ন'মাস আগেকার কথা। কত ফাঁকা ছিল। সবার মুখে কি ভীষণ ভয়ের ভাব ছিল। একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখত। আমরা যখন রাস্তায় সিগারেট ধরিয়ে ছিলাম তখন বেশ কয়েকজন আমাদের দিকে আশ্চর্যভাবে তাকিয়েছিল। আমাদের নিজেদেরই সেই চাহনি দেখে ভয় করেছিল। তবে আমরা ছিলাম হিন্দুস্থানি। এদেশের সবচেয়ে বড় মেহমান। তাই আমাদের কেউ কিছুই বলেনি। আর পদে পদে পেয়েছিলাম এখানকার লোকেদের আতিথেয়তা।

এয়ারপোর্ট এসে গেল। মালপত্তর নাবিয়ে যখন ভেতরে ঢুকছি তখন দেখি তিনটে বোরখা পরা মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কাবুল এয়ারপোর্টের ভিড়ের মাঝখানে চারদিকে পুরুষদের মধ্যেই তারা তাদের বোরখা খুলে ফেলল— আদিলা, রুবিনা ও ফারিদা। এরা তিনজনে সমস্ত সংস্কার ভেঙে আমাদের সঙ্গে শেষ বারের মতো দেখা করতে এসেছে। রুবিনার চোখ লাল, জলে ভরতি। বাকি দু'জনের চোখ ছলছল। তারা কিছুই বলল না। এক দৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। জিনিসপত্র চেক-ইন করে মেয়েগুলোকে বিদায় জানিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। মেয়ে তিনটে কাচের দরজাটা আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ কোথা থেকে নাসির ও কাইয়ুম উদয় হল।

"আরে তোমরা আবার এখানে কী করে ঢুকলে? এটা তো সিকিউরিটি এলাকা?"

নাসিরের একটা বিশ্বজয়ী হাসি, "ওই দুটো সিকিউরিটি গার্ড আমার জানাশুনো। ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে আরেকটু গল্প করে নিই। আরও কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকা হয়ে যাবে। আমার কি হবে ডাক্তারসাহেব তুমি চলে গেলে?" নাসিরের গলা ভেঙে এল, নিজেকে সামলাতে না পেরে প্রাণপণে আমায় জড়িয়ে ধরল।

কাইয়ুম কম কথার মানুষ । গোঁফ-দাড়ির মাঝখান দিয়ে একটা শুকনো হাসি দিল। মুখে শুধু বলল, "বহুত খরাব হুয়া। মা বহুত পরেশান।"

আমরা লাউঞ্জের ভাঙা সোফায় গিয়ে বসলাম। এক বয়স্ক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তার পেছনে কালো সালওয়ার পরা, হালকা বেগুনি হিজাব নেওয়া একটা মোটাসোটা সুন্দর দেখতে মেয়ে, আরিফা।



বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে ডাক্তার হিসেবে গিয়েছিলেন পান্থজন। আড়াই কোটি আফগানির মধ্যে ষাট লক্ষের কোনও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নেই, পঁচিশ শতাংশ বাচ্চা মারা যায় পাঁচ বছরের আগেই, মেয়েদের এক-তৃতীয়াংশ মানসিক উদ্বেগজনিত অসুখে ভুগছে। 'কাবুলের পথে পথে' বিপর্যস্ত এক দেশের মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন, যেখানে ধ্বংসচিত্রের মধ্যেও জীবন বাত্ময়।